প্রথম প্রকাশ
মে-দিবস ১৯৬০

প্রকাশক
শ্রীনির্মল কুমার সাহা
১৮বি শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

ব্লক, প্রচ্ছদ ও চিত্র মুদ্রণে
ন্যাশানাল হাফটোন কোম্পানী
৬৮ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর
শ্রীহরিপদ সামন্ত
কে. বি. প্রিন্টার্স
১।১এ গোয়াবাগান ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪৬ নম্বর ধর্মতলা স্ট্রীট,
এবং প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের
বুধবাবের সান্ধ্য-বৈঠকগুলির স্মৃতির উদ্দেশ্যে

বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত

'স্মৃতি' পর্যায়ে আমাদের অন্য বই

নজরুল স্মৃতি

সুভাষ-স্মৃতি

শরৎ-স্মৃতি

সুকান্ত-বিচিত্রা

লেখকের কথা

নিজের গল্প বানাই কথা এটাই
অনুশীলনের প্রকার। ঠিক যেন নিজের সব
ছেলেমেয়েদের সঙ্গে থেকে লেখার চেষ্টা
যে নবীন সমাজ সাহিত্যে উৎসাহী আমার
পরীক্ষায় কে শত চেয়ে আমাদের পার্শ্ব
করেছে তাদের উঠে গেছে।

অনেক দূর দিয়ে অনেক নতুন
ছেলেমেয়েকে লেখা দেওয়া হবে আসলে
বানাই কথার অনুশীলন বা নিয়মাবলীর
সত্যিই বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।
কোন দিকে বানাই যেত?
খুঁজে পাই অ্যালবাম গানের কাছে
যেমন খোঁজা মেয়েটাই হয় তেমন
বাংলার সব চেয়ে আদুরে — গল্প-
গাথার উৎসাহ সত্যের নির্ভীক
বিজ্ঞানভিত্তিক খুঁজে সহজ প্রতীক
হিসাবে। হয় তো এ আর বেশ
ভুলের খুঁজে পাওয়াই সুখ নয়
বাংলার প্রেরণা ইতি এবং চিন্তা।

এটাই কি শেষ কথা ?
মানে ?
কী ছন্দকর ভাবেই মানুষকে অনুশীলন
করেন সাধনী-অভিজ্ঞতায় !
জীবনকে দেখা আর জীবনকে মানে করা
অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে। এখানকে
ও কাছে অনুষঙ্গকে তুচ্ছ করা জীবনদর্শনে
পাওয়া দীক্ষার অপরাধ।
অবাস্তব অবাস্তব কথা বোঝে আর
কি — যে কোনও উপলব্ধির মূল তত্ত্ব ?
তা নয়। এত উপায় সম্পর্কে হলেও কথাটার
অতিশয় সহজ এবং সরল। প্রাণে আর
মানুষকে দেখা আর ভালোবাসা যে একাত্মক
প্রক্রিয়া, এটার হবার অন্যতর যে যুক্তি-
অবাস্তব নয়, অর্থহীনও নয় — এটুকু-
বোঝার আনন্দের দিনের মানুষের পাওয়া-
যেটাই কঠিন হওয়া উচিত নয়।
সমস্ত নির্ভরতার কোনটার আগে দেখা
কোনটার পরে দেখা যে হিসাব কাজ নয়।
সম্পর্কের বিচার ধারাবাহিকতার হিসাবটা
নিরর্থক।
মানুষের আনন্দ যে সম্পর্কে যতটা
সম্পদ ক্ষেত্রেও যেটুকুই সেটাই আমি

এই সংকলনের জন্য গল্প নির্বাচনের মাপকাঠি ঠিক করে নিয়েছি।

আমার বিচারে ২৫টি সেরা সকলের মনঃপূত হবে না। এ গল্পটি কেন নির্বাচন করলাম এবং ও গল্পটি কেন বাদ দিলাম তাই নিয়ে নানা মনে প্রশ্ন উঠবে।

সেইজন্য আমি কামনা করি — প্রশ্ন উঠুক, সমালোচনা হোক, পাঠকেরা আমার বিচার-বিবেচনার ভুলত্রুটি সংশোধন করে দিন। সাহিত্যিকের পক্ষে সেটা পরম সৌভাগ্যের কথা।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
২৫শে বৈশাখ, ১৩৬২

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানী প্রকাশিত 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ব-নির্বাচিত গল্প' গ্রন্থে লেখকের স্ব-হস্তে লিখিত ভূমিকার প্রতিলিপি।

অনিলকুমার সিংহ

'মানিক বিচিত্রা' প্রসঙ্গে

'পুতুলনাচের ইতিকথা' ও 'পদ্মা নদীর মাঝি' যখন প্রথম পড়ি তখন আমার বয়স বড়-জোর আঠারো কি উনিশ। পুতুলনাচ ঠিক কেমন দেখতে তখনো জানি না, পদ্মা নদীর মাঝি দূরে থাক, পদ্মা নদীই তখনো চোখে দেখিনি কিন্তু উপন্যাস দুটি আমার সেদিনের তরুণ মনে কী অপার রোমাঞ্চ সৃষ্টি করেছিল তা আজ ভাবতেও অবাক লাগে! শশী ডাক্তার ও কুসুম কি জানি কেন সেদিন আমার সমস্ত মন অধিকার করে নিয়েছিল, কুবের ও কপিলার অন্তর্দাহ আমার নিজের মনকেও কম দগ্ধ করেনি আর ময়না দ্বীপের হোসেন মিঞার বিচিত্র-বিস্ময়কর চরিত্র সেদিনকার কাঁচা মনে কী গভীর রহস্যের স্বাক্ষরই না রেখেছিল! কিন্তু আমাকে সবথেকে অভিভূত করেছিল এই উপন্যাস দুটির নেপথ্য নায়ক যাদুকর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তখনও এই যাদুকরটি কেমন দেখতে, কোথায় থাকেন, কি করেন কিছুই জানি না, কেবল জানি বই দুটির মলাটের মধ্যকার অতল রহস্যের কথা যে রহস্য যে-কোনো সংবেদনশীল মনকে আচ্ছন্ন না করে পারে না।

এর কয়েক বছর বাদেই সেই যাদুকরের সঙ্গে যেদিন প্রথম পরিচয় হল, কোথায় মিলিয়ে গেল পুতুলনাচের রোমাঞ্চ ও পদ্মা নদীর ইলিশ মাছের গন্ধ। হোসেন মিঞার সেই আশ্চর্য দ্বীপের কথাও আর মনে রইল না। কেবল মন জুড়ে রইল মানিকবাবুর বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিত্ব যে ব্যক্তিত্ব কাছে টানে, গভীরে আকর্ষণ করে এবং আরও নিভৃতে নিয়ে গিয়ে সম্মোহিত করে।

এই সংকলনের মুখবন্ধ রচনা করতে বসে আমার আঠারো-উনিশ বছর বয়সের স্মৃতিচারণা না করে পারলাম না কারণ পরবর্তী কালে মানিকবাবুর অত্যন্ত কাছাকাছি থাকার সময়েও আমার তরুণ বয়সের এই ভাবাবেগের কথা কিছুতেই বিস্মৃত হতে পারিনি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যকে মোটামুটি তুটি পর্বে ভাগ করা যেতে পারে—একটি যুদ্ধপূর্ব, অপরটি যুদ্ধোত্তর। অর্থাৎ তাঁর আটাশ বছরের সাহিত্য-জীবন সময়ের হিসেবে তুটি ভাগে বিভক্ত—১৯২৮ থেকে ১৯৪২ ও ১৯৪৩ থেকে ১৯৫৬। প্রথম ভাগে মানিকবাবু মনোবিকলনের সুড়ঙ্গপথের জটিলতার মধ্যে দিয়ে মানব-জীবনের রহস্য-সন্ধানে ও উন্মোচনে ব্যস্ত যার একদিকে আদিম মানুষের প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকার, অন্যদিকে অসুস্থ মধ্যবিত্ত মনের সরীসৃপ কুটিলতা। দ্বিতীয় ভাগে তিনি মধ্যবিত্ত জীবনের এই অবক্ষয়কে তার ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে প্রয়াসী হয়েছেন নির্মোহ মন ও বৈজ্ঞানিক চেতনার ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে। যত অসম্পূর্ণতা ও অসংলগ্নতার অভিযোগ করি না কেন, এই অংশে তিনি জীবনের সহস্র জটিলতার মধ্যেও খেই খুঁজে পেয়েছেন।

বর্তমান সংকলনের সম্পাদক বিভিন্ন চিন্তাশীল লেখকের মূল্যবান রচনাগুলিকে একসূত্রে গেঁথে মানিকবাবুর বহুধাবিস্তৃত সাহিত্য-জীবনের প্রেক্ষাপটকে পাঠকদের সামনে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। 'মানিক-বিচিত্রা'র অধিকাংশ রচনাই মানিকবাবুর মৃত্যুর পর রচিত। ফলে সেখানে জমা-খরচের খাতায় অঙ্কের কোনো গোঁজামিল নেই। প্রতিটি লেখকই নিঃসংকোচে তাঁর বক্তব্য উপস্থিত করেছেন—কোথাও তা গুরুভার প্রশস্তির চাপে ভারাক্রান্ত হয়নি। রচনাগুলি ছড়িয়ে ছিল নানা পত্র-পত্রিকায়। বলতে গেলে পত্রিকার জীর্ণ পৃষ্ঠার অন্তরালে হারিয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল সেগুলির। উদ্যোগী সম্পাদক সেই প্রায়-বিস্মৃত রচনাগুলিকে বিস্মৃতির গর্ভ থেকে তুলে এনে নতুন জীবন দান করেছেন। সম্পাদক হিসেবে এটা তাঁর সব থেকে বড় কৃতিত্ব। আর এরই জন্যে পাঠক হিসেবে আমরা তাঁকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

প্রায় ৪০খানি উপন্যাস, ১৯২টি ছোট গল্প, একটি নাটক ও সম্প্রতি প্রকাশিত একটি কাব্যগ্রন্থ—মানিকবাবুর সাহিত্য-জীবনের এই মোট ফসল। তাঁর জীবদ্দশায় এই ফসলকে সমালোচনার নিরিখে যাচাই করার

অবকাশ ঘটেনি। কারণ পাঠক বা সমালোচক কেউই ভাবতে পারেননি যে মাত্র ৪৮ বছর বয়সে সৃষ্টির বিকিকিনি সাঙ্গ করে মানিকবাবু ইহলোক থেকে বিদায় গ্রহণ করবেন। আমরা সবাই ভেবেছিলাম তিনি আরও দীর্ঘদিন আমাদের মধ্যে থাকবেন এবং বহু অমূল্য উপহার দিয়ে যাবেন, আর তারই মধ্যে আমরা পাব তাঁর যুদ্ধোত্তর কালের নতুন চৈতন্যের পরিণত ফলশ্রুতি। আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা তা থেকে বঞ্চিত হয়েছি। তাঁর অকালমৃত্যু—যার জন্যে আমরা কেউই প্রস্তুত ছিলাম না—এই মহৎ সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করেছে।

সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেয়ে ব্যক্তি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কম কৌতূহলোদ্দীপক ছিলেন না। মানিকবাবুকে যাঁদের খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে তাঁরাই জানেন এমন নিরভিমান ব্যক্তিত্ব, অদম্য প্রাণশক্তি ও অটল আত্মপ্রত্যয় সহজে চোখে পড়ে না। এমন সুগভীর আন্তরিকতা, নিরঙ্কুশ সততা ও শত কৃচ্ছ্রতার মধ্যে অপার আতিথেয়তা—এতগুলি গুণের এমন নিষ্কলুষ সমাহার একটি মানুষের মধ্যে কদাচিৎ ঘটে। টালিগঞ্জের চণ্ডিতলার দোতলা পৈতৃক বাড়ি থেকে বরানগরের গোপাললাল ঠাকুর রোডের দীনহীন একতলা বাসাবাড়ি—মানিকবাবুকে অসংখ্যবার অসংখ্যরূপে দেখেছি আর মুগ্ধ হয়েছি তাঁর অসামান্য ব্যক্তিত্বে। ম্যাডান স্ট্রীটে ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রণ্টের তিনতলার ঘর থেকে যেদিন তাঁর কমিউনিস্ট পার্টির দপ্তরে উত্তরণ ঘটল তারপর থেকে তাঁকে পার্টির ঘরোয়া সভা-সমাবেশে, ময়দানের জনসভায়, সাহিত্য-সম্মেলনে, অগ্রণী স্বেচ্ছাসেবকের ভূমিকায় পতাকা হাতে মিছিলের পুরোভাগে অনেকবার দেখেছি এবং বিস্মিত হয়েছি তাঁর প্রাণশক্তিতে। বিস্ময় এইজন্যে যে শিল্প-সাহিত্য জগতের এই ঘোড়সওয়ারকে সামান্য পদাতিকের ভূমিকায় দেখব বলে প্রত্যাশা করিনি। মনে আছে ১৯৪৯ সালে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে রাজনৈতিক কর্মীদের ওপর সরকারী নির্যাতনের প্রতিবাদে সংস্কৃতি-সেবীদের এক সভা হয়। মানিকবাবু এই সভায় কেবল বক্তৃতাই

করেননি, ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে যে মিছিল বের হয় তার পুরোভাগেও ছিলেন। পুলিশ ঐ মিছিলকে কলেজ স্ট্রীট-মির্জাপুর স্ট্রীটের মোড়ে আটক করে গুলিবর্ষণ করে। সেদিন রাত্রে ছত্রভঙ্গ জনতার ভিড়ে বিমূঢ় মানিকবাবুকে পুঁটিরামের দোকানের বারান্দার নিচে খুঁজে পেয়েছিলাম। পরবর্তী কালে আমরা মানিকবাবুর মতো শিল্পীকে এইরকম বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যে ঠেলে দেওয়াটাকে চরম হঠকারিতা বলে অভিহিত করেছিলাম।

'নতুন সাহিত্য' পত্রিকার দপ্তরে মানিকবাবু অনেকবার এসেছেন—কখনো নিছক গল্প করতে বা খবরা-খবর নিতে, কখনো বা 'ইতিকথার পরের কথা'র কিস্তি দিতে, হাতলভাঙা কাপে চা খেয়ে গেছেন বহুবার, আমাদের আড্ডায় মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটক ও অন্যান্যদের সঙ্গে প্রাণখোলা আলোচনায় যোগ দিয়েছেন। তখনো তাঁর মননদীপ্ত ব্যক্তিত্ব আমাকে প্রবলভাবে আলোড়িত ও অনুপ্রাণিত করেছে।

একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা এখানে লিপিবদ্ধ করে রাখতে চাই। ঘটনাটি যত ছোট হোক, মানিকবাবুর মহৎ ও উদার চরিত্রের নিদর্শন বলে গণ্য হতে পারে। খুব সম্ভবতঃ ১৯৫৪ সালের কথা। 'শারদীয় নতুন সাহিত্যে'র জন্যে মানিকবাবুর কাছে একটি গল্প চেয়েছিলাম। শেষ মুহূর্তে হলেও গল্পটি পেয়েও ছিলাম। লেখাটি পড়ে কিন্তু খুশি হতে পারিনি। ধৃষ্টতা জেনেও পরদিন পিওন দিয়ে লেখাটি ফেরৎ পাঠিয়েছিলাম। সঙ্গে অবশ্য মাফ চেয়ে একটা চিঠি দিয়েছিলাম। মহালয়ার তখন মাত্র ২।৩ দিন বাকি। কাগজ বের করতে এত ব্যস্ত যে নিজে গিয়ে উঠতে পারিনি। মানিকবাবু লেখাটি ফেরৎ পেয়ে গম্ভীর মুখে পত্রবাহককে বলেছিলেন, 'তোমার বাবুকে দেখা করতে বোলো।' লোকমুখে শুনলাম তিনি মনে মনে ভয়ানক ক্ষুব্ধ হয়েছেন। ক্ষুব্ধ হওয়া অন্যায় নয়। আপনার লোকের কাছে আঘাত পেলে মানুষ ক্ষুব্ধ হয় সবচেয়ে বেশি। বিজয়ার পর একদিন সস্ত্রীক দেখা করতে গেলাম। মানিকবাবু কিন্তু ঠিক আগের

মতোই তেমনি আন্তরিক, তেমনি অমায়িক। বললাম, 'শুনেছি, আপনি আমার ওপর ভয়ানক রাগ করেছেন। আমার ধৃষ্টতা মাফ করবেন।' মানিকবাবু উত্তর দিলেন, 'রাগ করেছি ঠিকই কিন্তু লেখাটা ফেরৎ দিয়েছেন বলে নয়। লেখা ফেরৎ দেবার অধিকার আপনার আছে। কিন্তু তাই বলে আমার লেখা আপনি পিওন দিয়ে ফেরৎ পাঠাবেন ? নিজে আসতে পারলেন না ?' তারপরই কমলাদিকে চা করতে বলে গরম সিঙ্গাড়া আনতে বেরিয়ে গেলেন। বরানগরের বাড়িতে গেলে এই গরম সিঙ্গাড়া তিনি প্রায়ই খাওয়াতেন।

মানিকবাবুর মতো লেখকের লেখা ফেরৎ দেবার মতো দুঃসাহস কেন হয়েছিল জানি না। নিজের মনে এর ঔচিত্য অনৌচিত্য নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক করেছি। এটা কি নিতান্তই যৌবনের দুঃসাহসিকতা ? না কি এর পেছনে ছিল মানিকবাবুর প্রতি প্রচণ্ড শ্রদ্ধা ও ভালবাসা যা তাঁর কাছ থেকে সর্বদা বৃহৎ কিছু পাবার জন্যে মনকে উন্মুখ করে রাখতো। যাইহোক, সেদিন মনে মনে মানিকবাবুর ব্যক্তিত্বের কাছে হার স্বীকার না করে পারিনি।

প্রসঙ্গতঃ আর একটি ঘটনা উল্লেখ করবো। মানিকবাবু বিনা পারিশ্রমিকে কোনো লেখা দিতে চাইতেন না। বলতেন, 'লেখা আমার পেশা। লেখাই আমার জীবিকা। শ্রমিক যদি দিন-মজুরি করে পয়সা পায়, আমি মগজ খাটিয়ে গল্প লিখে পারিশ্রমিক পাব না কেন ?' এমন কি 'স্বাধীনতা'র লেখার জন্যেও তাঁকে পারিশ্রমিক দিতে হবে। অবশ্য সে টাকা উনি নিজে নেবেন না, শেষ পর্যন্ত পার্টি তহবিলেই দান করবেন। একবার 'শারদীয় স্বাধীনতা'র গল্পের টাকা পেতে অনেক বিলম্ব হচ্ছিল। পরে পত্রিকা কর্তৃপক্ষ জানালেন তারাই নাকি টাকাটা নিজেদের তহবিল থেকে তুলে পার্টি তহবিলে দিয়ে দিয়েছেন। খবরটা শুনে মানিকবাবু রীতিমতো বিচলিত হলেন। বললেন, 'এ কেমন কথা! আমার টাকা আমি দান করবো। 'স্বাধীনতা' কর্তৃপক্ষকে আমার টাকা দান করার এক্তিয়ার কে দিয়েছে ?'

এ হেন মানিকবাবুকে যখন আমাদের সঙ্গে শ্রমিক-বস্তিতে রাস্তার ধারে নিতান্ত দীনহীন চায়ের দোকানে চা খেতে খেতে রাজনীতির গল্প করতে দেখেছি তখন মনে হয়েছে 'পুতুল নাচের ইতিকথা' ও 'পদ্মা নদীর মাঝি'র স্রষ্টা সত্যিই নতুনতর জীবনের পাঠ নিচ্ছেন। কিংবা আই-পি-টি-এর শো ভাঙার পর শেষরাত্রে যখন মানিকবাবু মফস্বল শহর বা উপকণ্ঠের শিশির-ভেজা মাঠের আল ভেঙে রেলস্টেশনের উদ্দেশে পাড়ি দিতেন—কখনো অন্ধকারে, কখনো জ্যোৎস্নারাত্রে তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত অস্পষ্ট মুখের দিকে সন্তর্পণে তাকিয়ে দেখেছি আর ভেবেছি—এক বৃহৎ অন্বেষা এই মানুষটিকে ঘরের চতুষ্কোণ ছেড়ে বিরাট বিশ্বের দিকে টেনে নিয়ে চলেছে!

বলা বাহুল্য, ১৯৪৩ সাল থেকে তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত মানিকবাবুকে রাজনীতি, সাহিত্যকর্ম, সংসারধর্ম, নিছক আড্ডা ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠভাবে দেখার সুযোগ হয়েছে এবং প্রতিবারই যেন তিনি একটি করে নতুন পৃষ্ঠা উন্মোচিত করেছেন আমার চোখের সামনে।

অবশেষে তাঁর আকস্মিক মৃত্যু! আকস্মিক মৃত্যু না পরিকল্পিত আত্মহনন? প্রবল আত্মবিশ্বাসের মধ্যেও কি প্রবল হতাশা এই সংগ্রামী শিল্পীটিকে অত্যন্ত সন্তর্পণে আত্মঘাতী হতে সাহায্য করেনি? হলপ করে কে বলবে একথা?

৮৯ নম্বর মহাত্মা গান্ধী রোড

এখন যে বাড়ীটিতে বসে আমি 'মানিক বিচিত্রা' গ্রন্থের সম্পাদকের কথা লিখছি, এই ৮৯ নম্বর মহাত্মা গান্ধী রোডের দু' তলায় ক্যালকাটা বুক ক্লাবে আমি মানিকবাবুকে অনেকবার দেখেছি। ১৯৫৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে শেষ অসুস্থ হওয়ার আগেও তাঁকে এ বাড়ীর সিঁড়ি মাড়িয়ে ওপরে উঠতে অনেকবারই দেখা গেছে। এ বাড়ীতে আসার দু'টি আকর্ষণ তাঁর ছিল। এক, 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদকীয়-দপ্তর আর দুই, অধ্যাপক শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ বসুর ক্যালকাটা বুক ক্লাব। আর জ্যোতিবাবুর ওই চারপাশে বইয়ের শেল্‌ফ মোড়া বুক ক্লাবের প্রশস্থ ঘরটিতেই মানিকবাবুর সঙ্গে আমার প্রথম অন্তরঙ্গ আলাপ।

সেই কিশোর বয়সে লিট্‌ল ম্যাগাজিন প্রকাশ করার তাগিদে অনেক লেখক-লেখিকার সঙ্গেই আলাপ করতে হয় আমাকে, সেই সুবাদে মানিকবাবুকেও এসে ধরলাম একদিন বিকেলে বুক ক্লাবের ওই ঘরে। স্বর্গত স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাণতোষ ঘটক আর নরেন্দ্রনাথ মিত্র, জ্যোতিবাবুর পরিমণ্ডলে বসেছিলেন তখন মানিকবাবু। সামনে সকলেরই চায়ের কাপ। ওঁর কাছে এসেছি শুনে মানিকবাবু চায়ের পেয়ালাটি হাতে নিয়েই উঠে পড়লেন, সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন বুক ক্লাবের ওপাশের চৌকো খোলা গাড়া-বারান্দায়, যেখানে অনেকগুলি ছোটো ছোটো টেবিল-চেয়ার পাতা ছিলো। তারই একটি চেয়ার দখল করে টেবিলের ওপর হাতের পেয়ালাটি নামিয়ে রাখলেন, আমাকেও বসতে বলে শুনলেন আমার বক্তব্য। আর আমার কথা শুনে তিনি যা বললেন, তা আমার কাছে সেদিন খুবই অভাবনীয় মনে হলো।

ওই চৌকো গাড়ী-বারান্দায় বসে আকাশ দেখা যায়। মুখ ফেরালেই ট্রাম লাইনের তার। মানিকবাবু একবার আকাশ আর ট্রাম লাইনের তারের দিকে তাকালেন। কানে এলো ট্রাম চলার আবহ-সঙ্গীত। তারপর হঠাৎ তিনি আমার চোখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে স্পষ্ট গলায় বললেন, হ্যাঁ, লেখা একটা দিতে পারি, কিন্তু কতো টাকা পাবো?

বললাম, দেখুন, ছোটো কাগজ আমাদের, আর ছোটদের কাগজ—

কিন্তু টাকা ছাড়া তো আমি লিখিনা, আর এটাই তো আমার পেশা—বললেন তিনি মৃদু হেসে।

তারপর ছোটো একটি লেখা অবশ্য দিলেন কদিন পরে। একটি কবিতা। সেটি ছাপা হলো আমাদের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায়।

সেদিন বুক ক্লাবের খোলা বারান্দায় বসে অনেক কথা বলেছিলেন তিনি। তার বেশির ভাগই হলো কিশোর সাহিত্য রচনা বিষয়ে তিনি কি ভাবেন, তার কথা। কিশোরদের জন্য আজগুবী রূপকথা আর ভৌতিক গল্প না লিখে সিরিয়াস কিছু লেখার কথাই বলেছিলেন তিনি।

এই ঘটনার বছর পাঁচেক আগেও আর একবার তাঁর সঙ্গে আমার কথা হয়েছিলো, আলাপ তিনি নিজেই করেছিলেন বলতে পারি। সেদিন সন্ধ্যায় ধর্মতলা স্ট্রীটের 'প্রগতি লেখক-শিল্পী সংঘের' ঘরে গিয়ে তাঁর হাতে দিয়েছিলাম আমাদের আর একটি কিশোর পত্রিকা। ৪৮ পৃষ্ঠার ছোটো শীর্ণ পত্রিকা। মুড়ে পাঞ্জাবীর পকেটে রেখে বললেন, থাক্, পরে দেখবো।

সেদিন প্রগতি লেখক-শিল্পী সংঘের বুধবারের সান্ধ্য-বৈঠকের দিন ছিলো। একটু পরেই তিনি তেভাগা আন্দোলনের ওপর লেখা তাঁর স্বরচিত একটি গল্প পাঠ করলেন। তারপর সেই গল্প নিয়ে শ্রোতাদের মধ্যে কিছু আলোচনা-সমালোচনা হলো, মানিকবাবুও তাঁর গল্পটির স্বপক্ষে জবাব দিলেন। তারপর বৈঠকের শেষে আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতে, বোধ হয় তখনও আমি চলে যাইনি দেখেই তিনি বললেন, তুমিও লেখো তো?

সলজ্জ ভাবে হাসলাম।

এবার কাগজটি পকেট থেকে বার করে পাতা উলটাতে উলটাতে বললেন, কোন লেখাটা তোমার?

বললাম, এবারে লেখা নেই।

কি লেখো, গল্প না কবিতা?

মৃদু গলায় বললাম, দু'টোই লেখার চেষ্টা করি।

একদিন এনো তোমার লেখা, শুনবো।—বলেই তিনি ননী ভৌমিকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আমিও কবি সিদ্ধেশ্বর সেনের সঙ্গে, একসঙ্গে বাড়ী ফিরলাম।

নিজের লেখা মানিকবাবুকে পড়ে শোনানোর সৌভাগ্য কোনোদিন আমার হয়নি বটে, কিন্তু এই থেকেই তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়ে গেলো। তারপর

'স্বাধীনতা' অফিসে, প্রগতি লেখক-শিল্পী সংঘের ঘরে নয়তো সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামার পথে অনেকবার তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। মুখের মৃদু হাসি দিয়ে বরাবরই তিনি আমাদের একদিনের পরিচয়ের স্বীকৃতি দিয়েছেন।

আর সেই সুবাদেই পরে, আরো অনেক পরে, জ্যোতিবাবুর ক্যালকাটা বুক ক্লাবে গিয়ে তাঁর কাছে লেখা চাওয়ায় আমাদের ওই কবিতা-প্রাপ্তি।

শেষে ১৯৫৬ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে বিদ্যোদয় লাইব্রেরীর বাড়ীর দু'তলায় যেদিন সকালের দিকে বসে আছি, সেইদিনই শ্রদ্ধেয় পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ক্লান্ত পায়ে সিঁড়ি ভেঙে দু'তলায় উঠতে উঠতে বললেন, বলাই, মানিক চলে গেলো।

পবিত্রদা নিজের দীর্ঘ জীবনে বহু স্নেহভাজন সুধী সাহিত্যিক-শিল্পীর মৃত্যু দেখেছেন, কিন্তু সেদিন খুব বেশি বিচলিত মনে হয়েছিলো তাঁকে।

সেদিন তাঁর ওই সামান্য কটি কথাতেই বুঝতে পারলাম, 'ছোটো বকুলপুরের যাত্রী'র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আজ নিজেই চলেছেন মহাযাত্রায়। যেখান থেকে কোনোদিনই আর তিনি আমাদের মধ্যে ফিরে আসবেন না।

মানিকবাবুর মৃত্যুর পর এখানে-ওখানে বেরুনো তাঁর অনেকগুলি ছোটদের গল্পের কাটিং সংগ্রহ করে শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে আমি দিয়েছিলাম। বলেছিলেন তাঁর নিজস্ব প্রকাশন-প্রতিষ্ঠান থেকে উনি মানিকবাবুর একটি ছোটদের বই বার করবেন। কিন্তু তা তখন আর বেরোয়নি। পারে, অনেক পরে মানিকবাবুর ছোটদের কিছু গল্প ও স্মৃতিকথা ধরণের লেখা আর তাঁর একমাত্র সম্পূর্ণ কিশোর উপন্যাস 'মাঝির ছেলে' নিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কিশোর বিচিত্রা' নামে একটি সংকলন আমার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করি, আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীপ্রসূন বসুর 'আগামী' মাসিক পত্রিকায় 'মাটির কাছে কিশোর কবি' নামে মানিকবাবু একটি ধারাবাহিক উপন্যাস লিখছিলেন। কিন্তু সেটি অসমাপ্ত রেখেই তিনি চলে যান। তাঁর মৃত্যুর পর প্রসূনবাবু শিশু-সাহিত্যিক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্রকে দিয়ে সেই অসমাপ্ত উপন্যাস শেষ করিয়ে ১৩৬৫ বঙ্গাব্দের শারদীয়া 'বার্ষিক আগামী'তে প্রকাশ করেন। সে উপন্যাস এখনো যে কেন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলো না তা জানি না। তবে আশার কথা মানিকবাবুর সমস্ত রচনা সংগ্রহ করে সুষ্ঠুভাবে খণ্ডে খণ্ডে 'মানিক গ্রন্থাবলী' এখন প্রকাশিত হচ্ছে। পৃথক ভাবেও তাঁর অনেক অপ্রচলিত উপন্যাসের সুদৃশ্য-

সংস্করণ এখন পাওয়া যায়। এমন কি সারা জীবনে লেখা তাঁর কবিতাগুলিরও একটি সুন্দর স্ব-নির্বাচিত সংস্করণ কবি শ্রীযুগান্তর চক্রবর্তীর সম্পাদনায় কিছুদিন আগে প্রকাশিত হয়েছে।

মানিকবাবুর মৃত্যুর পর শ্রীনিতাই বসু তাঁর সম্পর্কে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, বাংলা সাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে গ্রন্থ-রচনার সেটিই সম্ভবত প্রথম প্রচেষ্টা। সে বই এখন আর পাওয়া যায় না। তবে সম্প্রতি মানিকবাবু সম্পর্কে আর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন ডঃ সরোজমোহন মিত্র। তাঁর রচিত 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য' গ্রন্থটি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। ডঃ মিত্রর পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও মানিকবাবুর প্রতি শ্রদ্ধার স্বাক্ষর এই প্রামাণ্য গ্রন্থটির প্রতিটি পৃষ্ঠায় আঁকা রয়েছে। মানিকবাবুর মৃত্যুর পরে এই ষোলো-সতেরো বছরের মধ্যে এমন একটি গ্রন্থ কেন যে এর আগে প্রকাশিত হয়নি এটাই আশ্চর্য! এজন্য এই সুযোগে ডঃ মিত্রকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

মানিকবাবুর মৃত্যুর পরে পরিচয়, নতুন সাহিত্য, দেশ, মাসিক বসুমতী প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর সম্পর্কে অনেক মূল্যবান রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। সে সব রচনার কোনটিই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি দেখে জীর্ণ পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠা থেকে সেগুলি সংগ্রহ করে ও আরো কিছু নতুন লেখা তৈরী করিয়ে এই 'মানিক বিচিত্রা' প্রকাশ করলাম। এই গ্রন্থের লেখাগুলি থেকেও অনুসন্ধিৎসু পাঠক মানিকবাবু সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য জানতে পারবেন। মানিকবাবু সম্পর্কে আরো দু' তিনটি অত্যন্ত মূল্যবান লেখা তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়েছিলো, যেগুলি আমি সংগ্রহ করে এই সংকলন-গ্রন্থে দিতে পারিনি। পরবর্তী সংস্করণে সেগুলি দেবার চেষ্টা করবো। নির্ধারিত সময়ের অনেক দেরীতে এই সংকলনের প্রেস-কপি তৈরী করায় বইটি বেরুতে দেরী হলো। সেজন্য 'সাহিত্যম্'-এর কর্ণধার শ্রীনির্মলকুমার সাহার কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী হলেও লজ্জিত নই, কারণ আমার সব সাহিত্য-কর্মই আমি অত্যন্ত যত্নসহকারে করার চেষ্টা করি। এজন্য দেরী হয়, সময় লাগে। প্রেস আর ক্রেতাকে দাঁড় করিয়ে রেখে যেমন-তেমন করে কাজ শেষ করা আমার নীতি বিরুদ্ধ।

'মানিক বিচিত্রা' গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দিয়েছেন শ্রদ্ধেয় শ্রীঅনিলকুমার সিংহ। এই সৌম্য-সুন্দর মানুষটিকে প্রথম আমি দেখি পার্ক স্ট্রীট-চৌরঙ্গীর মোড়ে

একটি বাড়ীর ওপর তলায়, ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউসে। তারপর ৪৬ ধর্মতলা স্ট্রীটে, স্বাধীনতায়, পরিচয়ে, নতুন সাহিত্য ভবনে—নানা জায়গায় এঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। মানিকবাবুকে কমিউনিস্ট পার্টিতে নিয়ে আসার ব্যাপারে এই মানুষটিরও অনেকখানি হাত ছিলো এবং এঁরই ঐকান্তিক তাগিদে মানিকবাবুর শেষের দিকের অনেক লেখা তৈরী হয়েছিলো। এই সমস্ত কারণে শ্রীঅনিলকুমার সিংহকে দিয়ে এই সংকলনের ভূমিকা লেখাতে পেরে আমি তৃপ্তি বোধ করেছি। আর এঁর লেখাটি তো শুধুমাত্র একটি নিছক মুখবন্ধই নয়, একটি মূল্যবান স্মৃতিকথাও।

আজ ৮৯ নম্বর মহাত্মা গান্ধী রোডের তিনতলায় যে জায়গাটিতে বসে আমি এই সম্পাদকের কথা লিখছি, সেখান থেকে নীচের সিঁড়িটি দেখা যায় স্পষ্ট। লিখতে বসে বার বার ওদিকে চোখও চলে যাচ্ছে। আর ভাবছি ষোলো-সতেরো বছর যদি পেছিয়ে যাওয়া যেতো তাহলে এই বিকেল বেলায় নিশ্চয়ই দেখতাম ঋজু-বলিষ্ঠ একটি মানুষ সিঁড়ি পেরিয়ে ওপরে উঠে আসছেন, কোঁচা হাতে নিয়ে। চোখে চশমা, মুখটা সোজা সামনের দিকে তোলো।

কিন্তু তা সম্ভব নয়। ৮৯ নম্বর মহাত্মা গান্ধী রোডের এই বাড়ীটি ঠিকই আছে। কিন্তু তিনি আর কোনদিনই সিঁড়ি মাড়িয়ে ওপরে উঠে আসবেন না।

বিশ্বনাথ দে

সূচীপত্র

কবি-কণ্ঠ ঃ

স্মৃতি-কথা ঃ

জীবন ও সাহিত্য :



বিষ্ণু দে

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

কেউবা কবিতা লিখি, কেউ করি জীবনকে গান,
কেউ আঁকি চিত্রপট, কেউ গড়ি প্রাণের গ্রানিটে।
নির্মাণেই সত্য জানি, আমাদের আস্তিক্য প্রমাণ
আকাশে বাতাসে নীলে, রাঙা মাটি শহরের ইঁটে
ছন্দ গান মূর্তি চিত্রে মৃত্যুহীন সত্তার নির্মাণ।
আমরা খুঁজি না শক্তি মদমত্ত দুস্থ অস্ত্রকীটে,
জীবনের মৃত্যুঞ্জয় দান ?

আমরা খুঁজি ও পাই আকাশের সাম্যের সুযোগে,
বাতাসে বাতাসে মৈত্রী আমাদের ভেঙেছে প্রাচীর।
ঠগেদের ভাগাভাগি, বিভেদের হাজার দুর্যোগে
ভাঙে না দুর্জয় মুক্তি আমাদের বিস্তৃত গভীর
সমুদ্রের নীলে যেন, যেন বিশ্বমজদুরের যোগে,
বাংলার আকাশ যেন, বাংলার চাষী যেন বীর
মৃত্যুঞ্জয় হাজার দুর্ভোগে।

আমরা খুঁজি না শক্তি ইঁদুরের গোপন দপ্তরে,
পঙ্গপাল নই, নই উই, তাই মরণমদিরা
আমাদের পেয় নয়, নরকের সরকারী চত্বরে
আমাদের আনাগোনা নেই তাই, ক্ষমতার শিরা
দাঙ্গায় করি না স্ফীত, জলুকার পরজীবী ঘরে

খুঁজি না শাসনদণ্ড, স্বর্ণভাণ্ড ভরি না কবিরা
সর্বনাশ হেনে ঘরে ঘরে।

আমার সৃষ্টির কবি, জীবনের নির্মাণের গান
আমাদের নিদ্রাহীন স্বপ্নে জ্বলে প্রাণের কংক্রিটে
তৃপ্তিহীন আমাদের কাজ চলে, মৃত্যুঞ্জয় দান
জীবনের কবিতার প্রতিমার প্রাণের গ্রানিটে
আকাশের ঐক্যে আর বাংলার বাতাসে সন্ধান
ঘাটে ঘাটে খুঁজে পাই, মাঠে মাঠে খড় আর ইঁটে
আমরা দেশের প্রাণ, প্রাণ কোথা ইঁদুরে বা কীটে ?
জনতাই জীবনের এ দেশের অসীম প্রমাণ—
আকাশে মাটিতে গড়ি ভিটে॥

মানিক মনোময়

এক

একই বৎসরে জন্ম দু'জনের
ছিল না অভিলাষ ভজন পূজনের
গভীর আকুলতা,
ছিল যে কত ব্যথা
ছিল না অবসর কোকিল কূজনের ॥

পদ্যে পদাবলী দুখের দীপাবলী
জ্বেলেছি একা একা নিবিড় তমসায়।
গদ্যে তুমি প্রিয়
কামনা কমনীয়
রচনা করে গেছ অশ্রু বরষায় ॥

নীরবে মরণের দরোজা খুলে রেখে
আর্ত বন্ধুকে জানি হে গেছে ডেকে
ক্লান্ত দেহ মন
কাঁপে যে সারাক্ষণ
সহসা এ জীবন আঁধারে যাবে ঢেকে ॥

দুই

তোমার রচনাকে বিশাল উত্তাল অন্ধ ঢেউ ভেবে
তীব্র দুঃসহ রাত্রি মন্থিত ব্যথায় অনলস
একক মন নিয়ে দেখেছি বিস্মিত :

হে ঋজু গিরিচূড়া
তূষার মৌলী।

কুহেলি আবরণে স্তিমিত গম্ভীর,
অঙ্গে প্রচ্ছদে প্রজ্ঞা মেধা যার তীব্র ঝঙ্কার
রক্ত ঘাম ঝরা সে তুমি বেদনার নিঝুম হাহাকার
ক্ষুব্ধ জনতার
শপথ ক্ষুরধার।
তোমার রচনাকে ক্রুদ্ধ বৈশাখে শান্ত ফাল্গুনে
চৈত্রে বাউলের নাচের তাল গুণে
পলাশে কিংশুকে
প্রতিটি দিন বুকে
ছন্দে গেঁথে যাই তারার মণিহার,
খুঁজেছি অবসান আর্ত কলগান ভ্রান্তি-তমসার।

তোমার রচনাকে তাইতো ভালোবেসে
কালের কোল ঘেঁষে
ঘুরেছি দেশে দেশে
সহরে জনপদে দেখেছি মনোময় রাখোনি কোনো ভয়।
বিজনে বসে থাকা
রূপালী চাঁদে রাকা
পাহাড়ে হিম ঢাকা দিলে কী পরিচয়,
তোমার কবিতাকে ধূসর সবিতাকে দেখেছি মনোময়।

গোপাল ভৌমিক

পদ্মা নদীর মাঝি

ঢেউ ওঠে ঢেউ পড়ে
ঝড়ে জলে সব একাকার ;
উজ্জ্বল দিনের বুকে
কি করে যে নেমে আসে সন্ধ্যার আঁধার
দেখেনি যে সেই ছবি
অপরূপ মায়ার কাজলে
সেও তো তোমাকে চেনে
যে হেতু সে নিত্য ডোবে সৃষ্টির অতলে।

পদ্মার চেয়েও বেশি ভয়ঙ্কর
মানুষের সুগভীর মনের সাগরে
প্রতিদিন দাঁড় টানা কি কঠিন
বুঝি তা তোমার বই পড়ে।
ভালবাসা সর্বব্যাপী
তবু দীপ্ত তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণে
ঝড়ের তাণ্ডব তোল
আমাদের অবসন্ন সব-কিছু-মেনে-নেওয়া মনে।

পদ্মা নদীর মাঝি
ঝড়ে জলে রোদে নিরুত্তাপ
কেবল সে দাঁড় টানে
দূরে তীর কাছে জল ঊর্ধ্বলোকে তারার সংলাপ।

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

বাইরে অমল আলো, নির্মেঘ আকাশ।
তার কতোটুকু সঙ্গোপনে
নিয়েছো বুকের মধ্যে, কতোটুকু তার
বকুলতলার পথে, পদ্মানদীর বাঁকে,
সমস্ত জীবনে ? সরীসৃপ চলে
অন্ধকারে বুকে ভর দিয়ে,
আর মানুষ সুতোয় বাঁধা পুতুলের মতো নাচে
কিংবা আরো অসহায়, প্রাগৈতিহাসিক কোনো জন্তু যেন।
তুমি
ভেতরে এসব দৃশ্য দেখেছিলে।

কী এক দুর্বহ ভার কাঁধে নিয়ে
তবু চলেছিলে
বিরল শস্যের খোঁজে ; পূর্ণতার মাঠ,
হলদে নদীর রেখা, বনের সবুজ
মনে রেখে।......তুমি হৃদয় পুড়িয়ে একবার
খাঁটি সোনা হতে চেয়েছিলে॥

পাথরের ফুল

ফুলগুলো সরিয়ে নাও,
আমার লাগছে।

মালা
জমে জমে পাহাড় হয়
ফুল
জমতে জমতে পাথর।

পাথরটা সরিয়ে নাও,
আমার লাগছে।

এখন আর
আমি সেই দশাসই জোয়ান নই।
রোদ না জল না, হাওয়া না—
এ শরীর আর
কিছুই সয় না।

মনে রেখো
এখন আমি মা-র আদুরে ছেলে—
একটুতেই গলে যাব।

যাব বলে
সেই কোন্ সকালে বেরিয়েছি—
উঠতে উঠতে সন্ধে হল।

রাস্তায়
আর কেন আমাকে দাঁড় করাও ?
অনেকক্ষণ থেমে থাকার পর
গাড়ি এখন টিকিয়ে টিকিয়ে চলেছে।
মোড়ে
ফুলের দোকানে ভিড়।
লোকটা আজ কার মুখ দেখে উঠেছিল ?

২

ঠিক যা ভেবেছিলাম
হুবহু মিলে গেল।
সেই ধুপ, সেই ধুনো, সেই মালা, সেই মিছিল—
রাত পোহালে
সভা-টভাও হবে !
(একমাত্র ফুলের গলা-জড়ানো কাগজে লেখা
নামগুলো বাদে)
সমস্তই হুবহু মিলে গেল।

মনগুলো এখন নরম—
এবং এই হচ্ছে সময়।
হাত একটু বাড়াতে পারলেই
ঘাট-খরচটা উঠে আসবে।

এক কোণে ছেঁড়া জামা পরে
শুকনো চোখে
দাঁতে দাঁত দিয়ে

ছেলেটা আমার
পুঁটুলি পাকিয়ে বসে।
বোকা ছেলে আমার,
ছি ছি, এই তুই বীর পুরুষ ?
শীতের তো সবে শুরু—
এখনই কি কাঁপলে আমাদের চলে ?

ফুলগুলো সরিয়ে নাও,
আমার লাগছে।
মালা
জমে জমে পাহাড় হয়
ফুল
জমতে জমতে পাথর

পাথরটা সরিয়ে নাও,
আমার লাগছে।

৩

ফুলকে দিয়ে
মানুষ বড় বেশী মিথ্যে বলায় বলেই
ফুলের ওপর কোনদিনই আমার টান নেই।
তার চেয়ে আমার পছন্দ
আগুনের ফুল্‌কি—
যা দিয়ে কোনদিন কারো মুখোশ হয় না।

ঠিক এমনটাই যে হবে,
আমি জানতাম।

ভালোবাসার ফেনাগুলো একদিন উথলে উঠবে
এ আমি জানতাম।
যে-বুকের
যে-আঁধারেই ভরে রাখি না কেন
ভালোবাসাগুলো আমার—
আমারই থাকবে।

রাতের পর রাত আমি জেগে থেকে দেখেছি
কতক্ষণে কিভাবে সকাল হয়,
আমার দিনমান গেছে
অন্ধকারের রহস্য ভেদ করতে।
আমি একদিন, এক মুহূর্তের জন্যেও
থামিনি।
জীবন থেকে রস নিংড়ে নিয়ে
বুকের ঘটে ঘটে আমি ঢেলে রেখেছিলাম
আজ তা উথলে উঠল।

না।
আমি আর শুধু কথায় তুষ্ট নই ;
যেখান থেকে সমস্ত কথা উঠে আসে
সেখানে যায়—
কথার সেই উভসে,
নামের সেই পরিণামে,
জল মাটি হাওয়ায়
আজ নিজেকে মিশিয়ে দিতে চাই।

কাঁধ বদল করো।
এবার
স্তূপাকার কাঠ আমাকে নিক।
আগুনের একটি রমণীয় ফুল্‌কি
আমাকে ফুলের সমস্ত ব্যথা
ভুলিয়ে নিক॥

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি

ঐ তাঁর চাপা ঠোঁট,
উজ্জ্বল দুচোখ.........
মনে তাঁর কী ছিল আগুন ?—
কবে শুরু দুঃসহ সে খেলা ?
কবে এই আমাদের মনের ভিতর
ভাঙা গম্বুজের মতো পুরনো মগজে
কে আছো কে আছো প্রতিধ্বনি ?
কবে ভস্ম থেকে জাগা ফিনিক্সের মতো
রক্তের সমুদ্রে নোনা ঢেউ
পাথার ধনুকে ছুঁয়ে উড়ে যায় পাখি
দিগন্তের দিকে, উড়ে যায়.........
কবে ? কবে ? তাই
ঐ তাঁর একমাত্র ছবি
মাথাটা হেলিয়ে চেয়ে আছে,
বিদ্রোহী, স্বাধীন, চেয়ে আছে......॥

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

আশ্চর্য সে

একেকটি মানুষ যেন যন্ত্রণার গর্ভে জন্ম নেয়।
অন্যেরা কামজ, কিংবা মুহূর্তের অবিমৃশ্য ভুল
জীবনের শববাহী, জীবন যাদের চক্ষুশূল।
একেকটি জন্মেই শুধু পুনর্জন্মে ভূমিষ্ঠ-বিস্ময়।
আশ্চর্য সে। যাকে জানি যন্ত্রণাজারিত আত্মময়
অথচ উন্মাদ আত্মজিজ্ঞাসার তোলে সে ত্রিশূল :
স্বমৈথুনমুগ্ধ তৃপ্ত যে-পৃথিবী পাণ্ডুর পাংশুল
তাকে দেয় রক্তস্নান, স্নানপুণ্য শুদ্ধতা, তন্ময়।

একেকটি মৃত্যুই বুঝি জীবনের রহস্যের চাবি।
একেকটি মৃত্যুই স্মৃতি। অন্য সব দেহান্ত, শূন্যতা।
সে আশ্চর্য। যে-দেহান্ত জন্মান্তরে রাখে তার দাবি,
বিবাহে বন্ধনে বাঁধে ভিন্ন ছিন্ন শূন্য ও পূর্ণতা।
তুমি-আমি আসি যাই, পাকদণ্ডী প্রচ্ছন্ন প্রদোষে,
জন্ম-মৃত্যু জীবনের দুই যুক্তকরে স্বাগত সে।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবনের মূল্যবান মুহূর্তগুলিকে
মদ, জুয়া, আড্ডা আর খেয়ালখুশিতে
উড়িয়ে, ছড়িয়ে তবু শিল্পীর অমর
সাধনায় ইচ্ছে ছিলো তারও ভাগ নিতে
একনিষ্ঠ আত্মদানে। তাই রাজনীতি
পেশা নয়, কিংবা মাতালেন উচ্ছৃঙ্খল
চিৎকার ছিলো না তার ; বরং মানুষ
সমস্ত যন্ত্রণা নিয়ে তার চোখে উজ্জ্বল
হয়েছিলো। সবচেয়ে বেশি ছিলো মনে
মানবতা, তাই তাকে খিদিরপুরের
ঘোড়ারা ছোটাতো কিন্তু পারতো না মন্ত্রীরা
কোনো লোভ দেখিয়েই চোর বানাতে। ঢের
পুরস্কৃত হওয়া যেতো, এমন সুযোগ
উপোসেও নেয়নি সে ; সয়েছে দুর্যোগ ॥

সামসুল হক

মানুষ সমস্ত যন্ত্রণা নিয়ে তাঁর কাছে

ব্রহ্মাণ্ড সংসার পাল্টে গেছে,
পিথিমিতে এয়েছে, নয়ন মেলো, বামুনের চেয়ে সেরা জাত,
মজুরের জাত, তারা খাটিয়ের জাত।
যে খাটবে সে জাতের লোক, বাস্ বাস্।
আর সব বেজাত বজ্জাত।
কেন ? না, সহজ কথা, তারা চোর ছ্যাঁচড় ডাকাত।
যারা খাটে তাদের মুখের অন্ন চুরি করে খায়।
চোর বা ঐ বেজাতের দেবতা ধরম মোরা কিছুই মানি না,
বাবুরা শুনুন, মোরা আলাদা—সজ্জাত।

বাবুরা শুনুন বা না-শুনুন, সরল কথা জেনে গেছে তারা।
তাদের সহজ এই বিশ্বাসের পুষ্ট শস্য নির্মম পাহারা
দিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, আবার
সমস্ত লোহিত শ্বেত রক্ত কণিকার
মারাত্মক মঞ্চে উঠে তিনি করেছিলেন ঘোষণা :
মরিবে না। কিছুতেই মরিবে না সে, না।
মানুষ সে বাঁচিবেই সেই অবস্থায়,
বাঁচেনা বনের পশু যেখানে যেভাবে।

হ্যাঁ, তাই মানিকবাবু চলেছেন, ছাখো—
দু'দিকে সুদীর্ঘ কালো গভীর গহ্বর
মাঝখানে সঙ্কীর্ণ পথের পিচ্ছিলতা,

প্রতি পদে স্খলনের ভয়
প্রতি পদে যে-কোনো পতন।
তবু তিনি জীবনের জটিলতা সরীসৃপ এই নিয়ে খেলেন সহজে
যেমন চাঁদেরা খেলে অন্ধকারে পানের বরোজে।

এ-সব দারুণ খেলা মালিকের অপছন্দ খুব।
এ-সব রেশমী তাঁত দেঁতোদের অপছন্দ খুব,
বেয়াড়া মদন কিন্তু বেপরোয়া, আজ
আকাল, জানেন শিল্পী, বায়না আসে না,
সুতো নেই—তাঁতও চলে না
তবুও মদন ওঁচা কাপড় বোনে না।

দেখুন মানিকবাবু, আমাকে চেনেন? আমি—আমি আনোয়ার,
বিবস্ত্র রাবেয়া সে-ই চলে গেলো, দয়া করে করুন উদ্ধার।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতার একটি ব্যস্ততম রাস্তা। নিচে বাজারের অবিরাম হট্টগোল আর ওপরে প্রকাণ্ড ঢালাও ছাদে একটিমাত্র অফিসঘর।

অফিসঘরটি একটি প্রেসের। ব্যাঙের ছাতার মত একটি সদ্যোজাত সাপ্তাহিক পত্রিকা সেই অফিস থেকে তখন বেরিয়েছে। সম্পাদনার ভার আমার ওপর।

কাগজটির নাম করব না, কারণ প্রকাশকের সব আশা ও আমার মত কয়েকজন কর্মীর সমস্ত স্বপ্ন ধূলিসাৎ করে নাম রাখবার মত কিছু করবার আগেই তার আয়ু ফুরোয়।

তবু সেই কাগজ ও কাগজের অফিসঘরটি আমার কাছে আজো যে স্মরণীয় হয়ে আছে তার কারণ বিশেষ একজনের স্মৃতি তার সঙ্গে জড়িত।

সে বিশেষ একজন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সেই অফিসঘরেই প্রথম আমার সাক্ষাৎ। লেখা দিতে সে অফিসঘরে তিনি আসেননি, সে-কাগজে কোন লেখাও তাঁর বার হয়নি। তিনি এসেছিলেন আর একজন বন্ধুর মারফৎ আলাপ করতে।

তাচ্ছিল্য অবশ্যই করিনি, কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে আলাপ হয়েছে নেহাৎ ভাসাভাসা ক্ষণিকের। আর পাঁচজন সাহিত্য যশোপ্রার্থী নতুন লেখকের থেকে তাঁকে আলাদা করে দেখবার মত কোন কারণ ছিল না।

শুধু তাঁর চেহারাটা ছাড়া।

ঢালাও ছাদের নিঃসঙ্গ অফিসঘরের একটি মাত্র বেশ উঁচু দরজা পূব দিকে খোলা। প্রথম প্রবেশের সময় সেই দরজার মাথা পর্যন্ত ছোঁয়া তাঁর সুদীর্ঘ সুঠাম বলিষ্ঠ চেহারা আমার মনে কেমন করে মুদ্রিত হয়ে গেছে। বিকেলের ধূলিমলিন আকাশের পশ্চাৎপটে সেই নিঃসঙ্গ মূর্তির সঙ্গে নিচের বাজারের হট্টগোলটুকুও।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা ভাবতে গেলে আমার সেই সেদিনের প্রথম দেখাটাই সব চেয়ে বেশী করে মনে পড়ে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সাহিত্যিক ও মানুষ হিসাবে আমি যা বুঝেছি ও জেনেছি তার সঙ্গে ও-ছবির কোথায় একটা মিল পাই বলেই হয়ত।

যত বিশেষই হোক ও-ছবি বেশী দিন অম্লান নিশ্চয় থাকত না, যদি না কয়েকদিন বাদেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় হঠাৎ একদিন আমার বাড়িতে দেখা করতে আসতেন। এবার তিনি শুধু আলাপ করতে আসেননি। সঙ্গে নিয়ে এসেছেন গুটি ছয় সাত গল্পের পাণ্ডুলিপি আমায় দেখাবার জন্যে।

তাঁর কিছু আগেই আমি কলম ধরেছি, সুতরাং এরকম ভাবে গল্প দেখাতে নিয়ে আসাটা কিছু অস্বাভাবিক নয়। নতুন যাঁরা লেখেন অগ্রজদের কাছে এরকমভাবে অনেকেই তাঁরা লেখা যাচাই করতে আনেন। আমার কাছে এরকম লেখা দু' চারজনের তখন আসে।

গল্পগুলি দেখে রাখব বলে সপ্তাহখানেক বাদে তাঁকে আসতে বলেছি। তারপর নিজের স্বাভাবিক আলস্যে ও অন্যমনস্কতায় সেগুলির কথা ভুলেও গেছি। যেমন আর পাঁচজনের লেখা পাই তা থেকে এ-লেখাগুলি সম্বন্ধে আলাদা আগ্রহ জাগবার কোন হেতুও ছিল না।

যেদিন লেখকের আসবার কথা ঠিক তার আগের দিন রাত্রে সৌভাগ্যক্রমে লেখাগুলির কথা মনে পড়েছে। তাড়াতাড়ি সেগুলির ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিতে বসেছি।

বুলোতে গিয়ে চোখ সত্যিই স্থির হয়ে গেছে। সমস্ত গল্পগুলি একবারের জায়গায় দুবার করে পড়া শেষ না করে উঠতে পারিনি।

পরের দিন অধীর আগ্রহে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আসার জন্তে অপেক্ষা করেছি। কিন্তু তিনি আসবার পর কি করে আমার কথা তাঁকে বোঝাব ভেবে পাইনি।

এতো শুধু বিস্ময় কৌতূহল প্রশংসা নয়, তার সঙ্গে কি একটা অস্ফুট যন্ত্রণা যেন মেশানো।

বিস্ময়, আশ্চর্য অসামান্য একজন লেখকের আকস্মিক আবিষ্কারে, কৌতূহল তাঁর লেখার অদ্ভুত ব্যতিক্রমের মূল সম্বন্ধে, প্রশংসা তাঁর সহজাত অনায়াস রচনাকৌশলের জন্তে, আর যন্ত্রণা তাঁর স্রষ্টা মনের সেই দুর্বোধ বিফলতার আভাসে জীবনের গভীর প্রতিচ্ছবিও যাতে কেমন একটু বাঁকা হয়ে ছাড়া দেখা দেয় না।

কি তাঁকে বলেছিলাম যথাযথভাবে মনে নেই। শুধু এইটুকু তাঁকে জানিয়েছিলাম যে সাহিত্য সম্বন্ধে যেটুকু বোধ আমার আছে তাতে তাঁর প্রতিভা আমার কাছে দিবালোকের মত স্পষ্ট। সেই সঙ্গে সে প্রতিভা কতদিনে কতখানি স্বীকৃতি পাবে সে বিষয়ে একটু সন্দেহও প্রকাশ করেছিলাম মনে আছে। কারণও জানিয়েছিলাম এই যে, সাধারণতঃ সুস্থ বলতে যা সবাই বোঝে তার প্রতিভা তা নয়।

লেখক হিসাবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সেদিন যতটুকু জেনেছিলাম তারপর আরও অনেক গভীর ও বিস্তৃতভাবে তাঁকে জানবার সুযোগ দেশের সমস্ত অনুরাগী পাঠকের সঙ্গে আমিও পেয়েছি।

শুধু লেখক হিসেবে নয়, বন্ধু হিসেবেও তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে জানবার সুযোগ তারপরে আমার হয়েছে। কিন্তু সমস্ত জানার পরেও প্রথম দিনের সেই ছবি ও প্রথম লেখা পড়ার সেই অনুভূতি ও ধারণার আমূল কিছু পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হয় না।

ছেচল্লিশ বছরের জীবনে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় খুব কম কিছু লেখেননি। পুতুল নাচের ইতিকথার মত বাংলা সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবার মত রচনা তার মধ্যে যেমন আছে তেমনি এমন

রচনাও হয়ত আছে নেহাৎ জীবিকার্জনের দায়ে প্রকাশকের হাতে যা তাঁকে অনিচ্ছায় তুলে দিতে হয়েছে। কিন্তু লেখার নিপুণ হাত বাইরের নানা কারণে যেখানে তাঁর শিথিল ও ক্লান্ত সেখানেও তাঁর বিশিষ্ট প্রতিভার দীপ্তি থেকে থেকে চাপা থাকেনি এইটিই তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির সব চেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার।

এ ব্যাপার সম্ভব হয়েছে শুধু তাঁর স্রষ্টামনের অভিনব গড়নের জন্যে, যে-গড়নের মধ্যে তাঁর প্রতিভার আশ্চর্য উদ্ভাসনের তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের আংশিক ব্যর্থতার রহস্যও নিহিত।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সেই বিরলতম লেখকদের একজন জীবনে ও সাহিত্যে মানস-সত্তা যাঁদের অভিন্ন। কলে ছাঁটা মাপসই মানুষদের মাঝখানে বিসদৃশ বেমানান প্রাণাবেগ ও ঘোলাটে মুখস্থ ধারণার জগতে অন্তর্ভেদী স্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে আসবার যে ট্র্যাজিডি তাই তাঁর জীবন ও সৃষ্টিকে স্পর্শ না করে ছাড়েনি।

জীবনে ও সাহিত্যে তাঁর দুরন্ত প্রাণাবেগ সম্বন্ধে উচ্ছৃঙ্খলতার অপবাদ ওঠবার যদি কোনো অবকাশ হয়ে থাকে তাহলে তার জন্যে দায়ী সেই কাল ও সমাজ এ প্রাণাবেগকে সহজ স্বাভাবিকভাবে প্রবাহিত হতে দেওয়াব মত সুবিন্যস্ত দৃঢ়তা যার মধ্যে এখনো অনুপস্থিত। তাঁর প্রতিভার সম্পূর্ণ সুস্থতা সম্বন্ধে যদি কোথাও সন্দেহ জাগে তাহলে নিজেদের সুস্থতার স্বরূপও আমাদের আগে বিচার করা দরকার।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত গোত্রছাড়া প্রতিভা যে উৎকেন্দ্র, তার কারণ আমাদেরই অসম বিন্যাসের বিশৃঙ্খলা, তাঁর রচনায় যেটুকু অসুস্থতার ছায়া তা আমাদেরই রুগ্নতার প্রতিবিম্ব।

মাঝারি মাপের মানুষ হলে এবং জীবন ও সাহিত্য তাঁর অভিন্ন না হলে হয়ত অনেক কিছু তিনি মানিয়ে নিতে পারতেন; রচনায় ও জীবনে তেমন একটা সুলভ সৌষ্ঠব রেখে যাওয়াও তাঁর সাধ্যাতীত হত না, সাবধানী সুবিবেচকদের বাহবা যাতে সহজেই পাওয়া যায়

কিন্তু কোন দিকেই মাঝারি হবার সৌভাগ্য নিয়ে তিনি আসেন নি। চূড়াও যেমন তাঁর মেঘ-লোক ছাড়ানো, খাদও তেমনি অতল গভীর। তাই মানিয়ে নেবার মানুষ তিনি নন।

যেখানে নিজের এই অসামান্য সত্তাকে অস্বীকার করে মানিয়ে নিয়ে মাপসই হবার স্বভাববিরুদ্ধ চেষ্টা তিনি করেছেন সেইখানেই তাঁর ব্যর্থতার ফাঁদ তিনি নিজের অজ্ঞাতসারে পেতেছেন।

যে দলের মধ্যেই তিনি থাকুন, সমস্ত দলের উর্ধ্বে তিনি সেই নিঃসঙ্গ সরল অতিকায় একাগ্র উদ্দাম চিরকিশোর জীবনসন্ধানী—মাঝারি মানুষের তৈরি জগতে পায়ে পায়ে হোঁচট খেয়ে দরজায় দরজায় মাথা ঠুকে নির্বোধ আত্মতৃপ্তির সঙ্গে অবিরাম যুঝে ক্ষতবিক্ষত হয়ে অকালে যাকে বিদায় নিতে হয়।

অকালে অকৃতার্থরূপে বিদায় নিলেও আমাদের জীবনবোধের ভুয়ো আত্মপ্রসাদের ভিত মানিক বন্দোপাধ্যায়েরা বেশ একটু নাড়িয়ে যায় নাকি ?

দেশ ॥ ২২শে অগ্রহায়ণ ১৩৬৩ ॥

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর 'কল্লোল যুগে' বলেছেন 'মানিকই একমাত্র আধুনিক লেখক যে "কল্লোল" ডিঙিয়ে "বিচিত্রা"য় চলে এসেছে—পটুয়াটোলা ডিঙিয়ে পটলডাঙায়। আসলে সে "কল্লোলেরই" কুলবর্ধন।'

কথাটির মধ্যে খানিকটা সত্য আছে, সম্পূর্ণ সত্য নেই। 'কল্লোলের' সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাদৃশ্য আছে তিক্ততা ও বক্রতার বহিরঙ্গে, আন্তরধর্মে তিনি একেবারেই স্বতন্ত্র।

এবং, একক।

বাংলা সাহিত্যে রোম্যান্টিক ধর্মের বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন যে কল্লোলগোত্রীয়দের মধ্যে গড়ে উঠেছিল তাতে সন্দেহের অবসর নেই। প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র' বাঙলাদেশে বুদ্ধিবাদের সম্ভাবনাকে উন্মুক্ত করে দিয়েছিল—'কল্লোলে' তার তরঙ্গ এসেছিল। প্রথম সমরোত্তর জর্জীয় সাহিত্যের নৈরাজ্যমনন কল্লোলীয়দের মন্ত্রদীক্ষা দিয়েছিল। কিন্তু "কামনার কাপালিক" এই "মুসাফেরে"র দল—যাঁরা "নিখিল নারীর দ্বারে" "নিত্য উন্মাদচঞ্চল" হয়ে ঘুরে বেড়াতেন—আসলে চরিত্র-ধর্মের দিক থেকে ছিলেন পুরোপুরি রোম্যান্টিক। সেই রোম্যান্টিকতার তাড়নাতেই তাঁরা দুঃখবিলাসের চড়া সুরে তার বেঁধেছিলেন। হাক্সলির উপন্যাস কিংবা বোদ্লেইরের কবিতা থেকে তাঁরা যা কিছু প্রসাধনকলাই আয়ত্ত করুন না কেন—বাংলা সাহিত্যের উত্তরাধিকারকে বিশেষভাবে অতিক্রম করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এসেছিলেন সম্পূর্ণ নতুন ধারায়। এ ধারা

'কল্লোল'-এর নয়। পূর্বগামী কোনো লেখকের পরোক্ষ প্রভাব যদি তাঁর ওপর কখনো পড়ে থাকে, তা হলে দুজনের নাম অনুমান করা যায়। একজন জগদীশ গুপ্ত, অপরজন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

মনোবিকলনের জটিলতার মধ্য দিয়ে জীবনরহস্য সন্ধানের পথিকৃৎ জগদীশ গুপ্ত। একদিকে রবীন্দ্রনাথের গল্প, অন্যদিকে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের জনপ্রিয়তা—এ দুইয়ের মাঝখানে জগদীশ গুপ্ত অবিশ্বাস্য দুঃসাহসে মনোলোকের গহনে নিঃসঙ্গ যাত্রা আরম্ভ করেছিলেন। কথন-কৌশলের দুর্বলতায় তাঁর গল্পগুলো সব সময়ে মহিমামণ্ডিত হয়নি—কিন্তু তা হলেও তিনি এক নতুন সম্ভাবনার আগল খুলে দিয়েছিলেন। আর কল্লোলপন্থী হয়েও শৈলজানন্দ বাংলা গল্পের ভৌগোলিক এবং মানবিক সীমান্তরেখাকে অনেকখানি প্রসারিত করে দিতে পেরেছিলেন। এনেছিলেন কয়লাকুঠির মানুষদের—আদিম মানুষদের, এনেছিলেন তাদের বিষ-মাখানো 'কাঁড় বাঁশকে' আর এনেছিলেন তাদের উগ্র অমার্জিত কামনাকে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যিক বিষয়বস্তুও দুটি ভাগে প্রধানত বিভক্ত। এর একদিকে আদিম মানুষের রক্তনাড়ীতে প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকার—অন্যদিকে মধ্যবিত্ত মনের সরীসৃপ কুটিলতা। আমার মনে হয়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে—অন্তত প্রথম পর্বের মানিক বন্দ্যো-পাধ্যায়কে দুটি গল্প দিয়েই চিহ্নিত করা যায়—একটি "প্রাগৈতিহাসিক" আর একটি "সরীসৃপ"।

মধ্যবিত্তের মধ্যগত যে অন্তঃসারশূন্যতা ও গ্লানি—তার সম্পর্কে কল্লোলীয় লেখকদেরও কোনো মোহ ছিল না। তাঁরাও একে যথাসাধ্য উদ্‌ঘাটন করতে চেয়েছিলেন—এর মর্মনিহিত সমস্ত অসারতা আর আত্মবঞ্চনাকে আঘাত করেছিলেন নানাভাবে। প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং অচিন্ত্যকুমারের গল্পে তার নিদর্শন আছে। কিন্তু তা হলেও তাঁদের মধ্যে যে পরিমাণে আত্মধিক্কার ছিল, সে পরিমাণে আত্ম-সমালোচনা ছিল না। এই আত্মনিরীক্ষার জন্যে যে নিরাশক্তি অপরিহার্য—তা

তাঁদের পক্ষে আয়ত্ত করা সেদিন সম্ভব হয়নি। তাই 'পুন্নাম' কিংবা 'দুইবার রাজা'য় লেখকের বেদনার্ত ব্যক্তিত্ব উপস্থিত—তাঁদের সাহিত্য থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে তাঁরা নির্মোহ সমালোচকের ভূমিকা গ্রহণ করেন নি।

কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যেন বাইরে থেকে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর গল্প-উপন্যাস পড়তে পড়তে মনে হয় একজন ইউরোপীয় যেন আচ্ছন্নতাবর্জিত বুলির আলোকে আমাদের সমাজ-জীবনকে বিশ্লেষণ করছে—আর সেই বিশ্লেষণের মধ্যে সব সময়েই একটা বক্রতা সজাগ হয়ে আছে। অথবা এ উপমাও ঠিক হল না। আরো স্পষ্ট করে বলা যায়ঃ একজন আদিম মানুষ যেন নিরঞ্জন দৃষ্টিতে বাঙালি মধ্যবিত্তের সমাজকে দেখে নিচ্ছে, তার ওপরের সমস্ত বর্ণপ্রলেপের নেপথ্যে যে ভণ্ডামি, স্বার্থবাদ আর কূটকামনার সর্পিল প্রবাহ বইছে—তার কিছুই তার চোখকে এড়িয়ে যায়নি।

এই জন্যেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মধ্যবিত্ত সম্বন্ধে এমন অসাধারণ নির্মম। যে নির্মমতার তুলনা নেই "আততায়ী" গল্পে, যখন বন্ধুর চোখকে অন্ধ করে দিয়ে অপর বন্ধু তার স্ত্রীকে আয়ত্ত করে, কিংবা অন্যত্র, যখন দুঃস্থ ভাড়াটের কাছ থেকে ভাড়া আদায় করতে না পেরে বাড়িওলা তার পাওনা মিটিয়ে নেয় তাদের খোঁড়া মেয়েটির সঙ্গে ব্যভিচার করে, তখন তার বিষজ্বালায় আমরা পুড়ে খাক হয়ে যাই। আমাদের ঘরে ঘরে যে অসংখ্য "কুষ্ঠ রোগীর বউ"—এ সত্য চাবুকের মতো আমাদের পিঠে এসে পড়ে। "ধরা-বাঁধা জীবনে" আমাদের জীবনকেই দেখতে পাই। "দর্পণে" আমরাই নির্ভুলভাবে প্রতিবিম্বিত হয়ে উঠি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে কোথাও যদি পক্ষপাত থেকে থাকে—তা হলে তার অভিব্যক্তি পাওয়া যাবে আদিম মানুষ সম্পর্কেই। ইংরেজি সাহিত্যে লরেন্সও একদিন এইভাবেই অনুভব করেছিলেন। তাঁর "প্রাগৈতিহাসিক" গল্পে কিংবা "পদ্মা নদীর মাঝি" উপন্যাসে এই

আদিম মানুষকেই তিনি প্রীতি নিবেদন করেছেন। তাই ডাকাত ভিখুর ডান হাতটা বল্লমের ঘায়ে শুকিয়ে অকর্মণ্য হয়ে গেলেও শেষ পর্যন্ত সে অপরাজিত। "সরীসৃপের" বনমালী একটা বীভৎস অবক্ষয়ের মূর্তি—কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকারের মধ্য দিয়েও 'ভিখু' পাঁচীকে নিয়ে জীবনের দিকে অগ্রসর হয়। রাজকুমারের মতো মধ্যবিত্ত নায়কের কোনো পরিণতি নেই—কিন্তু হোসেন মিঞার উপনিবেশে কুবের আর কপিলা আর একটা অনিশ্চিত অথচ অপূর্ব জীবনের দিকে যাত্রা করে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সাম্যবাদের দিকে পদক্ষেপ করেছিলেন। আপাত দৃষ্টিতে তাঁকে আকস্মিক বলে মনে হলেও তাঁর সাহিত্য-জীবনের সূচনাতেই তার সংকেত ছিল। মধ্যবিত্তের ভূমিকা সম্বন্ধে মার্কসীয় মতবাদের কোনো মোহ নেই। ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা থেকে অপজাত এই গোষ্ঠিটি যে ঐতিহাসিক নিয়মেই আত্মবিরোধে জর্জরিত হবে এবং ক্রমে ক্রমে অনিবার্য অবক্ষয়ের পথে অগ্রসর হবে—এই সত্যটি গ্রহণ করতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের খুব বেশি সময় লাগেনি। স্বাভাবিক প্রবণতায় এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মধ্যবিত্ত সম্পর্কে যে বিদ্বেষ এবং বিরূপতা তিনি লালন করছিলেন, মার্কস্‌বাদ তাকে যুক্তি ও বুদ্ধিগত সমর্থন দিয়েছিল। আর এই মধ্যবিত্তের সম্বন্ধসূত্রে ধনতন্ত্রের স্বরূপটিকেও তিনি যে ক্রমশ উপলব্ধি করছিলেন—তার স্বাক্ষর এর আগেই ফুটে উঠেছিল তাঁর "সহরতলী" উপন্যাসে—সত্যপ্রিয় আর জ্যোতির্ময়ের উপাখ্যানের মাধ্যমে।

সুতরাং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে যে পরিবর্তন এসেছিল—তার পেছনে পূর্বসূচিত একটা মনোভঙ্গি এবং একটি সুনিশ্চিত বিবর্তনের ধারা ছিল। তাঁর "প্রতিবিম্ব" উপন্যাসে এই সন্ধিক্ষণটি চিহ্নিত রয়েছে। এর পরেই সাম্যবাদের নিশ্চিত প্রতীতির মধ্যে নেমে আসতে তাঁর পক্ষে আর বাধা ছিল না।

আমরা বলেছি, আদিম ও বলিষ্ঠ মানুষের শক্তি সম্বন্ধে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা পক্ষপাত এবং সগোত্র-চেতনা ছিল। মধ্যবিত্ত সম্পর্কে সহজাত অবিশ্বাস আর 'মাটি ঘেঁষা মানুষের' দিকে এই প্রবণতা তাই শেষ পর্যন্ত তাঁকে গণ-আন্দোলনের পটভূমিতে নিয়ে এসেছে। তাই ভিখু আর কুবেরের দলকে তিনি নতুন তাৎপর্যে মণ্ডিত করে তুলতে পেরেছেন। মার্কসীয় মতবাদের সহযোগে তিনি প্রাগৈতিহাসিক জীবন-সংগ্রামকে আরও 'বৃহত্তর-মহত্তর' সংগ্রামের মধ্যে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন। আদিম সারল্যকে তিনি অগ্রসর করে দিয়েছেন "হারানের নাতজামাই" গল্পে, নতুন মহিমায় মাথা তুলেছে "রাঘব মালাকার"—কুবের কপিলা সুন্দরবনের অনির্দেশ দ্বীপকে পেছনে ফেলে যাত্রা করেছে "ছোট বকুলপুরের যাত্রী" হয়ে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বৈশিষ্ট্যের কথা মনে আসে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য-জীবনের দ্বিতীয় পর্বে যখন তিনি সাম্যবাদী ভাবধারাকে অনুসরণ করেছেন, তখনও মধ্যবিত্তমূলক তাঁর কাহিনীগুলি অপেক্ষাকৃত দীপ্তিহীন। তাদের মধ্যে তাঁর রাজনৈতিক ভাবধারার প্রয়োগ আছে, পরিচ্ছন্ন বুদ্ধির চিহ্ন আছে, কিন্তু তবুও মনে হয়, তারা যেন ফর্মুলা-অনুযায়ী তৈরি হয়েছে; প্রাণের উত্তাপও তাদের মধ্যে তেমনভাবে অনুভব করা যায় না—কেমন নীরক্ত, কেমন বর্ণহীন। মধ্যবিত্ত সম্বন্ধে তাঁর মানসিক অপ্রীতি গোত্রান্তরের মধ্য দিয়েও অপসৃত হয় নি; এই কৃত্রিম ক্ষয়িষ্ণু গোষ্ঠিকে তিনি সহানুভূতি দিয়ে দেখতে চেয়েছেন, তার সংগ্রামী চেতনাকে আবিষ্কার করতেও প্রয়াস পেয়েছেন—তা সত্ত্বেও এই সমাজ তাঁর বুদ্ধির অনুমোদনই পেয়েছে, কিন্তু হৃদয়গত মমত্বে স্নিগ্ধ হতে পারে নি।

সেই মমত্বে সার্থক হয়েছে 'কংক্রিটে'র রঘু -"সবাই যে অস্ত্রটি খুজছে, নিজের কাছে অকারণে এক মুহূর্তের বেশি যেটি লুকিয়ে রাখবার কথা" যে "ভাবতেও পারে না।" সেই গভীর প্রীতি আর স্বজনত্ববোধে আশ্চর্য উদ্ভাসিত হয়েছে "শিল্পী" মদন ঃ

"চালিয়েছি। খালি তাঁত। তাঁত না চালিয়ে খিঁচ ধরল পায়ে বাতে, তাই খালি তাঁত চালালাম এট্টু। ভুবনের সুতো নিয়ে তাঁত বুনব? বেইমানি করব তোমাদের সাথে কথা দিয়ে? মদন তাঁতী যেদিন কথার খেলাপ করবে—"

আর এই কারণেই তাঁর "পেশার" চাইতে ঢের বেশি সার্থক হয়েছে "হলুদ নদী সবুজ বন"। প্রাগৈতিহাসিক শক্তির সন্ধানী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সেই শক্তির অপরিমিত সম্ভাবনার সন্ধান পেয়েছিলেন। "চাষীর মেয়ে" তারই সোনালী ফসল বয়ে আনছিল।

কিন্তু ফসল তোলা শেষ হল না। তার আগেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অকালে চলে গেলেন। তাঁর সাহিত্য জীবনের প্রথম অধ্যায়কেই আমরা পেলাম, দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচনাতেই তাঁকে চিরদিনের মতো থেমে যেতে হল।

এ ক্ষোভ আর ক্ষতি কোনোদিনই ভোলবার নয়।

পরিচয়॥ পৌষ ১৩৬৩॥

সজনীকান্ত দাস

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকাল ও আকস্মিক মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আমি তাঁহার রচিত গ্রন্থের একটি পঞ্জী প্রকাশের চেষ্টা করি। সেই প্রাথমিক প্রয়াসের খসড়াটি গত অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে বাহির হইয়াছিল। তাহাতে স্বভাবতই ত্রুটি ছিল। সেই ত্রুটি পুরণের জন্য আমি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত তরুণ সাহিত্যসেবীদের নিকট আবেদন জানাইয়াছিলাম। সুখের বিষয়, একজন—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ ঘোষাল, সে আহ্বানে সাড়া দিয়াছেন এবং কিছু উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। মানিকের সহধর্মিণী কমলা দেবীর নিকট রক্ষিত কয়েকটি বইও দেখিবার সুযোগ ঘটিয়াছে। ইতিমধ্যে বেঙ্গল পাবলিশার্স 'প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান' প্রকাশ করিয়াছেন। এই সকল নূতন সংবাদের আলোকে 'শনিবারের চিঠি'র গ্রন্থপঞ্জীর সংশোধন-সংযোজন অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িল। 'পরিচয়ে'র কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ তাঁহারা আমার গ্রন্থপঞ্জীটিই সংশোধন-সংযোজনের সুযোগ দিয়া পুনঃ প্রকাশিত করিতেছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে আমি আরও যাহা লিখিয়াছিলাম তাহাও সংরক্ষিত হইল :

শ্রীমান মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন-বাতি দুই প্রান্তে জ্বলিয়া শেষ পর্যন্ত নির্বাপিত হইল। গত ১৭ই অগ্রহায়ণ, ৩রা ডিসেম্বর সোমবার প্রত্যূষে কলিকাতার নীলরতন সরকার হাসপাতালে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। মাত্র পূর্বরাত্রিতে তিনি সেখানে সম্পূর্ণ অজ্ঞানাবস্থায় নীত হইয়াছিলেন; পরিবেশ-পরিবর্তনের দুঃখ তাঁহাকে সহিতে হয় নাই।

বিভিন্ন গল্পসংকলন-গ্রন্থে ও সাময়িকপত্রে তাঁহার জন্ম বৎসর সম্পর্কে দুই ভিন্ন মত প্রচারিত হইলেও (১৯০৮ এবং ১৯১০ সন) তাঁহার মৃত্যু যে অকালমৃত্যু তাহাতে সংশয় নাই। ৪ঠা ডিসেম্বরের 'স্টেট্‌স্‌ম্যান' সম্পাদকীয় ('Obituary') মন্তব্য করিয়াছেন—"...he spent the last years of his life seeking an escape from reality by external means."—তিনি বীরের মতো কঠোর বাস্তবের সম্মুখীন হন নাই; জীবনের শেষ কয় বৎসর বহির্বস্তুর সহায়তায় আত্মবিস্মৃতি খোঁজার মধ্যে তাঁহার পলায়নী মনোবৃত্তি ছিল। দলগত একটা কারণ দর্শাইয়া 'স্টেট্‌স্‌ম্যান' প্রসঙ্গটাকে ঘুলাইয়া তুলিয়াছেন। আমাদের তাহাতে প্রবৃত্তি নাই। আজ আমরা সকলেই শোকাহত, সকলেই বেদনাবিধুর।

কারণ, মানিক ছিলেন সত্যকার স্রষ্টা, সত্যকার সাহিত্যশিল্পী। যে কক্ষেই তিনি আবর্তন করুন, তাঁহার উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ন—সকল অয়নই ছিল সাহিত্য-সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া। সাহিত্য তাঁহার প্রাণ ছিল এবং প্রাণধারণেরও একমাত্র অবলম্বন ছিল। সাহিত্য-সেবার জন্য ছাত্র-জীবন অকালে খণ্ডিত করা অবধি এই সাহিত্যমার্গেই তাঁহার বিচরণ ছিল। অন্য কিছু তিনি করেন নাই, চেষ্টা করিয়াও করিতে পারেন নাই। বি. এস-সি. পড়িতে পড়িতে ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে, ১৯২৮ সনের ডিসেম্বরে মাসিক 'বিচিত্রা' পত্রিকায় তাঁহার সদ্য-রচিত সর্বপ্রথম গল্প (এবং সর্বপ্রথম রচনাও) "অতসীমামী" প্রকাশিত হওয়া ইস্তক গল্প-উপন্যাস-সৃষ্টি তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। তখন তাঁহার বয়স কতই বা হইবে! ১৯০৮ সনের মে-জুন মাসে (১৩১৫, জ্যৈষ্ঠ) জন্ম ধরিলেও সাড়ে কুড়ি বছর। এই সাহিত্যের নেশায় তিনি বুঁদ ছিলেন। অন্য নেশা তাঁহাকে আক্রমণ করিলেও তাহার আগুন তাঁহার দেহটাকে শুধু পুড়াইয়াছিল মনকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাহার প্রমাণ, তাঁহার মাত্র আটাশ বৎসরের সাহিত্য-কর্মের নিম্নলিখিত তালিকার মধ্যে মিলিবে।

মানিকের এই গ্রন্থগুলির এই কালানুক্রমিক তালিকা সংকলন

করিতে গিয়া আমাদের অত্যন্ত বেগ পাইতে হইয়াছে। গোড়ার দিকের বইগুলির প্রকাশকেরা গ্রন্থে সন-তারিখ দেন নাই, অনেকগুলি বইও আর চোখে দেখিবার উপায় নাই। পরবর্তী সংস্করণ বা সাময়িক পত্রে প্রদত্ত বিজ্ঞাপন দেখিয়া কালনির্ণয় করিতে হইয়াছে। কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, আমাদের এই কাজে প্রকাশকেরা যথাসাধ্য সহযোগিতা করিয়াছেন, বিশেষ করিয়া গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্সের কর্মচারীরা বিশ বৎসর পূর্বেকার খাতাপত্র ঘাঁটিয়া গোড়ার বইগুলির প্রকাশকাল সম্বন্ধে আমাদের নিঃসন্দেহ করিয়াছেন এবং "সাহিত্য-জগৎ"-এর স্বত্বাধিকারী শ্রীকালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মানিকের শেষ বইগুলি সম্বন্ধে অনেক অজ্ঞাত সংবাদ দিয়াছেন।···মানিকের প্রথম গ্রন্থের প্রকাশ সম্বন্ধে যাবতীয় সংকলন-গ্রন্থে ও সাময়িকপত্রে ভুল লেখা হইয়াছে এবং তাঁহার শেষ গ্রন্থ সম্বন্ধে কোনো কোনো দৈনিকপত্র ভ্রান্ত সংবাদ দিয়াছেন। ১৩৪০ বঙ্গাব্দে নয়, ১৩৪১ বঙ্গাব্দের ২৩ ফাল্গুন, ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মার্চ 'জননী' ছাপিয়া মানিক সর্বপ্রথম গ্রন্থকার-শ্রেণীভুক্ত হন এবং জীবিতকালে তাঁহার শেষ-প্রকাশিত গ্রন্থ 'মাশুল' "সাহিত্য-জগৎ" হইতে গত আশ্বিন মাসে (১৩৬৩) বাহির হয়। মৃত্যুর কয়েক দিন পরে বেঙ্গল পাবলিশার্স 'প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান' উপন্যাস ছাপিয়া বাহির করিয়াছেন। এই বইখানির মুদ্রণ শুরু হইয়াছিল দুই বৎসর পূর্বে এবং সম্ভবত এইটিরই একটি রূপান্তর বড়দিন-সংখ্যা কোনো সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। ডি. এম. লাইব্রেরি ছাপিতেছেন 'মাটি-ঘেঁষা মানুষ' উপন্যাস, ইহাও আকারে ছোট এবং 'মাসিক বসুমতী'তে অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত "একটি চাষীর মেয়ে"র রূপান্তর। ইহাও শীঘ্রই বাহির হইবে। শেষ উপন্যাস 'শান্তিলতা'র পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন "সাহিত্য-জগৎ"—ইহাও যথা-সময়ে মুদ্রিত হইবে। মানিকের গ্রন্থপঞ্জীর খসড়া এইরূপ :

১। 'জননী', উপন্যাস, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ৭ মার্চ ১৯৩৫, পৃ ২৮৪।

২। 'অতসীমামী', গল্প, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ৭ আগস্ট ১৯৩৫, পৃ. ২৬৭।

লেখকের নিবেদন: "রচনাকাল অনুসারে গল্পগুলি সাজানো হয়েছে। অতসীমামী আমার প্রথম রচনা। তারপর লেখার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সেটা স্পষ্টই বোঝা যাবে।"

গল্পের নাম: অতসীমামী, নেকী, বৃহত্তর-মহত্তর, শিপ্রার অপমৃত্যু, সর্পিল, পোড়াকপালী, আগন্তুক, মাটির সাকী, মহাসঙ্গম, আত্মহত্যার অধিকার—মোট দশটি।

৩। 'দিবারাত্রির কাব্য', উপন্যাস, ডি. এম. লাইব্রেরি, ডিসেম্বর ১৯৩৫, পৃ. ২০৪।

লেখকের নিবেদন: "দিবারাত্রির কাব্য আমার একুশ বছর বয়সের রচনা। শুধু প্রেমকে ভিত্তি করে বই লেখার সাহস ওই বয়সেই থাকে। কয়েক বছর তাকে তোলা ছিল। অনেক পরিবর্তন করে গত বছর [১৩৪১ বঙ্গাব্দ] বঙ্গশ্রীতে প্রকাশ করি।

দিবারাত্রির কাব্য পড়তে বসে যদি কখনো মনে হয়, বইখানা খাপছাড়া, অস্বাভাবিক—তখন মনে রাখতে হবে এটি গল্পও নয় উপন্যাসও নয়, রূপককাহিনী। রূপকের এ একটা নূতন রূপ। একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে, বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্পর্ক দিয়ে সীমাবদ্ধ করে নিলে মানুষের কতগুলি অনুভূতি যা দাঁড়ায়, সেইগুলিকেই মানুষের রূপ দেওয়া হয়েছে। চরিত্রগুলি কেউ মানুষ নয়, মানুষের projection—মানুষের এক এক টুকরো মানসিক অংশ।"

এই "নিবেদন" হইতে অনুমান হয়, মানিকের জন্ম সন ১৯০৮। ১৯১০ হইলে মানিক ১৯৩১ সনে ইহা লেখেন। আমরা 'বঙ্গশ্রী'র সম্পাদক থাকাকালে, ১৯৩৩ সনের শেষে এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি পাই। তাহা হইলে "কয়েক বছর তাকে তোলা" থাকার কথা সত্য হয় না।

শ্রীসজনীকান্ত দাসের 'আত্মস্মৃতি' ২য় খণ্ডের ৬১ পৃষ্ঠায় এই পুস্তক

সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—"শ্রীমান মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একটি গল্প ("সরীসৃপ," আশ্বিন ১৩৪০) লইয়া ['বঙ্গশ্রী'র] আসরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় বৎসরে একটি বিচিত্র উপন্যাস হস্তে তাঁহার শুভাগমন ঘটিল। এই উপন্যাসের ক্রমপরিণতির কাহিনীও বিচিত্র। আমার যতদূর ধারণা, এই উপন্যাসের ভিত্তিতেই মানিকের প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হয়। মানিক তখন কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে বলিলেও চলে। মুখচোরা লাজুক ছেলে, কিন্তু "সরীসৃপ" গল্পেই তাঁহার পোক্ত পরিণত মনের পরিচয় পাইয়াছিলাম ; সে মন সরল সাধারণ নহে, কুটিল জটিল অসাধারণ। লেখাটির পরিণতি সম্বন্ধে তখনও অব্যবস্থিতচিত্ত মানিক "একটি দিন" নামীয় একটি সম্পূর্ণ ছোটগল্পের আকারে উপন্যাসটি উপস্থিত করিলেন। পড়িয়াই বলিলাম, করিয়াছ কি? একটা উপন্যাসের সম্ভাবনাকে এমন ভাবে হত্যা করিবে? বিচলিত মানিক বিদায় লইলেন, আমি "একটি দিন" সম্পূর্ণ গল্পাকারেই ছাপিয়া দিলাম (বৈশাখ ১৩৪১)। অনতিবিলম্বে মানিক "একটি দিনে"র উপসংহার "একটি সন্ধ্যা" লইয়া উপস্থিত হইলেন। "একটি সন্ধ্যা"তেই শেষ হইল না, দুই সংখ্যা পরে সন্ধ্যা "রাত্রি"তে গড়াইল এবং আরও দুই সংখ্যা পরে "রাত্রি"—"দিবারাত্রির কাব্য" হইল। এই উপন্যাসের নাম পরিবর্তনে মানিকের মনের গঠনের ছাপ আছে। এই উপন্যাসটি ব্যক্তিগতভাবে আমার খুব প্রিয়, কারণ ইহার মধ্যস্থতায় আমি মানিককে জানিয়াছিলাম।"

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং ইহার পরবর্তী সংস্করণ ছাপিয়াছেন।

৪। 'পুতুলনাচের ইতিকথা', উপন্যাস, ডি. এম. লাইব্রেরি, ১৯৩৬ (?)

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রকাশিত ৫ম সংস্করণ চলিতেছে।

৫। 'পদ্মানদীর মাঝি', উপন্যাস, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২৮ মে ১৯৩৬, পৃ. ২০৮।

বেঙ্গল পাবলিশার্স ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন।

৬। 'জীবনের জটিলতা', উপন্যাস, ফাইন আর্ট পাবলিশিং হাউস, নভেম্বর ১৯৩৬ পৃ. ১৩১।

৭। 'প্রাগৈতিহাসিক', গল্প, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ১৭ এপ্রিল ১৯৩৭, পৃ ২২৪।

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ কর্তৃক প্রকাশিত পুনর্মুদ্রণ (জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৯) চলিতেছে।

গল্পের নাম: প্রাগৈতিহাসিক, চোর, মাটির সাকী, যাত্রা, প্রকৃতি, ফাঁসি, ভূমিকম্প, অন্ধ, চাকরী, মাথার রহস্য—'অতসীমামী'তে পূর্বে প্রকাশিত 'মাটির সাকী'কে বাদ দিয়া মোট নয়টি।

৮। 'অমৃতস্য পুত্রাঃ', উপন্যাস, কাত্যায়নী বুক স্টল, জুলাই ১৯৩৮, পৃ. ২২০।

৯। 'মিহি ও মোটা কাহিনী', গল্প, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮, পৃ. ১৬২।

গল্পের নাম: টিকটিকি, বিপত্নীক, ছায়া, হাত, বিড়ম্বনা, রকমারি, কবি ও ভাস্করের লড়াই, আশ্রয়, শৈলজ শিলা, খুকী, অবগুণ্ঠিত, সিঁড়ি—মোট বারোটি।

১০। 'সরীসৃপ', গল্প, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ১৭ আগস্ট ১৯৩৯, পৃ. ১৭৬।

গল্পের নাম: মহাজন, মমতা দি, মহাকালের জটার জট, গুপ্তধন, পাঁক, বিষাক্ত প্রেম, দিকপরিবর্তন, নদীর বিদ্রোহ, মহাবীর ও অচলার ইতিকথা, দু'টি ছোট্ট গল্প, সরীসৃপ—মোট এগারোটি।

১১। 'সহরতলী' প্রথম পর্ব, উপন্যাস, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ৯ জুলাই ১৯৪০, পৃ. ২০৮ (?)।

২য় সংস্করণ চলিতেছে।

১২। 'সহরতলী', দ্বিতীয় পর্ব, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ১৯৪১ (?), পৃ. ১৩৫।

ডি. এম. লাইব্রেরি কর্তৃক প্রকাশিত, ২য় সংস্করণ চলিতেছে।

১৩। 'বৌ', গল্প, উদয়াচল পাবলিশিং হাউস, ১৯৪৩ (?), ২য় সংস্করণ, ঐ ১৯৪৬, পৃ. ২৬৪।

গল্পের নাম: দোকানীর বৌ, কেরানীর বৌ, সাহিত্যিকের বৌ, বিপত্নীকের বৌ, তেজী বৌ, কুষ্ঠরোগীর বৌ, পূজারীর বৌ, রাজার বৌ, উদারচরিতানামের বৌ, প্রৌঢ়ের বৌ, সর্ববিদ্যাবিশারদের বৌ, অন্ধের বৌ, জুয়াড়ীর বৌ—মোট তেরটি।

১৪। 'সমুদ্রের স্বাদ', গল্প, বেঙ্গল পাবলিশার্স, সেপ্টেম্বর ১৯৪৩, পৃ. ১৫২।

গল্পের নাম: সমুদ্রের স্বাদ, ভিক্ষুক, পূজা কমিটি, আপিম, গুণ্ডা, কাজল, আততায়ী, বিবেক, ট্র্যাজেডির পর, মালী, সাধু, একটি খেয়া—মোট বারোটি।

১৫। 'প্রতিবিম্ব', উপন্যাস, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৯৪৩, পৃ. ৭৮। ২য় সংস্করণ, অক্টোবর ১৯৪৭, পৃ. ৯০।

১৬। 'ভেজাল', গল্প, সিগনেট প্রেস, ১৯৪৪, পৃ. ১৪৪।

গল্পের নাম: ভয়ঙ্কর, রোমান্স, ধনজনগৌরব, মুখে-ভাত, মেয়ে, দিশেহারা হরিণী, মৃতজনে দেহ প্রাণ, যে বাঁচায়, বিলামসন, বাস্, স্বামী-স্ত্রী—মোট এগারোটি।

১৭। 'দর্পণ', উপন্যাস, বুক এম্পোরিয়াম, জুন ১৯৪৫, পৃ. ৩২০। প্রথম সংস্করণের শেষে "সমাপ্ত প্রথম ভাগ" লেখা ছিল। কিন্তু বেঙ্গল পাবলিশার্সের দ্বিতীয় মুদ্রণে তাহা নাই।

"লেখকের কথা"—"প্রায় তিন বছর আগে উপন্যাসটি পাটনার একটি মাসিকে মাসে মাসে লিখতে আরম্ভ করেছিলাম; অন্য নাম দিয়েছিলাম। কিছু দিন লেখার পর নানা কারণে লেখা বন্ধ করি। আমার বইখানা সম্পুর্ণ করে দর্পণ নাম দিয়ে প্রকাশ করলাম।...আষাঢ় ১৩৫২।"

অসম্পূর্ণ লেখাটি পাটনার 'প্রভাতী' পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল।

১৮। 'হলুদপোড়া', গল্প, কমলা পাবলিশিং হাউস, ১৯৪৫।

গল্পের নামঃ হলুদপোড়া, বোমা, তোমরা সবাই ভালো, চুরি চুরি খেলা, ধাক্কা, ওমিলনাইন, জন্মের ইতিহাস, ভাঙা-ঘর, অন্ধ, ধাঁধা— মোট দশটি।

১৯। 'সহরবাসের ইতিকথা', উপন্যাস, ডি. এম. লাইব্রেরী, ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬। ২য় সং বেঙ্গল পাবলিশার্স, আষাঢ় ১৩৬০, জুন-জুলাই ১৯৩৪, পৃ. ১৭১।

লেখকের নিবেদন—"কয়েক বছর আগে একটি দৈনিক পত্রিকার [আনন্দবাজার] শারদীয় সংখ্যায় এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। কিছু অসম্পূর্ণতা ছিল, ঘষামাজা করার প্রয়োজনও ছিল। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবার সময় ঘটনাচক্রে ও সব কিছুই করা হয় নি।...এই সংস্করণে যথাসাধ্য সংশোধন করে দিলাম।...আমি ভূমিকা লেখার জন্যই একটা ভূমিকা জুড়ে দেওয়ার নীতির বিরোধী। দু'চারটি বইয়ে দু'চার লাইন ভূমিকা হয়তো দিয়েছি। 'সহরবাসের ইতিকথা'র কপালেই আমার সব চেয়ে বড় ভূমিকা জুটল।"

২০। 'আজ কাল পরশুর গল্প', গল্প, সংকেত-ভবন, এপ্রিল-মে ১৯৪৬, পৃ. ১৭০।

লেখকের নিবেদন—"গল্পগুলির প্রায় সমস্তই এক বছরের মধ্যে লেখা।"

গল্পের নাম—আজ কাল পরশুর গল্প, দুঃশাসনীয়, নমুনা, বুড়ী, গোপাল শাসমল, মঙ্গলা, নেশা, বেড়া, তারপর, স্বার্থপর ও ভীরুর লড়াই, শত্রুমিত্র, রাঘব মালাকর, যাকে ঘুষ দিতে হয়, কৃপাময় সামন্ত, নেড়ী, সামঞ্জস্য—মোট ষোলটি।

২১। 'ভিটেমাটি', নাটক, স্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স, মে ১৯৪৬, পৃ. ৯৬।

২২। 'চিন্তামণি', উপন্যাস, বেঙ্গল পাবলিশার্স, জুলাই ১৯৪৬, পৃ. ১০১।

২৩। 'পরিস্থিতি', গল্প, অগ্রণী বুক ক্লাব, অক্টোবর ১৯৪৬, পৃ. ১৬১।

গল্পের নাম—প্যানিক, সাড়ে সাত সের চাল, প্রাণ, রাসের মেলা, মাসি-পিসি, অমানুষিক, পেটব্যথা, শিল্পী, কংক্রীট, রিক্সাওয়ালা, প্রাণের গুদাম, ছেঁড়া—মোট বারোটি।

লেখকের নিবেদন—" 'প্যানিক' 'সাড়ে সাত সের চাল' ও 'রিক্সাওয়ালা' ছাড়া অন্য গল্পগুলি বছর খানেকের মধ্যে লেখা। 'প্যানিক' যুদ্ধের গোড়ার দিকে লেখা, অন্য দুটি তার পরবর্তী সময়ে।··· চারিদিকে দ্রুত ও বিরাট পরিবর্তনের কতকগুলি ছাড়া ছাড়া দিকের ছাপ গল্পগুলিতে আছে, সব কিছু বদলে যাচ্ছে এইটুকু শুধু গল্পগুলির একতা। সবগুলি গল্প মিলে বিশেষ কোনো অখণ্ড সমগ্রতা বা ধারা কতখানি গড়তে পেরেছে বলা কঠিন। ২৯শে ভাদ্র, ১৩৫৩।"

২৪। 'চিহ্ন', উপন্যাস, বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির, জানুয়ারী ১৯৪৭, পৃ. ১৯৬।

"লেখকের কথা"—"চিহ্ন বসুমতীতে প্রকাশিত হয়েছিল। কিছু সংশোধনও করেছি। বইখানা নতুন টেকনিকে লেখা, একে উপন্যাস বলা চলবে কি না আমার জানা নেই! এই ধরনের কাহিনী যার ঘটনা অল্প সময়ের মধ্যে দ্রুতগতিতে ঘটে চলে, এ ভাবে সাজালেই জোরালো হয় বলে মনে করি। মাঘ, ১৩৫৩।"

২৫। 'আদায়ের ইতিহাস', উপন্যাস, এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স লিঃ, ১৯৪৭ পৃ. ৮২।

২৬। 'খতিয়ান', গল্প, ভারতী ভবন ১৯৪৭ পৃ. ১৪৯।

গল্পের নাম—খতিয়ান, ছাঁটাই রহস্য, চক্রান্ত, কানাই তাঁতি, ভণ্ডামি, চোরাই, চালাক, টিচার, ছিনিয়ে খায় নি কেন, একান্নবর্তী—মোট দশটি।

২৭। 'চতুষ্কোণ', উপন্যাস, ডি. এম. লাইব্রেরী, ১৯৪৮ পৃ. ১৭৫।

২৮। 'মাটির মাশুল', গল্প, বিমলারঞ্জন প্রকাশন, ১৯৪৮, পৃ. ১৬৩।

গল্পের নাম—মাটির মাশুল, বক্তা, ঘর ও ঘরামি, পারিবারিক, ট্রামে, ধর্ম, দেবতা, নব আলপনা, ব্রীজ, ভয়ঙ্কর (নাট্যাকারে), আপদ, পক্ষান্তর, সিদ্ধপুরুষ, হ্যাংলা ও বাগদীপাড়া দিয়ে—মোট পনেরোটি।

২৯। 'অহিংসা', উপন্যাস, ডি. এম. লাইব্রেরি, ১৯৪৮, পৃ. ২৬১।

৩০। 'ধরাবাঁধা জীবন', উপন্যাস, ২য় সংস্করণ, ফাইন আর্ট পাবলিশিং হাউস, পৃ. ৯২।

৩১। 'ছোটবড়', গল্প, পূরবী পাবলিশার্স লিমিটেড ১৯৪৮ পৃ. ১৫৩।

গল্পের নাম—ভালবাসা, তথাকথিত, চালক, ছেলে-মানুষি, স্থানে ও স্তানে, স্টেশন রোড, পেরানটা, দীঘি, হারানের নাতজামাই, ধান, সাথী, গায়েন, নব আলপনা, ব্রীজ—মোট চোদ্দটি।

৩২। 'ছোটবকুলপুরের যাত্রী', গল্প, ইণ্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস লিঃ, ১৯৪৯, পৃ. ৯২।

গল্পের নাম—ছোটবকুলপুরের যাত্রী, বাগদীপাড়া দিয়ে, মেজাজ, প্রাণাধিক, ঘর করলাম বাহির, সখী, নীচু চোখে দু আনা দু পয়সা, নীচু চোখে মেয়েলি সমস্যা—মোট আটটি।

৩৩। 'জীয়ন্ত', উপন্যাস, বেঙ্গল পাবলিশার্স, জুন-জুলাই ১৯৫০, পৃ. ২৫৬। দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই-আগস্ট ১৯৫৪।

৩৪। 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প', গল্প, বেঙ্গল পাবলিশার্স, জুলাই-আগস্ট ১৯৫০ পৃ. ১।৶+২৩৮। ২য় মুদ্রণ, মে-জুন ১৯৫৩, শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্যের ভূমিকা।

গল্পের নাম—প্রাগৈতিহাসিক, টিকটিকি, আত্মহত্যার অধিকার, সরীসৃপ, কুষ্ঠরোগীর বৌ, হলুদপোড়া, সমুদ্রের স্বাদ, বিবেক, আফিম, আজ কাল পরশুর গল্প, যাকে ঘুষ দিতে হয়, নমুনা, দুঃশাসনীয়, কংক্রিট, শিল্পী, হারাণের নাত-জামাই, বিচার, ছোটবকুলপুরের যাত্রী—মোট আঠারোটি।

৩৫। 'মানিক-গ্রন্থাবলী'—প্রথম ভাগ, বসুমতী-সাহিত্য মন্দির, জুলাই-আগস্ট ১৯৫০, পৃ. ২৩৬।

ইহাতে আছে—জননী, হলুদপোড়া, চতুষ্কোণ, আজ কাল পরশুর গল্প।

৩৬। 'পেশা', উপন্যাস, ডি. এম. লাইব্রেরি, ১৯৫১, পৃ. ২০০।

৩৭। 'স্বাধীনতার স্বাদ', উপন্যাস, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০ জুন ১৯৫১, পৃ. ২৬১।

লেখকের কথা—"এই উপন্যাসটি ১৩৫৬-৫৭ সালে মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ বইখানা লেখা হয়েছিল তিন বছর আগে শেষ হয় ৫৭এর গোড়ার দিকে।"

লেখকের নিবেদনে ভুল আছে। 'মাসিক বসুমতী'তে 'নগরবাসী' নামে ইহা প্রকাশিত হয় ১৩৫৫ সালের বৈশাখ হইতে। শেষ হয় ১৩৫৭ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে।

৩৮। 'সোনার চেয়ে দামী', (১ম খণ্ড—বেকার) উপন্যাস, বেঙ্গল পাবলিশার্স, মে-জুন ১৯৫১, পৃ. ১২৭।

৩৯। 'ছন্দপতন' উপন্যাস, নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড, নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৫১, পৃ. ১৬৬।

৪০। 'সোনার চেয়ে দামী', (২য় খণ্ড—আপোষ) উপন্যাস, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ফেব্রুয়ারি ১৯৫২, পৃ. ২২৭।

লেখকের কথা—বিজ্ঞাপিত ডাক নাম "মালিক" হয়ে গেল "আপোষ"।

৪১। 'মানিক-গ্রন্থাবলী',—দ্বিতীয় ভাগ, বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির, ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৯৫২, পৃ. ১০৭+৩০+৬২।

ইহাতে আছে—অহিংসা, ধরাবাঁধা জীবন, ছোটবড়।

৪২। 'ইতিকথার পরের কথা', উপন্যাস, বেঙ্গল পাবলিশার্স আগস্ট ১৯৫২ পৃ. ২৬৫।

লেখকের নিবেদন—"এই উপন্যাসটি নতুন সাহিত্য পত্রিকায়

ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। পুস্তকাকারে প্রকাশ করার সময় অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্জন করা হয়েছে। ভাদ্র ১৩৫৯।"

৪৩। 'পাশাপাশি', উপন্যাস, বেঙ্গল পাবলিশার্স, সেপ্টেম্বর ১৯৫২, পৃ. ২০৬।

৪৪। 'সার্বজনীন', উপন্যাস, ডি. এম. লাইব্রেরি, অক্টোবর ১৯৫২, পৃ. ২৫২।

"লেখকের কথা"—"এই কাহিনীর মূল ভিত্তি হল সমাজের ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবনের সঙ্কীর্ণ সীমা ভেঙে গিয়ে সার্বজনীন ব্যাপকতার মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা করার যে নতুন গতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে [তার ওপর]।"

৪৫। 'আরোগ্য', উপন্যাস, ক্যালকাটা বুক ক্লাব, ১৯৫৩, পৃ. ১৮৪।

৪৬। 'তেইশ বছর আগে পরে', উপন্যাস, ক্যালকাটা পাবলিশার্স, অক্টোবর ১৯৫৩, পৃ. ২৩৩।

৪৭। 'নাগপাশ', উপন্যাস, সাহিত্য-জগৎ, এপ্রিল ১৯৫৩, পৃ. ১৯৬।

৪৮। 'ফেরিওলা', গল্প, ক্যালকাটা পাবলিশার্স, মে ১৯৫৩, পৃ. ১৪৩।

লেখকের নিবেদন—"গত দু বছর ধরে গল্পগুলি বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। গল্পগুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লেখা, কিন্তু গল্পগুলির মধ্যে সমসাময়িক সামাজিক জীবনের মূলসূত্রের একটা যোগাযোগ আছে বলেই আমার বিশ্বাস। বৈশাখ,…১৩৬০।"

গল্পের নাম—ফেরিওলা, সখি, সংঘাত, সতী, লেভেল ক্রসিং, ধাত, ঠাঁই নাই ঠাঁই চাই চুরি-চামারী, দায়িক, মহাকর্কট বটিকা, আর না কান্না, মরব না সস্তায়. এক বাড়িতে—মোট তেরোটি।

৪৯। 'চালচলন', উপন্যাস, ডি. এম. লাইব্রেরী, জুন-জুলাই ১৯৫৩, পৃ. ১১৩।

৫০। 'লাজুকলতা', গল্প, রীডার্স কর্ণার, জানুয়ারী ১৯৫৪, পৃ. ১৬০।

"লেখকের কথা"—"এই সংকলনের অধিকাংশ গল্প তিন চার বছরের মধ্যে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। একটি গল্প সংকলনে মূল একটি সূত্রের ভিত্তিতে, অর্থাৎ সমাজ জীবনে কোনো একটি বিশেষ সময়ের বিশেষ অবস্থার ছোট ছোট কাহিনীর মধ্যে যে মিলটা স্বভাবত থাকে তাকে আশ্রয় করে গল্প চয়ন করা আমি বাঞ্ছনীয় মনে করি। এই সংকলনেও সেই চেষ্টা করেছি।···কোজাগরী পূর্ণিমা ১৩৬০।"

গল্পের নাম—লাজুকলতা, উপদলীয়, এদিক ওদিক, এপিঠ ওপিঠ, পাশ ফেল, কলহান্তরিত, গুণ্ডা, বাহিরে ঘরে, চিকিৎসা, মীমাংসা, সুবালা, অসহযোগী, আপদ, স্বাধীনতা, নিরুদ্দেশ, পাষণ্ড—মোট ষোলটি।

৫১। 'শুভাশুভ', উপন্যাস, ডি. এম. লাইব্রেরি, অক্টোবর ১৯৫৪, পৃ. ২৬০।

লেখকের কথা—"কয়েক বছর আগে একটি অজ্ঞাতনামা ছোট নূতন মাসিক পত্রিকায় এই উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে লিখতে সুরু করেছিলাম। কয়েক মাস প্রকাশিত হবার পর পত্রিকাটির অকাল মৃত্যু ঘটে এবং যথারীতি আমারও বইটি শেষ করার উৎসাহে ভাটা পড়ে যায়। এত দিন পরে আবার নতুন করে গোড়া থেকেই বইটি লিখে ফেলেছি। এটি আমার পরীক্ষামূলক উপন্যাস।"

৫২। 'হরফ', উপন্যাস, সাহিত্য-জগৎ, মে ১৯৫৪, পৃ. ২৪৪।

৫৩। 'পরাধীন প্রেম', উপন্যাস, রীডার্স কর্ণার, মে ১৯৫৫ পৃ. ১৮৯।

৫৪। 'হলুদ নদী সবুজ বন', উপন্যাস, নিউ এজ পাবলিশার্স লিঃ, ফেব্রুয়ারী ১৯৫৬, পৃ. ২৭৮।

"লেখকের কথা"—"হলুদ নদী সবুজ বন আট দশ মাস আগে বেরিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। আমার শরীর খারাপ, এই দোষে বইটা এত দিন আটক হয়েছিল। দোষ আমার··।"

৫৫। 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ব-নির্বাচিত গল্প', গল্প, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, জুন ১৯৫৬, পৃ. ২২৯।

স্বহস্তের প্রতিলিপিতে "লেখকের কথা"—গল্প নির্বাচনে কোন্‌টা আগে কোন্‌টা পরে সে বিচার করি নি। গল্পের বিচারে ধারাবাহিকতার হিসাবটাই নিরর্থক। দশজনে আমার যে গল্পকে যতটা সমাদর করেছেন মোটামুটি সেটাই আমি এই সংকলনের জন্য গল্প নির্বাচনের মাপকাঠি ধরে নিয়েছি।

২৫ বৈশাখ ১৩৬২।

গল্পের নাম—বৃহত্তর-মহত্তর, নেকী, চোর, ফাঁসি, ভূমিকম্প, টিকটিকি, বিপত্নীক, সিঁড়ি, মহাকালের জটার জট, হলুদপোড়া, চুরি চুরি খেলা, ফাঁদ, রাঘব মালাকর, প্রাক্‌ শারদীয় কাহিনী, রক্ত নোন্‌তা, হারানের নাতজামাই, ভিক্ষুক, ধান, বিবেক, শিল্পী—মোট কুড়িটি।

৫৬। 'মাশুল', উপন্যাস, সাহিত্য-জগৎ, অক্টোবর ১৯৫৬, পৃ. ২১৪।

(মৃত্যুর পরে প্রকাশিত)

৫৭। 'প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান', উপন্যাস; বেঙ্গল পাবলিশার্স, ডিসেম্বর, ১৯৫৬, পৃ. ১০৮।

প্রকাশিতব্য নূতন দুইখানি উপন্যাস ধরিয়া মানিকের উপন্যাসের সংখ্যা ৪০, নাটক ১, গল্পের বই ১৬, নির্বাচিত গল্প ২ = মোট ৫৯ খানি বই। গল্পের সংখ্যা ১৯২।

মানিকের 'পদ্মা নদীর মাঝি'র ইংরেজি অনুবাদ 'Boatman of the Padma' রচনা করিয়াছেন শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক : কুতুব, বোম্বাই। ১৯৪৮, পৃ. ১৮৭। ইহার একটি অনুবাদ 'Rodare Pa Padma' (Viveca Barthel কৃত) 'Folk vid floden' নামক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়া ১৯৫৩ সনে স্টকহম হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। রুশীয় ও চীনাভাষায়ও অনুবাদ হইয়াছে শুনিয়াছি, অনূদিত গ্রন্থ চোখে দেখি নাই।

বাংলা কথা-সাহিত্যের বিপুল আসরে মানিকের যথাযথ স্থাননির্ণয়ের চেষ্টা পণ্ডিত ও রসিকজন সময় ও অবকাশমত করিবেন। ইতিমধ্যে

মোহিতলাল তাঁহার 'সাহিত্য-বিতান'-এ ও ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার 'বঙ্গসাহিত্যের উপন্যাসের ধারা'-য় এই কাজ কতকটা অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন। অধ্যাপক শ্রীমান জগদীশ ভট্টাচার্য 'শ্রেষ্ঠ গল্পে'র ভূমিকায় মানিকের গল্পগুলির যে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহাও উল্লেখযোগ্য। আরও অনেকে, যথা—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, অনিল বিশ্বাস, লীলা রায়, নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রন্থে মানিক-সাহিত্য সম্পর্কে ক্ষুদ্র বৃহৎ আলোচনা করিয়াছেন। আমরা এখন এখানে যথাসাধ্য উপাদান-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি, কালপ্রবাহে যে সকল উপাদান হারাইয়া গিয়া সমূহ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা তাহাই ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছি। অনেক ফাঁক ও অসম্পূর্ণতা থাকিয়া গেল, মানিকের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত অপেক্ষাকৃত তরুণ কোনও সাহিত্যিক যদি আমাদের ত্রুটিপূরণে অগ্রসর হন তাহা হইলে মানিক-সম্পর্কিত বাহ্য উপাদান সম্পূর্ণ সংগৃহীত হইতে পারে এবং ভবিষ্যতে রসিক ব্যক্তিরা এই সকল উপকরণের সাহায্যে মানিকের যথাযথ মূল্যবিচারও করিতে পারিবেন। যে পরিশ্রম আমাদের সাধ্যে কুলাইল না, তাহা যে একান্ত প্রয়োজন তাহার কারণস্বরূপ বলিতে পারি শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত 'রংমশাল' নামক শিশু-মাসিকপত্রে মানিক 'মশাল' নামে যে ধারাবাহিক গল্প লিখিতেছিলেন তাহার শেষাংশ লিখিত হইয়াছে কি না, ১৩৫৪-৫৫ বঙ্গাব্দে 'মাসিক বসুমতী'তে মানিকের 'মাটি' নামক যে ক্ষুদ্র অথচ ধারাবাহিক গল্পটি বাহির হইয়াছে তাহার শেষ পরিণতি কি? অর্থাৎ 'মাটি' প্রকাশিত কোন উপন্যাসে বিবৃত হইয়াছে? ফাল্গুন ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ হইতে 'একটি চাষীর মেয়ে' নামক যে উপন্যাসখানি এখন পর্যন্ত অনিয়মিতভাবে 'মাসিক বসুমতী'তে বাহির হইয়া সম্পূর্ণ হয় নাই, ডি. এম. লাইব্রেরীর প্রকাশিতব্য উপন্যাস 'মাটি-ঘেঁষা মানুষ'-এর সহিত তাহার অমিল কতখানি? 'চিন্তামণি' উপন্যাসটি 'পূর্বাশা'য় বাহির হইয়াছিল কি? হইয়া থাকিলে তাহার কি নাম

ছিল ? মানিকের লেখা 'চাষী' 'মজুর' প্রভৃতি দুই তিনখানি নাটকের নাম পরম্পরায় শুনিলাম, কিন্তু কোথাও তাহার কোনো সন্ধান মিলিল না। এইগুলিকে খুঁজিয়া বাহির করা আবশ্যক। শ্রীমান প্রাণতোষ ঘটকের নিকট সংবাদ পাইলাম, মানিক 'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশার্থ 'একটি চাষীর মেয়ে'র উপসংহার 'কুলির বৌ'-এর একটি অধ্যায় মাত্র তাঁহাকে দিয়া গিয়াছেন। পরবর্তী অংশ লেখা হইয়াছে কি না ? মানিকের বিবিধ গল্প-সংগ্রহ-গ্রন্থে মুদ্রিত গল্পগুলি ছাড়া নানা সাময়িক পত্রে, শারদীয় সংখ্যাগুলিতে পুস্তকাকারে অমুদ্রিত আরও অনেক গল্প ছড়াইয়া থাকা সম্ভব। কয়েকটি বারোয়ারী উপন্যাসেও মানিকের সহযোগিতা ছিল, সেগুলির সন্ধান লইয়া মানিক-লিখিত অধ্যায়গুলি বাছাই করাও দরকার। অনেক বার্ষিক ও সাময়িক সংকলনগ্রন্থে তাঁহার গল্প সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, যেমন—'কথাগুচ্ছ', 'কথা-শিল্প', 'আমার প্রিয় গল্প', 'মহামন্বন্তর', ১৩৫১ (৫২, ৫৩, ৫৪)র সেরা গল্প, 'আজকের ছোট গল্প', 'নতুন লেখা' প্রভৃতি। এইগুলিতে প্রকাশিত সব গল্প মানিকের গল্পগ্রন্থভুক্ত হইয়াছে কি না ? এইরূপ আরও নানাপ্রশ্নের অচিরাৎ সমাধান চাই এবং এখনই তৎপর হইয়া "মিসিং লিঙ্ক"গুলি খুঁজিয়া বাহির করা প্রয়োজন। প্রবন্ধ-সাহিত্য ও কাব্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁহার দানের পরিমাণও নির্ধারিত হওয়া আবশ্যক।

মানিকের জীবনীর উপকরণ যৎসামান্য। বিবিধ দৈনিক ও সাময়িক পত্র ও গল্পসংকলনগ্রন্থ হইতে যেটুকু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি. তাহা এই :

মানিকের পৈতৃক নিবাস ঢাকা বিক্রমপুরের অন্তর্গত মালবদিয়া গ্রাম। পিতা শ্রীহরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় এখন অষ্টাশীতিপর বৃদ্ধ, মাতা নীরদাসুন্দরী পূর্বেই গত হইয়াছেন। মানিক ছয় ভাইয়ের মধ্যে চতুর্থ, বোনও চারিজন। বড় ভাইয়েরা সকলেই কৃতী ; উচ্চ চাকুরিজীবী।

পিতা প্রথমে ছিলেন সেটেলমেন্টের কানুনগো, পরে সাব ডেপুটি

কালেক্টর হইয়া অবসর গ্রহণ করেন। চাকরিব্যপদেশে তাহাকে বাংলা ও বিহারের বহু স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত। কাজেই মানিক জন্মের পর হইতে কলিকাতা আগমন পর্যন্ত বহু স্থানের ও বহু মানুষের ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করিয়াছেন। ১৯০৮ সনের মে-জুন মাসে মানিকের জন্ম হয় ডুমকায়, ১৯২৬ সনে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন মেদিনীপুর হইতে, আই. এস-সি. পাস করেন বাঁকুড়া ওয়েস্‌লিয়ান মিশন কলেজ হইতে ১৯২৮ সনে। কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে বি. এস-সি পড়িতে পড়িতে সাহিত্য-জীবন শুরু হয়। বি. এস-সি আর পাস করা হয় নাই। জীবনে এই আকস্মিক গতি পরিবর্তনেই সম্ভবতঃ দাদাদের স্নেহবঞ্চিত হইয়া স্বতন্ত্র হইয়া পড়েন। সামান্য কিছুকালের জন্য সামান্য বেতনে (মাসিক আড়াই শো টাকা নয়!) 'বঙ্গশ্রী'র সহকারী সম্পাদকের এবং ন্যাশনাল ওয়ারফ্রন্টের চাকরি ইহারই ফল। তাঁহাকে প্রধানত নিজের সাহিত্য কর্মের উপরই নির্ভর করিতে হয়। ১৯৩৮ সনে ময়মনসিংহের গবর্নমেণ্ট গুরুট্রেনিং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ৺সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা কমলা দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। কমলার দিদি অমিয়া দেবী প্রখ্যাত সাহিত্যিক চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র সাহিত্যিক প্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহধর্মিনী। বরাহনগরে আমরা সাহিত্যিকেরাই এই বিবাহে মোড়লি করিয়াছিলাম। মানিক দুই কন্যা দুই পুত্রের পিতা, কন্যাটি জ্যেষ্ঠ—বয়স আন্দাজ পনের।

তাঁহার পিতৃদত্ত নাম প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাকনাম ছিল মানিক। ১৯২৮ সনের ডিসেম্বরে (পৌষ ১৩৩৫) তাঁহার সর্বপ্রথম গল্প 'অতসীমামী'র লেখক হিসাবে এই ডাকনামটাই ব্যবহার করেন। সাহিত্যক্ষেত্রে সেই নামটাই স্থায়ী হইয়াছে।

নিজের সাহিত্য-জীবনের কথা তিনি যৎসামান্য এখানে-ওখানে বলিয়াছেন। তন্মধ্যে জ্যোতিপ্রসাদ বসু-সম্পাদিত 'গল্প লেখার গল্পে' (জুলাই ১৯৪৮), ১৯৫৪ সনের ১২ই মে প্রদত্ত তাঁহার বেতার ভাষণ

এবং 'ফ্যাশিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' কর্তৃক প্রকাশিত (জানুয়ারি ১৯৪৪) 'কেন লিখি' পুস্তিকায় তাঁহার বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। 'তেইশ বছর আগে পরে' উপন্যাসের গোড়ায় নিজের কথা একটু বলিয়াছেন। তাঁহার জীবন ও আদর্শের বাকি কথা তাঁহার গল্প-উপন্যাসগুলি হইতেই আহরণ করিয়া লইতে হইবে। অন্যান্য লেখক ও মানুষের (তাঁহার সম্বন্ধীয়) স্মৃতিকথাও কম মূল্যবান হইবে না।

মানিক স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য-বরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অবর্তমানে তাঁহার পরিবারকেও এই দারিদ্র্য-লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে কি না মানিকের জীবিত দাদারা তাহা নির্ধারণ করিবেন। না করিলে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার এবং তাঁহার বন্ধু-বান্ধব-দেশবাসীর দায়িত্ব গুরুতর। আমরা প্রস্তাব করি, আপাততঃ এই বৎসরে তাঁহাকে রবীন্দ্র-পুরস্কার পাঁচ হাজার টাকা দিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রাথমিক দায়িত্ব পালন করুন। এখন পর্যন্ত যাঁহারা এই পুরস্কার পাইয়াছেন মানিক তাঁহাদের কাহারও অপেক্ষা যোগ্যতায় ন্যূন নহেন। তাঁহার সাহিত্য-সৃষ্টির ভার কতখানি তাহা আমরা দেখাইলাম। ধারের কথা পণ্ডিত ও রসিকেরা বিচার করিবেন। আমরা শুধু এইটুকু নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, মৃত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অন্ততঃপক্ষে পাঁচখানি উপন্যাস ও গল্পপুস্তক রচনা করিয়াছেন, যাহা বিশ্বসাহিত্যের দরবারে সাদরে স্বীকৃত হইবে এবং বাংলা দেশের সাহিত্যকে অধিকতর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিবে।

পরিচয় ॥ পৌষ ১৩৬৩ ॥

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

স্মৃতি

বছর তুই আগের কথা। তারও কিছুদিন আগে থেকে শুনতে পাচ্ছিলাম মানিকবাবু অসুস্থ। তাঁর বরানগরের বাসা আমাদের পাইকপাড়া থেকে বেশি দূরে নয়। তবু যাই যাই করে যাওয়া হচ্ছিল না। আমার যা অভ্যাস তাতে এমন অনেক গন্তব্য স্থানেই বহুকাল ধরে মনে মনে যাতায়াত চলে তারপর হঠাৎ কোনো একদিন ট্রামে কি পায়ে হেঁটে গিয়ে উপস্থিত হই।

কিন্তু যাওয়াটা অবিলম্বিত হবার আরো একটা কারণ ঘটল। এক নতুন প্রস্তাব নিয়ে নিশীথ এসে হাজির হল আমাদের বাসায়। কুড়ি বাইশ বছরের এই ছেলেটি খুবই সাহিত্যপ্রেমিক। লেখকদের সান্নিধ্যে যাওয়ায় তাঁদের সাহচর্যে আসায় ওর উৎসাহের অন্ত নেই। এই একটা বয়স। যে বয়স দান আর গ্রহণের জন্যে সব সময় উৎসুক থাকে, হৃদয়ের পাত্রে প্রীতি আর শ্রদ্ধার অর্ঘ্য যখন অফুরন্ত মনে হয়।

ঘরে বসে বসে এই নিশীথের চোখ দিয়ে অনেকদিন দেখেছি তখনকার দিনের মানিকবাবুকে। তাঁর নাওয়া-খাওয়া হাঁটা-চলার খুঁটিনাটি দৈনন্দিন বিবরণ শুনতাম তার মুখ থেকে। নিশীথও বরানগরের নাগরিক। ওদের একটা সাংস্কৃতিক ক্লাব আছে। নিশীথ দে সে ক্লাবের পাণ্ডাদের মধ্যে একজন। বিশিষ্ট সদস্য, নানা উপলক্ষে সে মানিকবাবুর বাসায় যাওয়া-আসা করে। প্রচ্ছন্ন লক্ষ্য বোধহয় একজন প্রধান লেখকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের গৌরব। তার মুখে শুনতাম মানিকবাবু কবে ওদের ক্লাবের বার্ষিক অধিবেশনে গিয়ে

বক্তৃতা করেছিলেন, কবে যাওয়ার কথা ছিল শেষ পর্যন্ত যেতে পারেননি, মানিকবাবু কোন গয়লার কাছ থেকে দুধ নিতে নিতে তার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে গল্প করেন, কোন কয়লাওয়ালা তাঁকে কয়লা জোগায়, কি কি ধরনের খাদ্য মানিকবাবুর প্রিয়, কোন শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে তাঁর বেশি মেলামেশা—সব খবর নিশীথের মুখস্থ।

কিন্তু বলতে বলতে হঠাৎ সেই শ্রদ্ধাবান উৎফুল্ল তরুণের মুখে কিসের একটা ম্লানছায়া পড়ত। বলতে বলতে থেমে যেত নিশীথ। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলত, কিন্তু মানিকবাবুকে আর বাঁচানো যাবে না। অভ্যাসটা তিনি কিছুতেই ছাড়তে পারলেন না।

কী অভ্যাস তা আমরা সবাই জানি। অভিযোগ নয়, আফশোস। এধরনের আফশোস শুধু নিশীথের মুখে নয় প্রত্যেক অনুরাগী, স্বজন-বন্ধু, পাঠক-প্রকাশকের কথাবার্তায় ধরা পড়ত। তাঁর শেষজীবন তাঁর অনুরাগী হিতাকাঙ্ক্ষীদের পরম ক্ষোভ আর নিরাশার দীর্ঘশ্বাসের মতো।

যেদিনের কথা বলছি সেদিন নিশীথের গলায় কিছুটা আশার সুর শুনলাম—মানিকবাবু অনেকটা সামলে উঠেছেন, এবং সামলে চলেছেন। নতুন উপন্যাস শুরু করেছেন তিনি। কিন্তু নিশীথ জানে তাঁর এখন বেশ কিছু টাকার দরকার। বাড়িভাড়া বাকি, আরো যেন সব কি কি খাতে দেনা রয়েছে। জমাখরচের খাতায় জমার অঙ্কের চেয়ে খরচের অঙ্ক অনেক বড়ো! নিশীথরা এই সমস্যার সমাধানে সাধ্যমত যৎসামান্য সাহায্য করতে চায়। ওদের ক্লাব থেকে ওরা একটি নাচগানের বিচিত্র অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে। চিত্র-জগতের এবং বেতারজগতের শিল্পীদের নিয়ে আসবে সাধ্য-সাধনা করে। হয় টিকেটে না হয় কার্ডে দর্শকদের কাছ থেকে চাঁদা তুলবে। খরচ-খরচা বাদে যা থাকে তা ওরা ধরে দেবে মানিকবাবুর পায়ের কাছে। টাকার তোড়া নয়, ফুলের তোড়ার মতো।

আমি বললাম, 'বেশ তো কর ব্যবস্থা।'

কিন্তু নিশীথ বলল তার আগে মানিকবাবুর অনুমতি নেওয়া দরকার। ওভাবে টাকা তোলায় তাঁর যদি মনে মনে আপত্তি থাকে, তিনি যদি কিছুমাত্র ক্ষুণ্ন হন তাহলে সে বড় দুঃখের ব্যাপার হবে।

নিশীথ বলল, 'তার চেয়ে আপনি চলুন আমাদের সঙ্গে। ওঁকে সব কথা বুঝিয়ে বলবেন, ওঁর যদি মত পাই তাহলেই আমরা কাজে নামব।'

বললাম 'নিশীথ আমার যে মুখ নেই, আমি কি করে তোমাদের মুখপাত্র হব। তোমরা বরং বলিয়ে-কইয়ে আর কোনো একজনকে সঙ্গে নাও।'

নিশীথ হেসে বলল, 'আপনাকে তো আর সভায় বক্তৃতা করতে হবে না। মানিকবাবুর সঙ্গে কথা বলবেন তাতে অত ভয় কিসের? আমরা কত কথা বলি কত সহজে তাঁর কাছে যাই। তিনি একেবারে সাধারণ মানুষের মতো সাধারণ মানুষের মধ্যে থাকেন। তাঁর কাছে গিয়ে আবদার উৎপাত করতে কখনো আমাদের সংকোচ হয় না। আমরা পারি আর আপনি পারবেন না?'

পারব না কেন, তবু দ্বিধা যেটুকু মনের মধ্যে আছে তা ভয়ে নয়, ভাবনায়। নিশীথের আর আমার বয়স একরকম নয়, মানিকবাবুর সম্পর্কে আমাদের দুজনের স্থানও আলাদা আলাদা। আমার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের কথা নিশীথ যতটা অনুমান করে আসলে আমি যে ততটা মনে করিনে তা মুখ ফুটে কি করে বলি, টাকা তোলার কথাটা তাঁকে কি ভাবে বলব, তিনি কোন অর্থে নেবেন তার ঠিক কি। আমাদের লেখকদের অহংবোধ বড় তীব্র। তাতে ঝঙ্কার লাগলে সাহিত্যসৃষ্টি হয়, টঙ্কার লাগলে প্রলয়কাণ্ড ঘটে। কুপিত দুর্বাসা আমরা যতই জাহির করতে থাকি, 'অয়মহং ভোঃ, অয়মহং ভোঃ' আনমনা শকুন্তলার তা কানে যায় না।

মানিকবাবুর সঙ্গে দেখাসাক্ষাত অবশ্য আমার অনেক বছর ধরে অনেক দিনই হয়েছে। ধর্মতলায় চারতলার ওপরে 'প্রগতি লেখক

শিল্পী সঙ্ঘে'র আসরে বসে একাধিক দিন ওঁর গল্প পড়া শুনেছি, প্রতিকূল সমালোচনা হাসিমুখে (মনে যাই থাক) সহ্য করতে দেখেছি। আমি সে আলোচনায় যোগ না দিলেও বাক্যালাপ একেবারে বন্ধ করে থাকিনি। বক্তা না হলে বক্তৃতা দেওয়া যায় না কিন্তু কথক না হলেও কথা বলা যায়।

তবু ঠিক মনের কথা আদানপ্রদান হবার সুযোগ মানিকবাবুর সঙ্গে আমার তেমন ঘটেনি। কলেজ স্ট্রীটের পাবলিশার-পাড়ায় কোনো কোনোদিন তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে। তিনি হেসে জিজ্ঞাসা করেছেন, 'কি খবর ? লেখা-টেখা কেমন চলছে ?'

আমি জবাব দিয়েছি, 'এই কোনো রকম।'

আমি পাল্টা প্রশ্ন করেছি, 'আপনার খবর কি। শরীর কেমন আছে ?'

'ভালো।'

'কেমন লিখছেন-টিখছেন ?'

তিনি মৃদু হেসে জবাব দিয়েছেন, 'এই কোনো রকম।'

পরিবারে তাঁর পোষ্যের সংখ্যা বেশি শুনে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'আপনার ছেলে মেয়ে ক'টি ?'

তিনি হাতের চারটি আঙ্গুল উঁচু করে দেখালেন।

আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, 'মোটে ?'

তিনি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি কি ভেবেছিলেন ? এক ডজন ?'

এমনি ছিঁটেফোঁটা টুকটাক কথা। দীর্ঘসময় ধরে সাহিত্য রাজনীতির আলোচনা, পরিবারগত, ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের কথা তাঁর সঙ্গে আমার হয়নি।

অবশ্য বহু জটিল চরিত্রের স্রষ্টা এই মানুষটিকে আরো কাছে থেকে দেখতে মাঝে মাঝে লোভ যে না হয়েছে তা নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে গেছি। মানুষের কাছে গেলেই কি সব সময় কাছের মানুষ

হওয়া যায়? ইচ্ছায় অনিচ্ছায় নানা ধরনের নানা রঙের ছদ্মবেশের চাদর আমরা গায়ে জড়াই, মুখে সাধু-সজ্জনের মুখোস আঁটি আর নিজের মনের সঙ্গে লুকোচুরি খেলার তো শেষ নেই। সত্যিকারের হৃদয়-দরজা ভিতর থেকে বন্ধ থাকে। কড়া নেড়ে নেড়ে আগন্তুকের হাতে কড়া পড়ে, তবু দ্বার খোলে না।

মানুষের কাছে যাওয়া সহজ নয়।

কিন্তু নিশীথ নাছোড়বান্দা। সে আমাকে সঙ্গে নেবেই।

দু'এক তারিখ এদিক-ওদিক হল। শেষ পর্যন্ত একদিন বেলা ৯টা-সাড়ে ৯টায় বরানগরের বাস ধরলাম।

বাস থেকে নেমে খানিকক্ষণ অলিগলি ঘুরে একটি একতলা বাড়ির সামনে এসে নিশীথ বলল, এই যে মানিকবাবুর বাসা।

সামনে উঠানের মতো খানিকটা ফাঁকা জায়গা। তার পিছনে ঘর, কপাটের একটি পাট খোলা আর একটি বন্ধ। ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ছে একজন দীর্ঘকায় পুরুষ খোলা গায়ে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে কি যেন লিখছেন। মানিকবাবুকে চিনতে দেরি হল না। কিন্তু এমন সময় তাঁকে ডেকে লেখার ব্যাঘাত করব কিনা সে সম্বন্ধে মন স্থির করতে দেরি হতে লাগল। কিন্তু দোর-গোড়া থেকে ফিরে যাওয়াও কাজের কথা নয়। বিশেষ করে আমরা যখন একটা দরকারী কাজেই এসেছি।

নিশীথ শেষ পর্যন্ত অস্ফুট স্বরে ডাকল, 'মানিকবাবু।'

তিনি সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, বাইরে এসে বললেন 'কি ব্যাপার?'

তারপর আমার দিকে চোখ পড়ায় কিছু স্মিত কিছু বা বিস্মিত মুখে বললেন, 'আপনি! আসুন ভিতরে।'

এর আগে মানিকবাবুকে বইয়ের দোকানে সাহিত্যের বৈঠকে অনেকবার দেখেছি। কিন্তু তাঁর নিজের ঘরে পারিবারিক পরিবেশে এই প্রথম। মানুষকে তাঁর পরিবারের পটভূমিতে না দেখলে ঠিক

যেন পরিপূর্ণ করে দেখা হয় না। একক মানুষ পুরো এক নয় ভগ্নাংশ মাত্র, তা তিনি লেখকই হোন আর অলেখকই হোন।

কিন্তু এ কি ঘরদোর, আসবাবপত্রের এ কি ছন্নছাড়া চেহারা! সস্তা একজোড়া টেবিল চেয়ার। একপাশে আচ্ছাদনহীন একখানা তক্তপোষ। দেয়ালে ঠেস-দেওয়া কাঁচভাঙা আলমারিতে এলোমেলো-ভাবে রাখা একরাশ বই। বেশির ভাগই ছেঁড়াখোঁড়া পুরোন মাসিক-পত্র। বইপত্রে পাণ্ডুলিপির এলোমেলো পাতায় অগোছালো অপরিচ্ছন্ন টেবিল। তক্তপোষের ওপর পাণ্ডুলিপির খানিকটা অংশ পড়ে আছে।

আমি বিস্মিত হলাম। মানিকবাবুর ঘরের এই চেহারাই যেন সবচেয়ে মানানসই। এ যেন বাইরের ঘর নয়, স্রষ্টার মনের অন্দরমহল। যেখানে ঝড়-ঝঞ্ঝা বৃষ্টি-বিদ্যুতের বিরাম নেই।

পা ঝুলিয়ে তক্তপোষের ওপর আমি আর নিশীথ পাশাপাশি বসলাম। মানিকবাবু চেয়ারটা ঘুরিয়ে নিয়ে আমাদের দিকে চেয়ে বললেন, 'কি ব্যাপার?'

ব্যাপার আগে না বলে গোড়ায় খানিকক্ষণ ভূমিকা করে নিয়ে বললাম, 'কেমন আছেন?'

মানিকবাবু সংক্ষেপে বললেন, 'ভালো।'

'মাঝখানে শরীরটা বোধহয় খারাপ ছিল?'

তিনি তাড়াতাড়ি বললেন, 'এখন ভালো আছি।'

শরীরের কথা ছেড়ে সাহিত্যের কথা ধরলাম।

বললাম, 'কি লিখছিলেন?'

মানিকবাবু বললেন, 'একটা উপন্যাস।'

আমি বললাম, 'অনেকদিন গল্পটল্প কিছু লেখেন না। এই উপন্যাস শেষ করে বোধহয় কিছু লিখতে পারেন?'

মানিকবাবু বললেন, 'তার কি কোনো মানে আছে? উপন্যাস লিখতে লিখতে যদি ছোটগল্প লেখার ইচ্ছা হয় তাহলে গল্পই লিখব। উপন্যাস লিখলে বেশি টাকা পাব বলে কি উপন্যাসই লিখব? সংসারের

প্রয়োজন, পাবলিশারের তাগিদ কিছুতেই লেখকের হাত-পা বেঁধে দিতে পারে না।'

আমি বললাম, 'সত্যিই তো, হাত বাঁধো পা বাঁধো মন বাঁধে কে।'

তিনি একটু হেসে বললেন, 'চা হবে?'

তারপর আমার উত্তরের প্রতীক্ষা না করে ভিতরের ঘরের দিকে তাকিয়ে তিনি চায়ের ফরমায়েস করলেন।

আমি বললাম, 'এখানে কে কে থাকেন?'

তিনি বললেন, 'দারা-পুত্র-পরিবার যাদের থাকার নিয়ম তারা সবাই আছে। আর হ্যাঁ, আমার বাবাও আছেন সঙ্গে। আমার এই ঘরের মধ্যেই পর্দার আড়ালে ওদিকটায় রয়েছেন। এই একখানা মাত্র ঘর। এখানে থাকার কষ্ট, খাওয়ার কষ্ট, আরো নানারকমের অসুবিধে। আমার ভাইদের কাছে গেলে কত সুখে থাকতে পারেন, তাদের অবস্থা ভালো। কিন্তু তা তিনি যাবেন না। আমার সঙ্গেই থাকবেন।' গলায় কোনো আবেগ নেই একটু যেন অপ্রসন্নতার আভাস। কিন্তু কেন যেন আমার মনে হল এটা তাঁর ভাব নয়, ভঙ্গি। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির মতো, তাঁর স্টাইলের আপাত-রূঢ়তার মতো মানিকবাবুর এই অমসৃণতা।

আমি বললাম, 'তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে পারি?'

তিনি বললেন, 'আলাপ আর কি করবেন। বুড়ো মানুষ। তাছাড়া ওঁর শরীরটাও তেমন ভালো নেই। তবে দেখতে চান দেখতে পারেন। একটু এগোলেই পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখতে পাবেন।'

নিশীথ বসে রইল। কিন্তু আমি তার চেয়েও অল্পবয়সী ছেলের ছেলেমানুষী কৌতূহল নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে মানিকবাবুর বাবাকে দেখে নিলাম। পাকা চুল-দাড়িওয়ালা আশি বছরের বুড়ো। এক অপরিসর তক্তপোষের ওপর জীর্ণ চেহারা নিয়ে চুপচাপ বসে আছেন। আমি সাড়া দিয়ে শব্দ করে তাঁর তন্ময়তা ভাঙলাম না। ফিরে এসে নিজের জায়গায় বসলাম।

আমার মনে পড়ল 'পুতুলনাচের ইতিকথা', মনে পড়ল শশি আর তার বাবা গোপালের কথা। একই সঙ্গে প্রীতি আর বিদ্বেষ, স্নেহ বাৎসল্য আর রেষারেষি, শ্রদ্ধার সঙ্গে অমর্যাদার মনোভাব মেলানো পিতা-পুত্রের এমন জটিল সম্পর্কের কথা বাংলা-সাহিত্যের আর কোনো বইতে নেই। মনে মনে ভাবলাম শশির মধ্যে মানিকবাবু কতখানি আছেন আর গোপালের মধ্যে তাঁর বাবা? সাহিত্যে বাস্তব চরিত্র কতখানি রূপ পায়, কতখানিই বা বিরূপ হয়ে অপরূপ হয়ে ওঠে? নিজের প্রতিকৃতি কি লেখকের নিজের কলমে সম্পূর্ণ ফুটে ওঠে না কি তা তিনি ফুটতে দিতে চান? এখানেও কতরকমের লুকোচুরি খেলা চলে। লেখকের প্রকাশ্য জীবনীর মধ্যে তাঁর অন্তর্জীবনের কথা কতটুকু ধরা পড়ে? যেখানে তিনি ধরা দিতে চান না সেখানেই হয়তো ধরা পড়ে যান, যেখানে ধরে দিতে চান সেইখানেই হয়তো পেরে ওঠেন না। বস্তুতন্ত্রী হয়েও সৃষ্টিযন্ত্রের এই রহস্য আমি মানি। জীবনের অনেক কথাই জানিনে একথা বলতে লজ্জা পাইনে।

মনে মনে ভাবলাম পর্দার ওপাশে বসে বাবা দেখছেন ছেলেকে। দেখছেন তাঁরই সৃষ্ট রক্তমাংসের একটি প্রাণ আরও অনেক প্রাণবন্ত নর-নারীর সৃষ্টি করে চলেছেন। কালির অক্ষরে তারা তৈরি, তবু তারাও রক্তমাংসের। বাসনায়-বেদনায় নিরাশায়-প্রত্যাশায় অস্থির অশান্ত উৎফুল্ল উৎসুক তারাও এই দেশেরই অধিবাসী। শুধু লোক-গণনার সময় তাদের ধরা হয় না এইটুকুই যা তফাৎ। বাপ দেখছেন ছেলেকে। তাঁর কীর্তি অকীর্তি আসক্তি নিরাসক্তি সব ইতিহাসেরই তিনি সাক্ষী। মানিকবাবুর বাবা কি সব সময়েই পর্দার আড়ালে নিজের আসনে অমন চুপচাপ বসে থাকেন? না কি দুরন্ত অবুঝ অশান্ত মত্ত ছেলেকে আদেশে উপদেশে স্নেহে আর শাসনে বেঁধে রাখতে চান? এই পর্দার আড়ালটা যখন উঠে যায় তখন কি হয় ওঁদের অবস্থা? তখন মানে অভিমানে স্বাদে বিস্বাদে ভরা অসংখ্য দৃশ্য কি দু-একখানা পঞ্চাঙ্ক নাটকে ধরে? সহজে কি তার যবনিকাপাত হয়?

আমার লোভ বেড়ে গেল। বললাম, 'মানিকবাবু, আপনার বাবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন না। কিন্তু তাঁর পুত্রবধূর সঙ্গে তো আলাপ করতে পারি, না কি তাতেও বাধা আছে?' তিনি হেসে বললেন, 'বিলক্ষণ, বাধা কিসের। যান না ভিতরে।' তারপর ছোটো মেয়েটিকে ডেকে বললেন, 'ওঁকে তোমার মার কাছে নিয়ে যাও। উনি আলাপ করবেন।'

হাসিমুখে কিন্তু একটু পরিহাসভরা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন মানিকবাবু। মনে মনে হয়তো বা ভাবলেন, 'বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা। তুমি আমার ঘরে এসেছ চরিত্রের উপাদান খুঁজতে!'

কিন্তু প্লট কি চরিত্রের জন্যে নয়, ছেলেমানুষী কৌতূহল তৃপ্তির জন্যেও নয়, ভিতরকার একটা অশান্ত উদ্বেগ এবং আবেগ নিয়েই আমি মানিকবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলাম। সাধারণ আটপৌরে বেশবাসের আড়ালে একটি সাধারণ গৃহস্থ-বধূ। তাঁর রূপ-বর্ণনা দিয়ে দরকার নেই, ভাবরূপই যথেষ্ট। কারণ এ ধরনের বউ মধ্যবিত্ত লেখক পাঠকের সংসারে সাহিত্যে ঘরে ঘরে আছে। সাধারণ বেশবাস, সাধারণ বিদ্যাবুদ্ধি, সাধারণ চেহারার আড়ালে অসাধারণ সংগ্রামের ইতিহাস। এ ইতিহাসের নায়িকারা লক্ষ্মীবাঈ নয়, শুধু লক্ষ্মী।

আমরা দুজনে পরস্পরের দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলাম তিনি বললেন, 'নমস্কার।'

আমি বললাম, 'নমস্কার।'

একটু বাদে বললাম, 'আমি মানিকবাবুর ভক্ত পাঠকদের একজন আমার কাছে কোন সংকোচ করবেন না।'

তিনি একটু হেসে বললেন, 'সংকোচ কিসের?'

বললাম, 'মানিকবাবু আছেন কেমন?'

সঙ্গে সঙ্গে হাসি নিভে গেল।

তিনি বললেন, 'ভালো না।'

'উনি যে বলছিলেন—।'

তিনি বললেন, 'উনি ওই রকমই বলেন।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'চিকিৎসার কি ব্যবস্থা হচ্ছে ?'

'কি আর হবে ? এখানে থাকলে কিছুই হবে না। সেদিন সুভাষবাবু আর দেবীবাবু এসেছিলেন। কত বলে গেলেন হাসপাতালে যেতে। কিন্তু উনি কিছুতেই যাবেন না। ওঁর এক গোঁ। সেখানে গেলে নাকি ওঁর কিছু সারবে না।'

বললাম 'ওসব কি ছেড়ে দিয়েছেন ?'

তিনি বললেন, 'কই আর।'

বললাম, 'মাত্রা-টাত্রা কি কিছু কমিয়েছেন ?'

তিনি বললেন, 'কখনো কমে, কখনো বাড়ে। তার কিছু ঠিক নেই।'

বললাম, 'আচ্ছা, কেমন হচ্ছে ?'

তিনি একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'কি জানি।'

বুঝতে পারলাম তাঁর পক্ষেও সব জানা সহজ নয়, জানানো আরো কঠিন।

না জেনে অসঙ্গত প্রশ্ন করে বসেছি।

এই সুরাসক্তির মূল যে কি মানিকবাবু নিজেই কি তার সবকথা জানতেন ? নিজের সৃষ্ট চরিত্রগুলির মন তিনি যেমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে দেখেছেন নিজের মনকেও কি তেমনি তিনি চিরে চিরে ছিঁড়ে ছিঁড়ে দেখেছেন ? উল্‌টে পালটে দেখেছেন নিজের জীবনকে ? মূল বের করতে পেরেছেন সব ভুলের ? ভুলকে ভুল বলে স্বীকার করেছেন কি ?—হয়তো করেছেন। হয়তো আত্মদ্রোহে আর অন্তর্দ্বন্দ্বে ছিন্নভিন্ন করেছেন নিজেকে। সে কাহিনী আজ আর জানবার যো নেই। জানিনে তিনি কোনোভাবে তা জানিয়ে গেছেন কিনা। কিংবা ইচ্ছা করলেও কি সব জানানো যায় ? অনেকের মতে জানানো সঙ্গতও নয়। তাতে সমাজের অনিষ্ট বই ইষ্ট হয় না। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এর ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি বলে গেছেন কবির জীবনী

তাঁর কাব্যে। তার অতিরিক্ত যা তা অকাব্য, অপ্রকাশ্য। আমরা তাঁর কথা অনেকখানি রাখতে চাই তবু সবটুকু ঢাকতে চাইনে।

অদ্ভুত এই আসক্তি। তা সুরারই হোক নারীরই হোক আর অর্থেরই হোক। আসক্তির আতিশয্যের মতো অসঙ্গত অশোভন অযৌক্তিক অনাসৃষ্টি আর কিছু নেই, তবু তা আছে। আর আশ্চর্য তা আছে শিল্পসৃষ্টির সঙ্গে জড়িয়ে। একটু এদিক-ওদিক হলেই তা সেই সৃষ্টিকে ধ্বংস করে ছাড়ে।

যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক মন একথা মানতে চায় না। সে খুরপি হাতে আগাছা নিংড়ে ফেলতে চায়। ফেলতে পারলেই ভালো।

বসবার ঘরে এসেও মানিকবাবুর স্ত্রীর কথা ভুলতে পারলাম না। শিল্পী সাহিত্যিকদের ঘরণী হওয়া অবিমিশ্র সুখের নয় সৌভাগ্যেরও নয়। রসস্রষ্টা স্বামীর অনেক নীরস বিরস দুঃসহ মুহূর্তের খোঁচায় বার বার তাঁকে অকারণে বিদ্ধ হতে হয়। তিনি শুধু ফুলশয্যার অংশীদার নন, শরশয্যারও অংশভাগিনী ; বাইরে থেকে ফুলের মালা যখন স্বামীর গলায় পড়ে কাঁটার মালা তাঁকে নিজেকে পরতে হয়।

এবার মানিকবাবুকে বললাম নিশীথদের পরিকল্পনার কথা। তিনি শুনে বললেন, 'বেশতো। কিন্তু দেখবেন মশাই টাকা দেওয়ার আশা দিয়ে শেষ পর্যন্ত নিরাশ করবেন না যেন। আমি হয়তো ওটাকা হিসেবের মধ্যে ধরব কিন্তু শেষে দেখব সব ফাঁক। তাতে বড় অসুবিধে হয়।'

নিশীথ বলল, 'না না, তা হবে না।'

মানিকবাবুর এই স্থূল ধরনের কথায় আমি একটু বিস্মিত হলাম। ওঁর হয়তো টাকার প্রয়োজন খুবই বেশি। কিন্তু অমন করে বলাটা কি ঠিক হয়েছে ?

বলাটা ঠিক না হলেও তাঁর আশঙ্কাটা কিন্তু ঠিকই ছিল। যতদূর জানি নিশীথরা তাঁর হাতে কিছুই পৌঁছে দিতে পারে নি। উদ্যোগ আয়োজনে আর আর্টিস্টদের গাড়িভাড়ায় তাদের সব পুঁজি নিঃশেষ হয়েছিল।

বিদায় নিয়ে আসার সময় বললাম, 'মানিকবাবু, আপনার কাছে আমাদের এখনো অনেক দাবি, অনেক প্রত্যাশা। আপনি শুধু আপনার নিজের নন, আপনার দারাপুত্র পরিবারেও নন, আপনি বাংলা দেশের। আর সাহিত্যকে যদি দেশ দিয়ে না বাঁধি, তা হলে যে-কোনো দেশের।'

মানিকবাবু চুপ করে রইলেন। আমার নভেলী ভাষা, নাটকীয় ভঙ্গিতে তিনি মনে মনে হাসলেন কিনা কি জানি।

আমি বললাম, 'নিশীথরা কিন্তু আপনার জন্যে খুব ভাবে।'

মানিকবাবু এবার হাসিমুখে আমার দিকে তাকালেন, তারপর স্নিগ্ধ কোমল স্বরে বললেন, 'তা জানি। শুধু ভাবে কেন, করেও। সকলেই তার সাধ্যমত এমন কি সাধ্যের অতিরিক্ত করতেও চায়। এদিক থেকে কারো বিরুদ্ধে আমার কোনো নালিশ নেই। বাংলা দেশের লোকে তাদের লেখকদের ভারি ভালোবাসে।'—তাঁর রোগক্লিষ্ট মুখ প্রসন্ন পরিতৃপ্তিতে ভরে উঠল।

এই ভালোবাসার কথা আমার সঙ্গে তাঁর শেষ কথা নয়। কিন্তু বিশিষ্টতায় মনে রাখবার মতো।

পরিচয় ॥ পৌষ ১৩৬৩ ॥

গোপাল হালদার

মানিক-প্রতিভা

প্রায় ৩৬খানা উপন্যাস ও ১৭টি গল্প-সংকলনে মোট প্রায় ১৭৭টি ছোটো গল্প রেখে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গত ৩রা ডিসেম্বর (১৯৫৬ ইং) চিরবিদায় গ্রহণ করেছেন। তাঁর ৪৬ (বা ৪৮) বৎসরের অকাল-নিমীলিত জীবনের ও ২৮ বৎসরের সাহিত্যিক জীবনের সাক্ষ্য এই বিপুল দান। শোকাচ্ছন্ন বন্ধুদের পক্ষে এখনো তা পরিমাপ করা দুঃসাধ্য। এমন কি, তাঁর সকল লেখার সঙ্গে বহু পাঠক পরিচয়ও রাখতে পারেন নি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত গ্রন্থসমূহের সঠিক তালিকা সংকলন করতে গিয়ে গবেষণা-কুশল বন্ধুরাও বিপন্ন বোধ করেন। তাই তাঁর বিস্মৃতপ্রায় রচনাসমূহ ও বিলীয়মান স্মৃতিগুলিকে সযত্নে আহরণ করাও তাঁর বন্ধুদের ও সাহিত্যানুরাগীদের একটি গুরুতর দায়িত্ব। সে দায়িত্ব এখন পালন না করলে পরবর্তী কালে তা আরও দু:সাধ্য হবে: কারণ, বাঙলাদেশে পাঠক-সাধারণের মনের সম্মুখে থেকেও এমন করে স্ব-সমাজের কৌতূহলদৃষ্টির অগোচর হয়ে যেতে বোধহয় আর কোনো সাহিত্যিক পারেন নি। অথচ ৩রা ডিসেম্বরের শোকযাত্রায় ও ৭ই ডিসেম্বরের শোকসভায় যেভাবে সাহিত্যিক ও যুবক সমাজ স্বতঃ উৎসারিত বেদনায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করেন তাতে স্পষ্টই বুঝা যায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিভা ও সৌহার্দ্য সামাজিক পুরস্কার ও অভিনন্দনের উপেক্ষা না রেখে কত গভীর ও নিবিড়ভাবে তাঁর দেশবাসীর ও সাহিত্যিক বন্ধুদের হৃদয় স্পর্শ করেছিল। অবশ্য আত্মীয়তা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দু'টি পথ তাঁদের সম্মুখে এখনো উন্মুক্ত আছে—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবার-পরিজনের প্রতি কর্তব্য-পালন তাঁদের সামাজিক কর্তব্য ;

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য-প্রতিভার সহিত তাঁর স্বদেশবাসীর ও বিদেশীয়দের পরিচয়-সাধন তাঁদের সাহিত্যিক কর্তব্য। কারণ, সাহিত্যিকের অমর-সত্তা সাহিত্য-আলোচনার সূত্রেই অমরত্ব লাভ করে, শোকাভিভূত বন্ধুগণের পক্ষেও তা স্মরণীয়। শ্রদ্ধা ও দায়িত্বের সহিত সমকালীন সাহিত্যিকগণ সে কর্তব্যপালনে অগ্রসর হলে সেই সাহিত্যিক কর্তব্যই পালন করবেন।

॥ ১ ॥

বহু শিথিল প্রয়োগ সত্ত্বেও 'জিনিয়াস' বা 'প্রতিভা' কথাটার একটা গভীর তাৎপর্য আছে। নৈসর্গিক সত্যের মতোই ক্বচিৎ তার আবির্ভাব এবং তর্কাতীত তার প্রকাশ। এ সহজাত কবচকুণ্ডল নিয়ে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকরাও অনেকেই জন্মেন না তবু 'জিনিয়াস' বা 'প্রতিভা' ছাড়া মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্টিশক্তিকে আর কিছু বলার উপায় নেই। তাঁর অশান্ত প্রাণশক্তি ও প্রাণঘাতী পরিণামের দিকে তাকিয়ে এই কথাই মনে হয়—এ শুধু প্রতিভা নয়, এ তাঁর প্রকৃতি। এই তাঁর নিয়তি। সেই সঙ্গে তাই এই কথাও মনে হয়—এ প্রতিভা আত্মসচেতন প্রতিভা নয়, আত্মবিচার ও আত্মগঠন এ প্রতিভার ধর্ম নয়।

ইউরোপীয় ভাষায় যে দুর্জয় শক্তিকে 'ডীমন্' বলে অভিহিত করা হয়, আমরা তাকে কি নাম দিতে পারি জানি না। সর্ব নীতি-নিয়মের অতীত সেই মানসশক্তি যেন নিজেই একমাত্র নিয়ম, নিয়তির মতোই সে অলঙ্ঘ্য ও অনিবার্য। যে শুধু সামাজিক নীতি-নিয়মের অতীত নয়। যাকে সে আশ্রয় করে তার দৈহিক মানসিক সমস্ত জীবনকেই সে কবলিত করে একমাত্র আপনার অমোঘ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়ে নেয়। অলৌকিকতায় বিশ্বাসীরা তাকে 'ডেভিল' বলতে পারেন; আর আমাদের অদৃষ্টবাদের দেশে বিমূঢ় হতাশায় আমরা তাকে 'নিয়তি'ও বলতে পারি। 'মেফিস্টোফিলিসে'র রূপকেও আমাদের বুদ্ধিগ্রাহ্য করে

তুলতে পারে কবিকল্পনা—সেই ক্রূর নিষ্ঠুর শক্তি যাকে কবলিত করে দানবীয় ঐশ্বর্যের বিদ্যুচ্ছটায় বিচ্ছুরিত হয় তার নানা রীতি। আর সেই বিদ্যুজ্জ্বালাতেই ঝল্‌সে যায় তার দেহ, তার মন, তার আত্মা। কিন্তু এ রূপকেও আমাদের প্রয়োজন নেই। আমরা এ শক্তিকে 'প্রকৃতি'ও বলতে পারতাম, 'প্রবৃত্তি'ও বলতে পারতাম; কিন্তু 'প্রতিভা' বলেই এ ক্ষেত্রে আমরা তাকে স্বীকার করতে বাধ্য। আর তার স্বরূপ বুঝলে বলতে পারি—এ হচ্ছে 'বিদ্রোহী প্রতিভা'—বিদ্রোহেই যার আত্মপ্রকাশ, আর তাই আত্মনাশ যার আত্মপ্রকাশেরই প্রায় অপরিহার্য অঙ্গ।

বাঙলা-সাহিত্যে 'বিদ্রোহী প্রতিভা'র সঙ্গে আমাদের আরও সাক্ষাৎকার না ঘটেছে তা নয়। আমরা মাইকেলকে জানি, নজরুলকে দেখেছি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও ছিলেন তাঁদের সগোত্র। আত্মরক্ষার বুদ্ধি এঁদের নেই, এঁদের অশান্ত প্রতিভাকে আত্মবিনাশ থেকে বিরত করে এমন সাধ্যও কারো হয় না। অবশ্য একই গোত্রের হলেও এঁরা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র, স্রষ্টা মাত্রই যেমন বিশিষ্ট। তা ছাড়া দেশকালের যোগাযোগ নানা রূপেই প্রত্যেকের পার্থক্য সুচিহ্নিত করে তোলে।

॥ ২ ॥

প্রতিভার জন্ম-রহস্য আজও অজ্ঞাত, পিতৃমাতৃ-পরিচয়ে তার সূত্র-সন্ধান করা বৃথা। ১৯০৮-এই হোক বা ১৯১০-এই হোক, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যখনি জন্মে থাকুন, ভদ্র শিক্ষিত পরিবারের বৈজ্ঞানিক মনীষাসম্পন্ন তাঁর অগ্রজদের কথা উল্লেখ করেও তাঁর প্রতিভার পরিচয় দান করা সম্ভব হয় না। বরং পদ্মাতীরে তার পৈতৃক বাসভূমি ও পিতৃ-কর্মোপলক্ষে নানা অঞ্চলের সঙ্গে তাঁর অচিরস্থায়ী পরিচয়,—এই পরিবেশের স্থূল বা সূক্ষ্ম চিহ্ন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুর্দান্ত প্রাণ-শক্তিতে ও তাঁর অস্থির, নির্মায়িক শিল্প-চেতনায় সন্ধান করা যেতে পারে। অবশ্য প্রতিভার গতি-প্রকৃতিও শুধু পরিবেশের আক্ষরিক

বিচার দ্বারা (এনভাইরন্‌মেণ্টালিজম্‌-এর সূত্রে) বুঝা যায় না ;
প্রতিভারও নিজস্ব প্রকাশ-রীতি আছে। না হলে পদ্মাতীরের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথেরই মত।

'হে পদ্মা আমার,
তোমায় আমায় দেখা কত শতবার।'

বলে অপূর্ব রহস্যাবেশে কৃতার্থ হতে পারতেন ; 'পদ্মানদীর মাঝি' লিখবার কথা তাঁর মনেও উঠত না। কিংবা, রাঢ়ের গ্রামে-প্রান্তরে আপনাকে তিনি তেমনি উদাস দৃষ্টিতে হারিয়ে ফেলতে পারতেন 'গ্রামছাড়া ওই রাঙা মাটির পথে'। এরূপ অবকাশ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে ঘটেনি, তার প্রথম কারণ—তাঁর প্রতিভা সম্পূর্ণ ভিন্ন গোত্রের—রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার মতো তা সুসংহত প্রতিভা নয়, সুষমায় যার অধিষ্ঠান, অপ্রমত্ত সাধনায় যা আপনাকে প্রকাশিত করবে। কাল ও দেশের সঙ্গে ঘাত-প্রতিঘাতে যাঁরা আপন ব্যক্তি-প্রকৃতির সামঞ্জস্য সাধন করতে করতে আপন ব্যক্তিস্বরূপকে আবিষ্কার করতে পারেন, প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন এবং নব-নব প্রকাশে নিজ শক্তিকে বিকশিত করে তুলতে পারেন, তেমন সম্পূর্ণ ও আত্মগঠন-সমর্থ প্রতিভা মানিকের ছিল না। তাঁর প্রতিভা—বিদ্রোহী প্রতিভা। বিদ্রোহই তার মূল প্রকৃতি। তাই পরিবেশের ঘাত-প্রতিঘাতে একদিকে নব-নব স্পর্ধায় তা স্পর্ধিত হয়ে উঠেছে ; অন্য দিকে সেই স্পর্ধার সূত্রেই আপনাকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করেছে, উৎসারিত ও বিচ্ছুরিত করে দিয়েছে। এই সুতীব্র প্রকাশ যেমন সেই প্রতিভার ধর্ম, এই প্রচণ্ড বিনাশও তেমনি সেই প্রতিভার ধর্ম। এ জন্যই মনে হয়, প্রকৃতিই বুঝি এর নিয়তি, 'ক্যারেকটার ইজ ডেস্টিনি'।

কিন্তু প্রতিভার গতিপ্রকৃতি বিচারে দ্বিতীয় সত্যটিও এরূপই স্বীকার্য। বিশেষ বিশেষ পরিবেশে এই প্রতিভার গতি-প্রকৃতি কতকাংশে নির্ধারিত হয়ে ওঠে, তাতে ভুল নেই। এজন্যই মাইকেল বা নজরুলের সঙ্গে একদিকে সগোত্র হলেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্বতন্ত্র—মাইকেল

উনবিংশ শতকের জাগরণের যুগে যে আশা-উদ্দীপনায় অস্থির হয়ে উঠেছিলেন তাতে তাঁর বিদ্রোহী প্রতিভা বিপ্লবী প্রতিভায় উন্নীত হতে পেরেছিল। আমাদের কলোনিয়াল জীবনের সংকীর্ণতায় ও গ্লানিতে তা অতি অল্পকালের মধ্যেই আপনার ঐশ্বর্য খুইয়ে ফেলে; তারপর থেকে মাইকেল নিষ্প্রভ। শুধু 'আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়' বলে সেই বিরাট প্রতিভা জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেল। নজরুলও বিংশ শতকের মানবমুক্তির একটা মহালগ্নকে আশ্রয় করে একবারের মত এমনি বিপ্লবী চেতনায় আপন বিদ্রোহী প্রতিভাকে উদ্দীপ্ত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কাল-সংঘাতে তা সম্ভব হয় নি। বিদ্রোহী কবির আত্মদ্রোহী রূপই ক্রমে তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেললে।

যুগ-সংকটের যেই তীব্রতর লগ্নে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবির্ভাব তখন আর সাময়িকভাবেও এরূপ মহৎ আশায় প্রবুদ্ধ হওয়া সম্ভবপর ছিল না। বিংশ শতকের ১৯২৫ থেকে ১৯৩৫ পর্যন্ত কালটি বিশ্ব-সংকটেরও একটি তমিস্রা-ঘন পর্ব। বিচক্ষণ বৈজ্ঞানিকের—সোবিয়েত সাম্যবাদ "এক নূতন সভ্যতা?"—এ প্রশ্ন অবশ্য উদিত হয়েছে। কিন্তু পৃথিবীব্যাপী তখন আর্থিক সংকট, ফ্যাশিস্ত-দানবতার তখন দাপট। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বদেশে ও সাহিত্যেও তখন পর্বটা শুধু রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের পর্ব নয়। ইউরোপের প্রথম যুদ্ধোত্তর পর্বের অশ্রদ্ধাকে (সিনিসিজম) বাঙালী নাকীসুরে ও বর্ণচোরা ভাবালুতায় ঢালাই করছিলেন অতি-আধুনিক সাহিত্যিকরা—নকল হলেও এটা একটা পর্ব-লক্ষণ। কারণ প্রতিবাদের সুর সার্থকভাবে তুলেছিলেন শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র প্রমুখ লেখক গোষ্ঠী। কৃতী তরুণ লেখকেরা অনেকেই সন্ধান করছিলেন কৃতিত্বের পথ, কিন্তু যুগের নিজস্ব রূপ বা নিজেদের বাণীরূপ তখনো তাঁদের চেতনায় প্রতিভাত হয় নি। বরং রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাই আপনার নবীন বিকাশে তরুণদের সেই অসংবদ্ধ প্রতিবাদ-প্রয়াসকে লজ্জা দিয়ে সার্থক হয়ে উঠল কাব্যে, উপন্যাসে। অন্য দিকে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত স্রষ্টা সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁর

অকৃত্রিম জীবনবোধ ও বিস্ময়রসের পাত্র নিয়ে উপস্থিত হয়ে সেই বিক্ষোভ ও প্রতিবাদের সুরকে যেন মিথ্যা বলে প্রমাণ করে দিতে চাইলেন। কিন্তু যে বিক্ষোভ শতাব্দীর নাড়ীতে নাড়ীতে জমেছে,—দেশের পাঁজরে পাঁজরে যার দাগ পড়ছে,—তা এভাবে মিথ্যা হয়ে যায় না এ কথা বলাই বাহুল্য। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য-ক্ষেত্রে আবির্ভূত হন এই সত্যকে ঘোষণা করে—রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য-সুষমাবাদে আর তার কুলোয় না। অতি-আধুনিকের প্রতিবাদ এবার নাস্তিকের বিদ্রোহে রূপায়িত হল। আর মানিকের বিদ্রোহী প্রতিভা যুগের সেই সঞ্চিত বিক্ষোভকে যে রূপদান করলে তা বাঙলা সাহিত্যে তার পুর্বে বা পরে এখন পর্যন্ত আর কারও দ্বারা সম্ভব হয় নি। কারণ প্রতিভার অধিকারী আর কেউ সে যুগ-ব্যাধিকে এমন করে অনুভব করতে পারেন নি।

কিন্তু এইটিই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেষ কথা নয়। সভ্যতার সেই শব-ব্যবচ্ছেদ-সূত্রেই এই সত্যেরও আভাস পান লেখক—শবটাই সব নয়। শব শুধু জীবন-হীন দেহ। আর জীবন একটা পরমাশ্চর্য সত্য,—তাঁর বিদ্রোহী প্রতিভা তাকে মানতে না চাইলেও সে সত্যই থাকবে। এইখান থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাধনার দ্বিতীয়ার্ধের সূচনা। বিদ্রোহী প্রতিভার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ মানবতায় বিশ্বাসী লেখকের। জীবনে ও মানবতায় বিশ্বাস নিয়ে ১৯৪৩-এর প্রারম্ভ থেকে তিনি চাইলেন নবজীবনবাদের ভিত্তিমূল রচনা করতে। তাঁর বিদ্রোহী প্রতিভাকে চাইলেন বিপ্লবী প্রতিভায় রূপান্তরিত করতে। যাঁরা মানিক-প্রতিভার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরেছেন তারাই বুঝবেন এ কত বড়, বিরাট ও দুর্জয় সাধনা। তাঁর প্রতিভারই একাংশের সঙ্গে তাঁর আত্মার এই দ্বাদশবর্ষব্যাপী অক্লান্ত সংগ্রাম। আর তাঁরাই সশ্রদ্ধ হৃদয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই শেষপর্বের সাধনাকে অভিনন্দিত করবেন—মৃত্যু থেকে অমৃতে পৌঁছুবার প্রয়াস জীবনেরই মূল বাণী।

॥ ৩ ॥

১৯২৮ (ইং) সনের যে দিনটিতে ঘটনাক্রমে 'অতসী মামী' গল্পটি লিখিত হয় এবং অজ্ঞাতনামা লেখকের সে গল্প (বিচিত্রা, ১৩৩৫ সালের পৌষ সংখ্যায়) প্রকাশিত হয়. সেদিন থেকেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিভার প্রকাশপথও আবিষ্কৃত হয়ে পড়ে। এমন সত্য কথা আর নেই—পরবর্তী আটাশ বৎসরে "অন্য কিছু তিনি করেন নাই, চেষ্টা করিয়াও করিতে পারেন নাই।" তাঁর প্রতিভা তাঁকে নিষ্কৃতি দেয়নি, জীবনের শত আবর্তে তাঁকে বিক্ষিপ্ত উৎক্ষিপ্ত করেও আমরণ সাহিত্যের সৃষ্টি-স্রোতেই একূলে-ওকূলে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

প্রথম গল্প 'অতসী মামী' ও প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'জননী'তে (১৯৩৫, মার্চ) বাঙলা কথা-সাহিত্যের পরিচিত পরিমণ্ডলের সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিভার যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু সে প্রতিভা প্রায় তখনই তার নিজস্ব খাত আবিষ্কার করে ফেলেছে। 'অতসী মামী' নামক প্রথম গল্প-সংগ্রহও এ সময়েই (১৯৩৫, আগস্ট) প্রকাশিত হয়। তাঁর দশটি গল্পের মধ্যে আছে 'সপিল', 'আত্মহত্যার অধিকার' প্রভৃতি মানিক-প্রতিভার অভ্রান্ত স্বাক্ষরসম্বলিত গল্প ; কিন্তু তারও পূর্বে তাঁর 'দিবারাত্রির কাব্যে'র প্রাথমিক পরিকল্পনা ও আদি-লিখন (১৯২৯ ? ১৯৩১ ?) শেষ হয়েছে। 'সরীসৃপ' প্রভৃতি গল্প (বঙ্গশ্রী ১৩৪০ বাং আশ্বিন) রচিত হয়েছে এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুর্নিবার্য প্রতিভা (বাং ১৩৪১এ বঙ্গশ্রীতে) ভাঙাগড়ার সূত্রে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অস্থির মনকে ভেঙে গড়ে যে কী রূপ দান করতে চলেছে, তা পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। ১৯৩৫ (ডিসেম্বর) সনেই 'দিবারাত্রির কাব্য'ও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থকাররূপে মানিক বন্দ্যো-পাধ্যায়ের আবির্ভাব তাই এই বৎসরেই। ১৯২৮ থেকে ১৯৩৪-এর মধ্যেই তাঁর শিক্ষানবিশী শেষ হয়েছে। তাঁর সাহিত্যদৃষ্টি যে বাঙলা সাহিত্যে অভিনব সে বিষয়ে ১৯৩৫-এ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনেও সংশয় নেই। 'অতসী মামী' গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক জানাচ্ছেন, "'অতসী

মামী' আমার প্রথম রচনা। তারপর লেখার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সেটা স্পষ্ট বোঝা যাবে।" 'দিবারাত্রির কাব্যে'র নিবেদনাংশ আরও উল্লেখযোগ্য—"দিবারাত্রির কাব্য পড়তে বসে যদি কখনো মনে হয়, বইখানা খাপছাড়া, অস্বাভাবিক (তা না মনে হয়ে পারে না—লেখক) —তখন মনে রাখতে হবে এটি গল্পও নয় উপন্যাসও নয়, রূপক-কাহিনী। কিন্তু লেখক এ কথায়ও সুস্থির বোধ করেন না, কারণ এক অর্থে সমস্ত উপন্যাসই তো রূপক, কোনো জীবনসত্যের রূপদান। আর অন্য অর্থে, রূপক কখনো উপন্যাস হতে পারে না। রূপকের সাধারণকৃত রীতিতে মানব সত্যকে ঢেলে সাজলে 'চরিত্র' তার বৈশিষ্ট্য হারায়। লেখক তাই 'রূপক-কাহিনী' বলেই আবার বলছেন, রূপকের এ একটা নূতন রূপ। একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে, বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্পর্ক দিয়ে সীমাবদ্ধ করে দিলে মানুষের কতগুলি অনুভূতি যা দাঁড়ায়, সেগুলিকেই মানুষের রূপ দেওয়া হয়েছে। চরিত্রগুলি কেউ মানুষ নয়, মানুষের Projection—মানুষের এক-এক টুকরো মানসিক অংশ।"

'দিবারাত্রির কাব্য'ই মানিক-প্রতিভার প্রথম ও বিশিষ্ট নিদর্শন। তাই এ কাব্যের এই নিবেদনাংশটুকুকে সযত্নে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। সেই বিশ্লেষণে দেখতে পাই—প্রথমত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সচেতন-ভাবে তাঁর রচনার গোষ্ঠীবিচারে কত অসমর্থ। এ কাহিনীর জন্ম ও বিকাশ, ভাঙা-গড়ার ইতিহাস (শ্রীসজনীকান্ত দাসের 'আত্মস্মৃতি' ২য় খণ্ডে তা লিখিত হয়েছে) জানলে বেশ বুঝা যায়—মানিকের প্রতিভা তাঁকে আশ্রয় করে কিভাবে এ কাহিনীর কথা-অংশ গড়ে তুলেছে। কিভাবে তার রূপ-রীতি নির্ণীত করে ফেলেছে। মানিকের শিল্পীসত্ত্বা আত্মসচেতন না হয়ে আত্মনিবেদনেই দুর্জয় শক্তির অধিকারী।—মানিক-সাহিত্যের বিচারকালে এই মূল সত্যটি পরীক্ষা করার মত কারণ বারবার জুটবে।

দ্বিতীয়ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পরীতির সুপরিচিত বাস্তব-

পদ্ধতি নয়—মানুষকে, বিশিষ্ট মানুষকে, আশ্রয় করে তিনি চরিত্র-সৃষ্টিতে অগ্রসর হননি, বরং অনুভূতিকেই আশ্রয় করে—অমূর্ত ধারণাকে গ্রহণ করে—তাকেই মানব-চরিত্ররূপে মূর্ত করতে চেয়েছেন। তাঁর চরিত্রগুলি কেউ মানুষ নয়, মানুষের projection। সাবজেক্ট বা বিষয় থেকেই তিনি বিষয়ীকে চিনতে চান। ভাব থেকে যান রূপে।

তৃতীয়ত, এই সাধারণীকৃত সূত্র বা ভাব-উপাদানকেও তিনি সম্পূর্ণ-রূপে গ্রহণ করেন নি। তিনি গ্রহণ করেছেন "মানুষের এক-এক টুকরো মানসিক অংশ"—সম্পূর্ণ ভাব-জীবনও নয়, ভাব-জীবনের একটা খণ্ডাংশ।

কোনো লেখকের প্রথম প্রকাশিত কোনো এক গ্রন্থের বক্তব্য থেকে এত বড়ো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া নিশ্চয়ই অসমীচীন। কিন্তু এ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে মানিক-প্রতিভার স্বরূপ আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে ওঠে বলেই এর গুরুত্ব। মানিক-প্রতিভার দু'একটি সুপরিচিত দৃষ্টান্ত দিয়ে কথাটা পরিষ্কার করছি। পৃথিবীর সাহিত্যে এগুলির স্থান স্বীকার করতেই হবে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাগৈতিহাসিক' (১৯৩৭-এ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত) অন্যতম। মানিকের নাস্তিক্য-প্রতিভারও তা একটা বিশিষ্ট প্রমাণ। কথা-বস্তুর দিক দিয়ে দেখতে গেলে এ গল্প একটা বীভৎস রোমান্টিক কাহিনী। একে বাস্তব বলা অসাধ্য। আর ভাববস্তুর দিক থেকে এর বক্তব্য পরিস্ফুট গল্পের উপসংহারে—পাঁচীকে পিঠে লইয়া ভিখু যেখানে জোরে জোরে পথ চলিতেছে :

"দূরে গ্রামের গাছপালার পিছন হইতে নবমীর চাঁদ আকাশে উঠিয়া আসিয়াছে। ঈশ্বরের পৃথিবীতে শান্ত স্তব্ধতা।

"হয়ত ওই চাঁদ আর এই পৃথিবীর ইতিহাস আছে। কিন্তু যে ধারাবাহিক অন্ধকার মাতৃগর্ভ হইতে সংগ্রহ করিয়া দেহের অভ্যন্তরে লুকাইয়া ভিখু ও পাঁচী পৃথিবীতে আসিয়াছিল এবং যে অন্ধকার তাহারা

সন্তানের মাংসল অবেষ্টনীর মধ্যে গোপন রাখিয়া যাইবে তাহা প্রাগৈতিহাসিক। পৃথিবীর আলো আজ পর্যন্ত তাহার নাগাল পায় নাই, কোনদিন পাইবেও না।”

বৈজ্ঞানিক সত্য হিসাবে এই মন্তব্য অচল। মানব-প্রকৃতি যে অর্থে অপরিবর্তনীয়, সে অর্থটি অস্বীকার করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু মানুষ শুধু প্রাগৈতিহাসিক ক্রূরতার জালে আবদ্ধ পশু নয়, এ কথা আমরা সকলেই জানি। মানবতা বলতে আমরা আজ যা বলি তাও তার ধর্ম, এবং সে ধর্মই দিনে দিনে নব বোধে নবায়মান। তাই মানুষকে প্রাগৈতিহাসিক প্রমাণ করবার জন্য প্রথমত অনুভূতির কয়েকটা খণ্ডকেই লেখক পাঁচী ভিখু প্রভৃতি রূপে দাঁড় করিয়েছেন,—অদ্ভুত প্রতিভার সেই রোমান্টিক আখ্যানে সত্যাভাস সংযোগ করেছেন। দ্বিতীয়ত, তিনি একটি খণ্ড সত্যকে—এমন কি, অপ্রধান সত্যকে,—সমগ্র সত্য বলে গ্রহণ করেছেন। এ গল্পের অনস্বীকার্য-সার্থকতা এই যে, প্রতিভা এমন নিঃসংশয়ে এই খণ্ড-সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করেছে যে, শত সত্ত্বেও কেউ অস্বীকার করতে পারব না যে, এ প্রাগৈতিহাসিক হিংস্রতা আমাদেরও গহন মনের কোনো গহ্বরে লুক্কায়িত নেই। অর্থাৎ যে অংশটি আমাদের সচেতন মনের অগোচরে, সে অংশটি আমাদের চেতনালোকে অনুভূত হয়ে উঠল।

ঠিক এ কথাই বলা চলে তাঁর আরও ভয়ঙ্কর গল্প ‘সরীসৃপ’ সম্বন্ধে। তার অনায়াস বর্ণনা-ভঙ্গির মধ্যে যে শিল্পকুশলতা মিশিয়ে আছে তা প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে দুর্ভার পীড়নে যেখানে হেমলতার প্রশ্নে,—‘হা রে ভুবনের কোনো খোঁজ করলি না?’—বনমালী বলে, ‘আপদ গেছে, যাক।’

এর পরে হয়তো মন্তব্য শিল্প-নিয়মে দোষাবহ—যদি না সে মন্তব্য হয় এমন নির্মম:

“ঠিক সেই সময় মাথার উপর দিয়া একটা এরোপ্লেন উড়িয়া যাইতেছিল। দেখিতে দেখিতে সেটা সুন্দরবনের উপরে পৌঁছিয়া গেল। মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া বনের পশুরা যেখানে আশ্রয় লইয়াছে।”

নাস্তিক্য-প্রতিভার এমন উক্তি আর ক্বচিৎ দেখা যায়। কিন্তু কে না জানে এ উক্তিও অর্ধ-সত্যও নয়, বারো আনা মিথ্যার সঙ্গে বড় জোর চার আনা সত্যের ভেজাল? অথচ সমস্ত গল্পটি যে চতুরতার সঙ্গে বিবৃত হয়েছে, নিরাসক্ত শিল্প-দৃষ্টিতে তার হিংস্রতা ও ক্লেদাক্ত পর্যায় একের পর এক উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, তাতে সভ্যতার বিরুদ্ধে এই বিদ্রূপ-শাণিত বক্রোক্তি মোটেই অসঙ্গত বোধ হয় না। কিন্তু মানবতাও মিথ্যা নয়, মানুষের সভ্যতাও যে মানুষকে সুস্থতর জীবন-বোধেই জাগ্রত করছে তাতেও সন্দেহের কারণ নেই। ক্ষয়িষ্ণু সভ্যতার ক্ষয়ও একমাত্র সত্য নয়, সঙ্গে সঙ্গে নবজন্ম তাতে আছে। সমগ্র মানুষকে গ্রহণ না করে মানুষের এক-এক টুকরো মানসিক অংশকে গ্রহণ করলে মিথ্যাই এরূপে সত্য হয়ে উঠতে চায়। গল্পটি তথাপি এক অমোঘ সৃষ্টি—প্রতিভাই এই অমোঘতা দিয়েছে।

এ-তুলনায় 'পুতুলনাচের ইতিকথা' (১৯৩৬) ও 'পদ্মানদীর মাঝি'তে (১৯৩৬) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই 'নাস্তিক্য-প্রতিভা' অনেকটা সুশৃঙ্খল। পদ্মাপারের যে কোনো লোক জানেন—পদ্মানদীর মাঝিদের জীবনযাত্রার দিক থেকে সে উপন্যাসের চিত্র অনেকাংশেই অযথার্থ, বিশেষত হোসেন মিঞার কলোনি-গড়ার আকাঙ্ক্ষা যেন অবিশ্বাস্য একটা রোমান্টিক রচা কথা। কিন্তু উপন্যাসের এই দীর্ঘতর আয়তনে এক-এক টুকরো মানসিক অংশ নিয়ে কাহিনী রচনা করা চলে না। তাই এ কাহিনীতে অসঙ্গতি ও গঠন-দোষ থাকলেও একটা সমগ্রতা আছে। আর, তাঁর অকৃত্রিম প্রীতি ও সরসতা কাহিনীকে স্বাভাবিক ভাবেই জনপ্রিয় করে তুলেছে। প্রতিভা এখানে মানুষকে অনেকটা পথ ছেড়ে দিয়ে আপনার সার্থকতা আরও সুনিশ্চিত করে তুলতে পেরেছে।

'পুতুলনাচের ইতিকথা'য়ও এই পরিমিত রঙ্গবোধ নিষ্ঠুর বিদ্রূপ-বোধে পরিণত হয়নি। মানুষ সেখানে শয়তানের খেলার উপাদান ততটা নয় যতটা সে কামনা-বাসনার খেলার পুতুল। সেই পুতুলের জন্য বিদ্রূপেও লেখকের একটু ক্ষীণ অনুকম্পা আছে—হায় রে পুতুল!

আর পুতুলই হোক, আর যাই হোক, উদ্ভট, অদ্ভুত, উচ্ছৃঙ্খল, সাধারণ, অসাধারণ সকল খেলার মধ্য দিয়ে তারা প্রত্যেকেই যে মানুষ এই সত্যটা অস্বীকার করবার মতো আক্রোশ তখনো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিভাকে পেয়ে বসেনি। কিন্তু ক্রমেই তা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে পেয়ে বসে। 'টিকটিকি' (মিহি ও মোটা কাহিনী, ১৯৩৮) প্রভৃতি ছোটো গল্পে তা ক্রমেই শ্বাসরোধী একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করে করে চলে, চতুষ্কোণের (১৯৩৮) মতো উপন্যাসে পর্যন্ত সেই যৌন-প্রবৃত্তির বিকৃত বিস্তার দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য তার পূর্বেই এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের চাপা অন্ধকার থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আত্মোদ্ধারের পথ সন্ধান করছিলেন। সে পথ তিনি বুদ্ধি দিয়ে হৃদয় দিয়ে আবিষ্কার করেন মার্কস্‌বাদের আলোকে, কিন্তু তাঁর বিদ্রোহী প্রতিভা সে পথকে মানতে প্রস্তুত ছিল না—এবং শেষ পর্যন্তও এই প্রতিভা সে পথে তাঁকে স্বচ্ছন্দ পদে চলতে সহায়তা করেনি। 'সমুদ্রের স্বাদ' (১৯৪৩) প্রভৃতি গল্পের সময় থেকেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই নূতন পথের সন্ধান সম্ভবত আরম্ভ হয়। 'সমুদ্রের স্বাদ' দুঃখবাদে করুণ হলেও জীবন-সম্বন্ধে নৈরাশ্যেরই সূচক। 'বৌ' (১৯৪৩) ও 'ভেজালে'র (১৯৪৪) অধিকাংশ গল্পও সেই জীবন-বিরূপ প্রতিভারই সৃষ্টি। 'দর্পণে সেই নব প্রয়াস ও বিরূপ-চেতনার বাঁকা-চোরা প্রতিলিপিই পড়েছে।' এই সুদীর্ঘ সংগ্রামে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জয়ী হয়ে নিষ্ক্রান্ত হবেন, এমন সম্ভাবনা হয়তো ছিল না। কারণ তাঁর প্রতিভা এই নূতন ধর্মকে গ্রহণ করতে পারে না।

তথাপি তাঁর শক্তির স্বাক্ষর, অদ্ভুত শিল্প-কুশলতা নানা গ্রন্থেই দেখা গিয়েছে। এক-একবার মনে হয়েছে হয়তো প্রতিভাকে তিনি এবার কবলিত করতে পারলেন,—যেমন, কোথাও কোথাও 'আজ-কাল-পরশুর গল্পে' (১৯৪৬), 'পরিস্থিতি'তে (১৯৪৬), 'চিহ্ন' উপন্যাসে (১৯৪৭), 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী'তে (১৯৪৯), 'সোনার

চেয়ে দামী'র প্রথম ভাগে (১৯৫১) এবং এরূপ আরও অনেক লেখায়। কিন্তু তাঁর ক্ষয়িষ্ণু দেহ ও ক্ষীয়মান প্রাণ সমস্ত সম্ভাবনা ও সংগ্রাম সমাপ্ত করে অবশেষে অকালেই নির্বাপিত হয়ে গেল।

॥ ৪ ॥

এক জন্ম থেকে আর-এক জন্মে পৌঁছানো—এই জীবনের মধ্যে জন্ম-জন্মান্তর ঘটানো—মানিক-প্রতিভার পক্ষে সম্ভব হল না কেন তা আমরা দেখেছি। হয়তো তা সম্ভব হত যদি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অন্য কোনো পথে এই জন্মান্তর কামনা করতেন। যে গভীর বক্রদৃষ্টিতে তিনি সভ্যতা ও মানবতাকে অন্তঃসারহীন বলে চিনছিলেন, তা থেকে মুক্ত না হয়েও কোনো কোনো শিল্পী নিষ্কৃতি পান—দেবতার নামে আত্মনিবেদন করে, পাপোঽহম্ পাপসম্ভবোঽহম্ বলে খ্রীষ্টীয় পাপানুভূতি ও ভগবদানুভূতিতে। স্টেডয়ভ্স্কির মতো, বা আধুনিক ইউরোপীয় ক্যাথলিক-বিশ্বাসবাদী গ্রেহাম গ্রীন প্রভৃতি শিল্পীর মতো একটা পথ গ্রহণ করলে—মানুষকে অস্বীকার করে, জীবনকে প্রত্যাখ্যান করেও একটা ভাবালোকে আশ্রয় রচনা করা যায়। সেরূপ আশ্রয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদ্রোহী প্রতিভাকেও পরিত্যাগ করত না। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সেরূপ আশ্রয় না চেয়ে চাইলেন পৃথিবীকে, জীবনকে, মানুষকে,—যে সবের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিভার বিদ্রোহ, যাদের বিরুদ্ধে অভিযানে তাঁর প্রতিভা পরিপুষ্ট। দেবতায় বা পারমার্থিক সত্যে বিশ্বাস অনেক সহজ, কিন্তু মানুষে বিশ্বাস, সভ্যতায় বিশ্বাস অনেক দুশ্চর সাধনা-সাপেক্ষ। এ সাধনাকে গ্রহণ করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর মানবীয় সততার প্রমাণ ও শিল্পী-সত্তার এক মহৎ ঐতিহ্য রেখে গিয়েছেন—যারা সাহিত্যে বিশ্বাসী, মানবতায় বিশ্বাসী তাদের জন্য রেখে গিয়েছেন পরাহত মানবাত্মা ও মানুষের এই জয়স্তম্ভ।

পরিচয় ॥ পৌষ, ১৩৬৩ ॥

পিয়ের ফালোঁ এস. জে.

বিদেশীর শ্রদ্ধানিবেদন

মানিক বন্দোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না, তাঁর সমস্ত রচনার সঙ্গেও তেমন পরিচয় নেই। সেইজন্য সমগ্রভাবে তাঁর সাহিত্যকৃতি ও তাঁর শিল্পী-ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করার অধিকার আমার নেই। তবুও মানিক-সাহিত্যের বিষয় যেটুকু জ্ঞান লাভ করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে, তাতে নিঃসন্দেহে এ কথা বলতে পারি যে, কেবলমাত্র বাংলা-সাহিত্যে নয়, বিশ্ব-সাহিত্যেও তিনি উচ্চস্থান পাবার অধিকারী। বিশেষ করে তাঁর 'পুতুলনাচের ইতিকথা' ও 'পদ্মানদীর মাঝি' বই দু'খানির জন্য এ স্থান তাঁর সুনির্দিষ্ট হয়ে আছে। 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটির সার্থক ইংরেজি অনুবাদ আট-নয় বৎসর আগে বেরিয়েছে, কিন্তু অন্য বইখানির ইংরেজি অনুবাদ আজও বের হয়নি বলে মনে হয়। যদি তা না হয়ে থাকে, আশা করি অচিরে এইটি অনূদিত হলে কথাশিল্পী মানিকের পরিচয় দেশ-বিদেশে অনেকে পাবার সুযোগ পাবেন।

প্রায় কুড়ি বছর আগে আমি যখন বাংলা শিখতে চেষ্টা করি, তখন স্বভাবত বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র নিয়ে আরম্ভ করেছিলাম। বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী'ও আমি তখন পড়েছিলাম। এঁদের সকলের রচনা আমাকে মুগ্ধ করেছিল, এঁদের কবিত্বময় আদর্শ-বাদিতায় ও রোমান্টিক ভাবধারায় আমার মনকে বিশেষ করে নাড়াও দিয়েছিল। তবু আমার মনের কি-একটা অভাব ও কৌতূহল তখনও পূর্ণ হয়নি। এই সময় একদিন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' আমার হাতে পড়ে। আজও মনে আছে সেদিন প্রাণে একটা

রূঢ় আঘাত পেয়েছিলাম। পল্লীজীবনের সেই মাধুর্যপূর্ণ ও ভাবমণ্ডিত চিত্র আর নয়—এখানে পেলাম বাংলার সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত জীবনের একটি বাস্তব ছবি, যে ছবির আতিশয্যহীন ও মর্মস্পর্শী পরিচয় আমার দেশের লোকের কাছে, আমার ভাষাভাষীদের কাছে দেবার জন্য আমি ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। পড়া শেষ করে সেই রাত্রেই বইখানির কয়েকটি জায়গা ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করে ফেললাম। আমার এক ভাইকে সেই অনুবাদ পাঠিয়ে মানিকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম। উত্তরে ভাই আমার এই অপরিচিত বিদেশী শিল্পীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সমগ্র বইটির অনুবাদ তাঁকে পাঠাতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কি কারণে জানি না—সম্ভবত সময়ের অভাবে তাঁর সেই অনুরোধ আমি রাখতে পারিনি।

"পূর্বদিকে গ্রামের বাহিরে জেলেপাড়া। চারিদিকে ফাঁকা জায়গার অন্ত নাই, কিন্তু জেলেপাড়ার বাড়ীগুলি গায়ে গায়ে ঘেঁষিয়া জমাট বাঁধিয়া আছে। জেলেপাড়ার ঘরে ঘরে শিশুর ক্রন্দন কোনদিন বন্ধ হয় না। ক্ষুধাতৃষ্ণার দেবতা, হাসিকান্নার দেবতা, অন্ধকার আত্মার দেবতা, ইহাদের পূজা কোনদিন সাঙ্গ হয় না।······আসে রোগ, আসে শোক। টিকিয়া থাকার নির্মম অনমনীয় প্রয়োজনে নিজের মধ্যে রেষারেষি কাড়াকাড়ি করিয়া তাহারা হয়রাণ হয়। জন্মের অভ্যর্থনা এখানে গম্ভীর, নিরুৎসব, অবিষণ্ণ। জীবনের স্বাদ এখানে শুধু ক্ষুধা ও পিপাসায়, কাম ও মমতায়, স্বার্থ ও সঙ্কীর্ণতায় আর দেশী মদে। তালের রস গাঁজিয়া যে মদ হয়, ক্ষুধার অন্ন পচিয়া যে মদ হয়। ঈশ্বর থাকেন ওই গ্রামে, ভদ্রপল্লীতে। এখানে তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।"

কুবের মাঝির দুঃসাহসিক জীবনের চিত্রাঙ্কণ বইয়ের প্রধান আকর্ষণ নয়; পূর্ববঙ্গের সেই ধীবর-পল্লীর জীবনযাত্রার অকৃত্রিম বর্ণনা ও গ্রামবাসীদের সরস কথ্যভাষায় অতি সার্থক প্রয়োগ উপন্যাসটির সর্বশ্রেষ্ঠ গুণও নয়। সাধারণ মানুষের আদিম ও অমার্জিত মানবতা,

অশিক্ষিত ও কষ্টনিপীড়িত মানুষের চিরন্তন হৃদয়বেদনা ও গভীরতম প্রবৃত্তির অশান্ত সংঘাত, ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ জীবনপরিধির মধ্যেও অপরিচিত ও অনিশ্চিত পরদেশের অনিবার্য আকর্ষণ 'পদ্মানদীর মাঝি' বইখানিতে নিখুঁতভাবে রূপায়িত হয়েছে বলেই এই উপন্যাস বিশ্বসাহিত্যের ভূমিকায় সার্থকতা অর্জন করেছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্পৃষ্ট চরিত্রগুলি রূপক নয়। কুবের, গণেশ, রাসু, মালা, কপিলা ইত্যাদি মানুষগুলি রক্তমাংসেরই মানুষ। বাস্তব ও জীবন্ত মানুষ। তবে লেখক সত্যকার স্রষ্টা ও শিল্পী বলে ঐ সকল চরিত্র সাহিত্যে উত্তীর্ণ হয়েছে। তাদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যগুলি অতিক্রম করে বাস্তবতার সঙ্গে এক গভীর ও সার্বজনীন সাঙ্কেতিকতার সফল সংমিশ্রণ সম্ভবপর হয়ে উঠেছে। লেখক দার্শনিক না হয়েও প্রকৃত দ্রষ্টা ছিলেন ; তাঁর সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির গুণে তিনি ঐ সকল মাঝি-মানুষের অন্তরতম সত্তায় প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন যেখানে তারা আর কেবল পূর্ববঙ্গের দরিদ্র ধীবর তো নয়, বিশ্বজগতের শ্রমকাতর ক্ষুধার্ত পদদলিত নর-নারীর প্রতিনিধি।

ফরাসী লেখক মোপাসাঁ-র কথা আপনা-আপনি মনে পড়ছে। মানিকের সঙ্গে মোপাসাঁর সুনিপুণ শৈলী ও বাস্তবধর্মী চিত্রাঙ্কনপ্রণালী তুলনীয় বটে। বাস্তবের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে ও সাধারণ মানুষের চরিত্র-রূপায়ণে দু'জনে সমান কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তবুও তফাৎ অনেকখানি। মোপাসাঁর মধ্যে কি একটা উপেক্ষাপূর্ণ আভিজাত্যের ভাব রয়েছে, তিনি সাধারণ মানুষকে হয়তো চিনতেন কিন্তু ভালবাসতেন না। তাঁর বর্ণনা কতকটা নিষ্ঠুর, নিজেকে তিনি তাঁর চরিত্রগুলির ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বলে বোধ করতেন না। মানিকের সেই নিষ্ঠুরতার লেশমাত্র নেই।) অন্ততপক্ষে 'পদ্মানদীর মাঝি' বইখানির মধ্যে নেই-ই। রুশ লেখক গর্কির সঙ্গে মানিক এদিক থেকে তুলনীয়। গর্কির মতো তাঁর বাস্তবধর্মী মনে মমতার অন্ত নেই। মানিক সত্যই কুবের ও গণেশ, মালা, কপিলাকে ভালবেসেছিলেন। ভালবেসেছিলেন বলে তিনি

শরৎচন্দ্রের ন্যায় তাঁর চরিত্রগুলিকে ভাবমণ্ডিত করে তোলেন নি, কিন্তু সেই অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠতা ও পরম আত্মীয়তার গুণে তিনি তাদের রূঢ় অসভ্যতা ও নৈতিক দুর্বলতা দর্শনে তাদের একটুও অবজ্ঞা করেন নি।

মানিক তাঁরই সৃষ্ট চরিত্র সেই হোসেন মিঞার মত ধীবর-পল্লীর সকল নর-নারীকে আপন বলে গ্রহণ করেছিলেন। হোসেন মিঞা চরিত্রটি 'পদ্মানদীর মাঝি' বইখানির অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তার মধ্যে মনে হয় মানিকেরই আত্মপরিচয়ের কিছুটা আভাস পাওয়া যায়।

"একটু রহস্যময় লোক এই হোসেন মিঞা।·· বড় অমায়িক ব্যবহার হোসেনের।·· ধনী দরিদ্র, ভদ্র অভদ্রের পার্থক্য তার কাছে নাই, সকলের সঙ্গে তার সমান মৃদু ও মিঠা কথা। মাঝে মাঝে এখনো সে জেলেপাড়ায় যাতায়াত করে, ভাঙ্গা কুটিরের দাওয়ায় ছেঁড়া চাটাইএ বসিয়া দা-কাটা কড়া তামাক টানে। সকলে চারিদিকে ঘিরিয়া বসিলে তার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। এই সব অর্ধ-উলঙ্গ নোংরা মানুষগুলির জন্য বুকে যেন তাহার ভালবাসা আছে। উপরে উঠিয়া গিয়াও ইহাদের আকর্ষণে নিজেকে সে যেন টানিয়া নীচে নামাইয়া আনে।"

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটি যতই সার্থক ও জনপ্রিয় হোক না কেন, তবু আমার বিশ্বাস মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা' বইখানির মধ্যে আমরা তাঁর শিল্পী-মনের উৎকৃষ্টতর ও গভীরতর অভিব্যক্তির নিদর্শন পাই। গল্পের বাঁধুনি একটু শিথিল হতে পারে ; শশী ডাক্তারের জীবনকাহিনীর সঙ্গে কুমুদ ও মতির জীবন-কথাটির সুদৃঢ় ও ঘনিষ্ট যোগ নেই বলে মনে হয়। বিন্দুর দাম্পত্য-জীবনের মর্মন্তুদ বর্ণনাটি অসমাপ্ত পৃথক এক ছোটো গল্পের মতো ; আসল উপন্যাসের সঙ্গে হয়তো তার কিছুটা অসংলগ্নতা রয়েছে। 'পদ্মানদীর মাঝি' বইখানির মধ্যে যে সুতীব্র আবেগের সংযত ও ব্যঞ্জনাময় অভিব্যক্তি আত্মপ্রকাশ করেছিল, এই দীর্ঘতর ও অপেক্ষাকৃত মন্থরতর কাহিনীস্রোতে পাঠকের মনে হয়তো তেমন প্রবল সাড়া

জাগবে না। তা সত্ত্বেও মানিকের এই উপন্যাসখানি তাঁর বাকি সকল উপন্যাস ও ছোটো গল্পের তুলনায় অধিকতর পরিমাণে সার্থকতা ও সাফল্য লাভ করেছে মনে হয়।

হোসেন মিঞা-চরিত্রের মারফতে মানিকের যেটুকু পরিচয় পেয়েছিলাম, শশী ডাক্তারের চরিত্রে সেই পরিচয় আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। গাওদিয়া গ্রামের জীবনযাত্রা সেই ধীবরপল্লীর জীবনযাত্রার চাইতে আরও জটিল ও সমস্যাবহুল। স্রষ্টা ও দ্রষ্টা মানিকের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণনৈপুণ্য ও বাস্তব চরিত্রাঙ্কণক্ষমতা এখানে পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছে।

বিদেশী সাহিত্যে যদি এই উপন্যাসের সমতুল্য ও সমজাতীয় কোনো সার্থক উপন্যাসের সন্ধান করতে হয়, তা হলে কেবল মোপাসাঁ কিংবা গর্কি নয়, হয়তো ফ্লোবের কিংবা বালজাক-এর নাম উল্লেখ করতে হবে। মানিকের পরবর্তী কতকগুলি উপন্যাস ও গল্পের পাঠেই এমিল জোলা ও গোঁকুর ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে তাঁর শিল্পগত সহধর্মিতার কথা ভাবতে হয়েছে, কিন্তু 'পুতুলনাচের ইতিকথা' বইখানিতে বাস্তবতার সঙ্গে চিন্তাশীল দার্শনিকতার সমন্বয় স্থাপন এবং গ্রাম্য জীবনযাত্রার ধূসর সঙ্কীর্ণতার বর্ণনার সঙ্গেই শিক্ষিত ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী একটি মানুষের মানসিক অস্থিরতার রূপায়ণ যেভাবে সাধিত হয়েছে উচ্চশ্রেণীর ঔপন্যাসিক ছাড়া আর কেউ সেইভাবে তা করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না।

শশী ডাক্তারের চরিত্র উপন্যাসটির প্রধান ও শ্রেষ্ঠ কীর্তি। শশী কোনো আদর্শ-পুরুষ নয়, গল্পের নায়ক হলেও তার জীবনে কিংবা তার ব্যক্তিত্বে কোনো অসাধারণ গুণ বা মাহাত্ম্য আছে বলা যায় না। 'হৃদয় ও মনের গড়ন আসলে তাহার গ্রাম্য'। তার জীবন পাড়াগাঁয়ের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ, বড়ো একঘেয়ে। এই বৈচিত্র্যহীন জীবনের তিক্ততায় তার মনে কি যেন এক নির্লিপ্ত ঔদাসীন্যের ভাব স্থান পেয়েছে। নিছক কর্তব্যের তাগিদে তার নিরানন্দ ও নির্জন পথে

এগিয়ে যায় সে বিতৃষ্ণা-পূর্ণ মন নিয়ে। তবু শশীর গভীর ও অস্থির ভাবুকতা তাকে বড় অশান্ত করে তোলে। গ্রামত্যাগের ইচ্ছাও মাঝে মাঝে তার মনকে আলোড়িত করে। তার আশেপাশে গাওদিয়ার যে সকল নরনারীর অনাড়ম্বর ও ঘটনাবিহীন 'গন্থময়' জীবনযাত্রা সে উদাস দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে বেড়ায়, শশী তাদের প্রতি অগাধ মমতা ও অনুকম্পা অনুভব করে। তাদের জীবনের শ্রীহীনতা তাকে ব্যথিতও করে। তার ছাত্রজীবনের নানান স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা, ব্যাপকতর জীবনের আকর্ষণ, জীবন-মরণ সমস্যার চিন্তা তার আলোকহীন জীবনের মধ্যে এনে দেয় এক তীক্ষ্ণ বেদনা ও গভীর নৈরাশ্য। শশী শত কাজকর্মে ব্যতিব্যস্ত হয়েও আসলে বড়ো নিষ্ক্রিয় ও নিরুৎসাহ। জীবনের রঙ্গমঞ্চে অভিনেতার ভূমিকা তার নয়। সে কেবল দর্শক হিসাবে পুতুল-নাচের চিরাভ্যস্ত দড়ি-টানার খেলা দেখে মুগ্ধ হয়, বিরক্তও হয়।

এই উপন্যাসে মানিক-সাহিত্যের সূক্ষ্ম বাস্তবধর্মিতা ও তাঁর অসাধারণ চরিত্রাঙ্কণ-শক্তির আরও অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

বৃদ্ধ গোপালের চরিত্র বালজাকেরই তুলিতে আঁকা হয়েছে বিশ্বাস হচ্ছে। যাযাবর ও বিশৃঙ্খল শিল্পী কুমুদের যে ছবি ফুটে উঠেছে, সেটিও অত্যন্ত বাস্তব ও মর্মস্পর্শী। কিন্তু কুসুম ও মতির চরিত্রসৃষ্টিতে লেখক আরও দক্ষতা ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। নারীহৃদয়ের এইরূপ বাস্তব বিশ্লেষণ খুব কম লেখকের দ্বারা ইতিপূর্বে সাধিত হয়েছিল। বিন্দুর চরিত্রাঙ্কণে মানিকের পরবর্তী গল্প ও উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যের কিছু আভাস পাওয়া যায়।

* * *

পূর্বোক্ত দুটি উপন্যাসের মধ্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পকৌশল ও বাস্তবধর্মী বিশ্লেষণের অসাধারণ দক্ষতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাওয়া গেলেও তাঁর ব্যক্তিগত আদর্শ ও জীবনসাধনার সমগ্র রূপটি এই গল্প দু'টির আলোচনায় নির্ণয় করা যায় না, জানি। হোসেন মিঞা মাঝিদের

ভালোবাসত বটে, শশী ডাক্তারও গাওদিয়ার গ্রামবাসীদের ভালোবাসত কিন্তু তাদের সেই ভালবাসা বড় নির্লিপ্ত ও ঔদাসীন্যপূর্ণ ছিল। মমতা ও সহানুভূতি তাদের প্রাণে জেগেছিল, তারা সেই দারিদ্র্যক্লিষ্ট মানুষ-গুলিকে অবজ্ঞা করেনি, তবুও তাদের কাছে তারা সক্রিয় ও নিঃস্বার্থ-ভাবে আত্মদান করেনি। মানিকের পরবর্তী জীবনে কি দুঃখপীড়িত ও অসহায় মানুষের প্রতি এক গভীরতর সহানুভূতি ও বাস্তবতর আত্ম-নিবেদনের ইচ্ছা একদিন জেগেছিল। তখন তাঁর সেই নৈরাশ্য ও বিতৃষ্ণা প্রবল আশাবাদিতা ও সক্রিয় বিদ্রোহিতার রূপ ধারণ করেছিল। তাঁর সাহিত্যকীর্তি যত বড় হোক-না-কেন, মানুষ হিসাবেই তিনি আরো বড় ছিলেন, কারণ মানুষের প্রকৃত পরিচয় তার শিল্পসৃষ্টির মধ্যে ততখানি পাওয়া যায় না, যতখানি পাওয়া যায় তার ব্যক্তিগত ভ্রাতৃপ্রেমের মধ্যে। মানিকের ভ্রাতৃপ্রেম ঈশ্বরপ্রেমের দ্বারা হয়তো তাঁর জ্ঞাতসারে অনুপ্রাণিত ছিল না, তাঁর আশাবাদিতা হয়তো শেষ পর্যন্ত লোকায়ত রয়েছিল, সেইজন্য তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে সত্য-শিব-সুন্দরের পূর্ণ আনন্দ ও শান্তির উপলব্ধি কতকটা স্তিমিত। "ক্ষুধাতৃষ্ণার দেবতা, হাসি কান্নার দেবতা, অন্ধকার আত্মার দেবতা, ইহাদের পূজা" মানিক আজীবন করে গিয়েছেন। কিন্তু সেই নিরানন্দ পূজায় তিনি আন্তরিক-ভাবে ও একান্ত মনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন বলে আমি শিল্পী মানিক ও মানুষ মানিকের নিকট আমার গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

পরিচয় ॥ পৌষ, ১৩৬৩ ॥

চিন্মোহন সেহানবিশ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রগতি লেখক আন্দোলন

১৯৪২ সাল। ফ্যাসিজমের বিশ্বজয়ের চেষ্টা কতটা গুরুতর, কিইবা তার তাৎপর্য, এই নিয়ে আমাদের দেশের চিন্তাশীল মানুষ বিষম দোটানায় পড়েছেন। কিছুদিন আগেও প্রগতি লেখক মহলে যথেষ্ট আনাগোনা ছিল। এমন একজন নামজাদা গল্প-লেখকের তখন সবেমাত্র গোত্রান্তর ঘটেছে। তিনি ঐ সময়ে কমিউনিস্ট-মেধ যজ্ঞে তিলাঞ্জলি অর্পণ শুরু করলেন একটি ছোটো গল্প ফেঁদে। গল্পটির নাম বা কোন্ পত্রিকায় সেটি প্রকাশিত হয়েছিল আজ আর তা মনে নেই। শুধু মনে পড়ে যে কমিনিস্টদের ধনতন্ত্রবিরোধ যে আসলে মেকি তা প্রমাণ করার জন্য ঐ গল্পে আমদানি হয়েছিল এক বিদঘুটে ধনিক কমিউনিস্ট চরিত্রের।

আমাদের মত ফ্যাসিস্তবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের কমিউনিস্ট কর্মীদের কাছে এটা মোটেই অপ্রত্যাশিত ছিল না। কারণ পৃথিবী-ব্যাপী তোলপাড়ের মুহূর্তে সব দেশেরই কিছু কিছু দুর্বল হৃদয় যে টলবে আর ন্যূনতম প্রতিবন্ধকতার প্রকৃষ্ট পন্থা হিসেবে সস্তা কমিউনিজম-বিরোধিতার স্রোতে গা ভাসাবে এতে আশ্চর্যের কি আছে?

আশ্চর্য হলাম যখন এর কিছুদিনের মধ্যেই হঠাৎ নজরে পড়ল একটি গল্প, যার চরিত্রগুলি, মায় তাদের নাম পর্যন্ত ঐ আগের গল্পের সঙ্গে হুবহু এক অথচ যার তীব্র শ্লেষের শিকার হল কমিউনিজম নয়, কমিউনিজম-বিদ্বেষ। গল্পটির নাম 'হ্যাংলা'—যদিও কোথায় এটি প্রকাশিত হয়েছিল আজ তা বেমালুম ভুলে গেছি। এতে একই নামের চরিত্র মারফত লেখক শুধু কমিউনিজম ও ধনতান্ত্রিক মূল্যবোধের মৌলিক

দ্বন্দ্বের কথাই নয়, অত্যন্ত নিপুণভাবে এও দেখিয়েছিলেন যে গোত্রান্তরিত লেখক কমিউনিজমকে হেয় করার উদ্দেশ্যে 'ধনিক কমিউনিস্টের' বিরুদ্ধে যে সব গলাবাজী করেছেন আসলে তা অম্লরসে পরিপূর্ণ দ্রাক্ষাফলের মতই নিছক হ্যাংলামি।

আরো বিস্ময়কর ঠেকল যখন দেখলাম এ গল্পের লেখক স্বয়ং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। 'পদ্মানদীর মাঝি', 'পুতুলনাচের ইতিকথা' বা 'প্রাগৈতিহাসিক'-এর গল্পের আমরা তখন অনুরাগী পাঠক। তবু তাঁর মত জটিল ও সূক্ষ্ম মানব মনের কারবারী যে আমাদের সদ্য প্রতিষ্ঠিত 'ফ্যাসিস্তবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের' ধারে-কাছে আসতে পারেন এমন 'অঘটনের' প্রত্যাশা আমি অন্তত করিনি। কারণ শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ফ্যাসিজমের বিপর্যয়কর তাৎপর্য সত্ত্বেও আমাদের দেশের অনেক শিল্পী সাহিত্যিকের চোখেই ফ্যাসিজমের মতই ফ্যাসিজম-বিরোধিতা ছিল নিছক রাজনীতি আর তাই আমাদের 'ফ্যাসিস্তবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'ও একান্তভাবেই 'রাজনীতি ঘেঁষা' অতএব পরিত্যাজ্য।

স্বভাবতই আমরা তাই উৎসুক হয়ে উঠলাম মানিকবাবুর গল্প পড়ে। এমন সময়ে আমাদের ঔৎসুক্যে ইন্ধন যোগাবার জন্যই যেন প্রকাশিত হল মানিকবাবুর আর একটি ছোটো গল্প—'প্রতিবিম্ব'। এতে তিনি কয়েকটি কমিউনিস্ট চরিত্রের অবতারণা করেন। আমাদের সম্পর্কে তাঁর আন্তরিক সদিচ্ছা প্রকাশ পেয়েছিল এ গল্পের ছত্রে ছত্রে। তবু এতে প্রকট হয়ে উঠেছিল প্রগতি সম্পর্কে তাঁর এতদিনকার আধা-নৈরাজ্যবাদী ধারণার জের ও তাই অধিকাংশ চরিত্রই আমাদের কাছে বেশ কিছুটা অস্বাভাবিক বোধ হয়েছিল। সব মিলিয়ে গল্পটি উৎরোয়নি মোটেই।

তবু এ গল্পের সূত্র ধরেই মানিকবাবুর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ঘটে। তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের ফ্যাসিস্তবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে যোগ দেন ১৯৪৩ সালের গোড়ায়। এর কিছুদিনের মধ্যেই

একদিন একান্তে পেয়ে তাঁকে সভয়ে জানিয়েছিলাম প্রতিবিম্ব সম্পর্কে আমদের মতামত। 'সভয়ে' কারণ বড় লেখকের উত্তুঙ্গ আত্মাভিমানের পরিচয় তখন আমরা পাচ্ছি পদে পদেই। মানিকবাবু কিন্তু আমাকে দ্বিতীয়বার অবাক করলেন এই বলে: 'অর্থাৎ গল্পটা কিছুই হয়নি এই বলতে চানতো? তা কি করে হবে বলুন? কতটুকু জানি আপনাদের? যখন আপনাদের ঠিকমত চিনবো দেখবেন তখন গল্প উতরোয় কি উতরোয় না!'

এক মুহূর্তে আমরা মানিকবাবুর নাগাল পেয়ে গেলাম। কারণ তাঁর কথায় সেদিন সহজ আত্মভিমানশূন্যতার পাশাপাশি যে প্রবল আত্মপ্রত্যয়ের সুর বেজে উঠল আমাদের বুঝতে এতটুকু দেরি হল না যে সেই সুরই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৪৪ সালের জানুয়ারী মাসে আমাদের ফ্যাসিস্তবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ থেকে 'কেন লিখি' নামে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, জীবনানন্দ দাশ, অন্নদাশংকর রায়, বিষ্ণু দে প্রমুখ পনেরোজন বিশিষ্ট সাহিত্যিকের জবানন্দী হিসেবে যে পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয় তার মধ্যেকার মানিকবাবুর রচনাটি পরিচয়ের এই সংখ্যাতেই আবার প্রকাশিত হচ্ছে। তাতেও তিনি লিখেছিলেন:

'কলমপেষার পেশা বেছে নিয়ে প্রশংসায় আনন্দ পাই বলে দুঃখ নেই, এখনো মাঝে মাঝে অন্যমনস্কতার দুর্বল মুহূর্তে অহংকার বোধ করি বলে আপশোষ জাগে যে খাঁটি লেখক কবে হব।'

এ হেন মানুষের প্রতি আত্মীয়তাবোধ সহজেই গভীর হয়ে দাঁড়ায়। ফলে অল্পদিনের মধ্যেই চারিদিক থেকে গুঞ্জন উঠল—মানিকবাবু একেবারে দলীয় হয়ে গেছেন। এর জবাব দিয়েছিলেন মানিকবাবুই ১৩৫৪ সালের ফাল্গুন মাসের 'পরিচয়ে':

"...দুটো দল হয়ে গেছে, উপায় কি? ব্যক্তিগতদের ব্যক্তিপ্রীতির দল এবং জনসাধারণের নৈর্ব্যক্তিক স্বজাতিপ্রীতির দল। দ্বিতীয় দলে গত না হলে প্রগতি হয় না।"

অর্থাৎ অভিযোগ অস্বীকারের চেষ্টা নয়, দ্বিধাহীন সাফ জবাব।

১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে মহম্মদ আলি পার্কে যখন আমাদের চতুর্থ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় (এখানেই সর্বভারতীয় সংঘের সঙ্গে নাম মিলিয়ে আমাদের সংঘেরও নামকরণ হল 'প্রগতি লেখক সংঘ')। তখন মানিকবাবু সভাপতিমণ্ডলীর একজন সদস্য নির্বাচিত হন। এর পর থেকে সংঘ যতদিন সক্রিয় ছিল ততদিনই মানিকবাবু তার নায়কতা করেছেন। সে নায়কতা শুধু সম্মেলনের ভাষণ বা আনুষ্ঠানিক কাজ-কর্মেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। আমাদের সংঘের ৪৬, ধর্মতলা স্ট্রীটস্থ দপ্তরের দৈনন্দিন খুঁটিনাটি কাজে, বয়স বা সাহিত্যিক গুণাগুণ নির্বিশেষে সংঘের কর্মীদের সঙ্গে প্রাণখোলা সকৌতুক আলাপে, 'পরিচয়ের' শুক্রবাসরীয় বৈঠকে—সর্বত্রই তা' সমানভাবে জীবন্ত হয়ে উঠত।

সব থেকে জমত তখন আমাদের সংঘের বুধবারের বৈঠকগুলি। আমাদের রেওয়াজ অনুসারে এখানে লেখকেরা তাঁদের সদ্যরচিত গল্প, কবিতা বা নাটক পড়ে শোনাতেন অথবা সুরকারেরা তাঁদের সদ্যরচিত গান গাইতেন। এইখানেই বিজন ভট্টাচার্য পরের পর তাঁর 'আগুন', 'জবানবন্দী' ও বিখ্যাত 'নবান্ন' নাটক অভিনয়ের মত করে পড়ে শোনান। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র গেয়ে শোনান তাঁর 'নবজীবনের গান' ও 'মিছিলের গান'। সুকান্ত আবৃত্তি করেন 'রাণার', 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' ও 'ফসলের ডাক'। তুলসী লাহিড়ী ও শম্ভু মিত্র পাঠ করেন তাঁদের 'দুঃখীর ইমান' ও 'উলুখাগড়া'র প্রাথমিক পাঠ, গোলাম কুদ্দুস শোনান তাঁর 'হিসাব নিকাশ' এবং সুলেখা সান্যাল উপস্থিত করেন তাঁর প্রথম গল্প লেখার প্রয়াস। এই বুধবার বৈঠকেই 'পরিচয়'এর বর্তমান সম্পাদক ননী ভৌমিক আসর মাত করেন একটি ছোট গল্প শুনিয়ে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর কোনো সদ্যরচিত কবিতা এখানে পড়েছিলেন কিনা মনে নেই, তবে তাঁর 'বজ্রকণ্ঠে তোলো আওয়াজ' আমরা তখন গেয়ে বেড়াতাম পথেঘাটে, সেকেণ্ড ক্লাস ট্রামে—সর্বত্রই।

মানিকবাবুও বুধবারের বৈঠকে একাধিক সদ্যরচিত গল্প পড়ে শুনিয়েছিলেন। স্বভাবতই সে সব দিনে শ্রোতাদের ভিড় আমাদের অফিস ছাপিয়ে সিঁড়ি অবধি পৌঁছত। মন্বন্তরের সময়কার দু-একটি গল্প ছাড়া 'পেটব্যথা'র মত নির্মম অত্যাচারের কাহিনীও তিনি এইখানেই শোনান। সব থেকে আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে 'হারানের নাত-জামাই' গল্পটি পড়ার স্মৃতি। সময় সম্ভবত ১৯৪৬ সালের শেষ অথবা ১৯৪৭ সালের গোড়ার দিক। দাঙ্গার দুঃস্বপ্নকে মুছে ফেলে দিয়ে সারা বাংলাদেশ জুড়ে তখন চলছিল হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ তেভাগা আন্দোলন। চারিদিকে প্রবল উত্তেজনা। গোলাম কুদ্দুসের মত সাহিত্যিক সংবাদদাতারা জেলায় জেলায় সফর করে আন্দোলনের জ্বলন্ত ছবি আঁকছিলেন 'স্বাধীনতা'র পাতায়। এমন সময়ে এল মানিকবাবুর 'হারানের নাতজামাই'। মানিকবাবু যখন গল্প পড়া শেষ করলেন তখন আমি ভাবছিলাম সাহিত্য সত্যই কত ধারালো হাতিয়ার হতে পারে সংগ্রামের। কিসানী ময়নার মা-র চরিত্র-মাহাত্ম্যে অভিভূত হয়েছিলাম আমরা সবাই কিন্তু তার গোঁয়ার জামাইও কি ফেলবার? এখনও স্পষ্ট মনে পড়ে সেই আশ্চর্য অভিজ্ঞতার কথা।

বুধবারের বৈঠকগুলিতে রচনা-পাঠের পর বেশ দিলখোলা আলোচনার রেওয়াজ ছিল। সে আলোচনায় শুধু মানিকবাবুর মত নামজাদারাই যোগ দিতেন না, আনকোরারাও নির্ভয়ে গুরুগম্ভীর সমালোচনা করতে ছাড়তেন না, এমন কি মানিকবাবুর গল্পের ভালোমন্দ নিয়েও। হয়তো বা অনেক কাঁচা কথাই বলা হত সেখানে। তবু একমুখ হাসি নিয়ে মানিকবাবু বসে বসে শুনতেন আলোচনা, থেকে থেকে জোরালো সমর্থন বা প্রবল প্রতিবাদ করতেন কোনো মন্তব্যের, মাথা ঝাঁকি দিয়ে মেতে উঠতেন প্রচণ্ড উৎসাহ ও উত্তেজনায়। কিন্তু কখনও তাঁকে অধৈর্য হতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

উত্তেজনার কথা বলতে মনে এল নৌবিদ্রোহের, রসিদ আলি দিবস বা ২৯শে জুলাই-এর অগ্নিগর্ভ দিনগুলির কথা। এসব দিনে মানিক-

বাবুকে দেখেছি কখনও মজুরদের মিছিলের সঙ্গে একাগ্রমনে চলেছেন, কখনও ছাত্রদের সঙ্গে জুটে রাস্তায় বসে, কখনও সংঘ অফিসে অথবা কমিউনিস্ট পার্টির দপ্তরে বসে তুমুল আলোচনা করেছেন, কখনও বা পথচারীর কাছে জেনে নিচ্ছেন সংগ্রামের টাটকা খবর। আর এইসব টুকরো টুকরো অভিজ্ঞতা তাঁর হাতে কখনও রূপ পেয়েছে 'চিহ্নের', কখনও জ্বলন্ত বিবৃতির (১৩৫৫ সনের মাঘ মাসের 'পরিচয়ে' প্রকাশিত ছাত্র-মিছিলের উপরে পুলিসী তাণ্ডবের প্রতিবাদ 'মানবতার বিচার' দ্রষ্টব্য) কখনও বা বড়ো উপন্যাসের উপাদানের।

১৯৪৭ সালে পূজোর আগে প্রগতি লেখক সংঘ, কংগ্রেস সাহিত্য সংঘের সঙ্গে একযোগে এক অভূতপূর্ব দাঙ্গাবিরোধী মিছিলের ব্যবস্থা করে। সম্ভাব্য দাঙ্গার আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত হিন্দু-মুসলমান নর-নারীর কাছে সেদিন বিশিষ্ট শিল্পী-সাহিত্যিকেরা দলমত নির্বিশেষে উপস্থিত হয়েছিলেন নবজীবনের বাণী নিয়ে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে, বিশেষ করে যে-সব অঞ্চলে দাঙ্গার আশঙ্কা বেশি সেই সব এলাকায় সেদিন মানিকবাবু, তারাশংকরবাবু, গোপালবাবু, জ্যোতির্ময় রায় প্রভৃতি সাহিত্যিকেরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেছিলেন শান্তির প্রতি তাঁদের অবিচল আস্থা—সুচিত্রা মিত্র, দেবব্রত বিশ্বাস, দ্বিজেন চৌধুরী, সন্তোষ সেনগুপ্ত প্রমুখেরা গেয়েছিলেন জাতীয় সঙ্গীত। কলিকাতা-বাসীর সে এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা।

'পরিচয়' পত্রিকার সঙ্গে মানিকবাবুর যোগ বহুদিনের। সুধীন্দ্র দত্ত মহাশয় যখন এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তখনও পরিচয়ে মানিকবাবুর 'অহিংসা' উপন্যাস ও একাধিক ছোটো গল্প প্রকাশিত হয়েছিল। আর হাল আমলে তো তিনি এর পরিচালকবর্গের অন্যতমই ছিলেন। পত্রিকার শুক্রবাসরীয় আড্ডারও তিনি ছিলেন একজন উৎসাহী পাণ্ডা। বেশ কয়েকটা ছোটো গল্প ছাড়াও এই সময়ে তাঁর 'জীয়ন্ত' উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল 'পরিচয়ের' পাতায়। এ প্রসঙ্গে একটা মজার ঘটনা মনে পড়ছে। ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউসের

পক্ষ থেকে আমরা তখন সবেমাত্র পরিচয়-পরিচালনার ভার পেয়েছি। ফি মাসেই তখন পত্রিকা প্রকাশে বিলম্ব ঘটত। কারণ ঐ মানিকবাবুর 'জীয়ন্ত'। বাংলাদেশের পত্রিকা-পরিচালকমাত্রই বোধকরি হাড়ে হাড়ে জানেন মানিকবাবুর হাত থেকে প্রেসের 'কপি' বার করা কি দুরূহ ব্যাপার ছিল। আন্তরিক সদিচ্ছা নিয়েই তিনি ঘোষণা করতেন—'কাল নিশ্চয় দেব'—তারপর কিছুতেই পেরে উঠতেন না কথা রাখতে। আমাদের তাগাদার পেয়াদা তাঁর কাছ থেকে বারতিনেক ঘুরে আসার পর আমি মরিয়া হয়ে একবার মানিকবাবুকে এই মর্মে চিঠি লিখি: 'জীয়ন্তের' এবারকার দফার কপি কাল বেলা বারোটার মধ্যে যদি আপনি প্রেসে পৌঁছে না দেন তা হলে আমি নিজেই সেটা লিখে দিতে বাধ্য হব। তাতে হয়তো দেখতে পাবেন আপনার নায়ককে বাঘে খেয়েছে, নায়িকা পাগলিনী হয়েছেন, উপনায়ক উপনায়িকারা আত্মহত্যা বা ঐরকম কিছু একটা কাণ্ড করে বসেছেন। মোট কথা, এমন একটা অঘটন আমি ঘটাব যার রসাতল থেকে স্বয়ং তলস্তয়, বালজাক বা গর্কিও উপন্যাসকে পুনরুদ্ধারের কোনো পথই পাবেন না। বলা বাহুল্য আগের সংখ্যাগুলির মতোই এবারেও ঔপন্যাসিক হিসাবে আপনারই নাম থাকবে শিরোনামায়—কাজেই ঝুটো মানিক ধরা পড়বে না নাম থেকে। শেষবারের মতো আপনাকে বিবেচনা করতে বলি ব্যাপারটা সত্যই কি ভালো হবে?

পরদিন বেলা বারোটার মধ্যে সাচ্চা মানিকেরই 'কপি' পাওয়া গিয়েছিল আর তার সঙ্গে ছোট্ট একটি চিঠি—'আচ্ছা জব্দ করলেন মশাই!'

অবশ্য এমনটা সম্ভব হয়েছিল মানিকবাবু মানিকবাবু ছিলেন বলেই। ১৯৪৮ সালে আমাদের উপরে নামল সরকারী দমননীতির খাঁড়া। গোপাল হালদার, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় গ্রেপ্তার হলেন। সেই হট্টগোলের মধ্যে প্রগতি লেখক সংঘের পঞ্চম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় মানিকবাবুর সভাপতিত্বে। দমননীতির প্রকোপে

আমাদেরও তখন সুর খুব চড়া। সেই উত্তেজনার আবহাওয়ায় আমি সম্মেলনের সামনে 'সাহিত্য ও গণসংগ্রাম' নামে একটি প্রবন্ধ দাখিল করি। তাতে যথেষ্ট বেপরোয়া ঢালাও কথাবার্তা ছিল এই ধরনের: "শিল্পী বা সাহিত্যিকের উচিত ট্রেড ইউনিয়নিস্ট বা কিসান সমিতির কর্মী হিসাবে মজুর বা কিসানের মধ্যে কাজে নামা। তার ফলে যদি লেখা বা শিল্প সাময়িকভাবে বন্ধ হয়েও যায় তাতে ক্ষতি নেই। যে অভিজ্ঞতা তাঁরা অর্জন করবেন তার ফলে ভবিষ্যতে নতুন, শক্তিশালী শিল্প-সাহিত্য গড়ে উঠবেই।"

মনে আছে প্রবলভাবে মাথা নেড়ে সেদিন মানিকবাবু আমায় সমর্থন জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন, এই প্রবন্ধের সুরেই বাঁধতে হবে আমাদের ঘোষণাকে। তবু আমার মনে হয় সেদিনও হয়তো আমরা তাঁকে শুধু হৃদয়াবেগের তোড়েই ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম—আসলে তাঁর শিল্পী-মন কখনও সায় দেয়নি আমার বেপরোয়াপনায়। তাই তিনি সাহিত্যিকের স্বধর্ম, 'কলম-পোষার পেশা' ছাড়েন নি একদিনের জন্যও। দু'বছর পরে জেলখানায় বসে পরিচয়ের পাতায় পড়লাম তাঁর 'বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা'। তাতে তিনি আমার প্রবন্ধের উল্লেখ করে তার যুক্তিগুলিকে খণ্ডন করেছিলেন একে একে।

মনে পড়ে জেলে যাবার কিছুদিন আগে একদিন মানিকবাবুকে পীড়াপীড়ি করেছিলাম পুলিসী সন্ত্রাস-জর্জরিত বড়া-কমলাপুরে যাবার জন্যে—কিছুটা উদ্ধতভাবেই বলেছিলাম 'লেখক হিসেবে না হয় নাই গেলেন, কমিউনিস্ট হিসাবেই যান।' তারপর একদিন জেলখানার পাঁচিল পেরিয়ে এল 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী'। সন্ত্রাসের ছমছমে আবহাওয়া মূর্ত হয়ে উঠেছিল ঐ আশ্চর্য গল্পটিতে। মনে মনে সেদিন মাপ চেয়েছিলাম মানিকবাবুর কাছে।

আরও প্রায় দেড় বছর পরে একদিন বক্সা ক্যাম্পের কাঁটা-তারের বেড়া পেরিয়ে হাতে এল 'পরিচয়'। তাতে পড়লাম মানিকবাবু লিখেছেন:

"সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ননী ভৌমিক, চিন্মোহন সেহানবীশ, পারভেজ শাহীদী, সুনীল বসু, দ্বিজেন্দ্র নন্দী প্রমুখ লেখক, কবি, শিল্পী ও সংস্কৃতি-কর্মীদেরও বক্সায় পাঠানো হয়েছে।···শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি-চর্চা একান্তভাবেই প্রকাশ্য ব্যাপার। গোপন ষড়যন্ত্রের এতটুকু স্থান নেই। ছবি আঁকি, গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ লিখি, গান গাই, অভিনয় করি, বক্তৃতা দিই—গোপনে করা দূরে থাক, পাঠক শ্রোতা দর্শক পর্যন্ত বেছে নেবার উপায় নেই। সোজাসুজি খোলাখুলি আমার দেশের সকল মতের সকল রুচির সকল মানুষের সামনে তুলে ধরে দিতে হবে আমায় সকল রকম সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টা। দেশের মানুষই তাই শিল্প সাহিত্য সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টার একমাত্র বাহক এবং বিচারক ঃ দেশবাসীর গ্রহণ ও বর্জনই এক্ষেত্রে একমাত্র প্রয়োগযোগ্য আইন। শিল্পী সাহিত্যিক-সংস্কৃতিবিদেরা যখন সম্পূর্ণরূপ গণমত ও গণবিচারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, গোপন কার্যকলাপের কিছুমাত্র সুবিধা যখন তাঁদের বিশেষ পেশায় নেই এবং শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রাণটাই যখন নির্ভর করে শিল্পী-সাহিত্যিক সংস্কৃতিবিদদের পরিপূর্ণ স্বাধীনতার উপর—তখন বাংলার প্রিয়তম শিল্পী-সাহিত্যি-সংস্কৃতিকর্মীরা বক্সা ক্যাম্পে আটক কেন?"

কৃতজ্ঞতায় মন ভরে এল আমাদের। কিন্তু জেল থেকে বেরিয়ে এসে কৃতজ্ঞতা জানাতে গিয়ে দেখলাম অসম্ভব সে চেষ্টা—ছেলেমানুষের মতো অধীর আগ্রহ নিয়ে মানিকবাবু আমাদের জেলখানার গল্প শুনতেই ব্যস্ত।

জেল থেকে ফিরে এসে দেখলাম আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার অপরাধে ইতিমধ্যে বহু প্রকাশকের দরজা মানিকবাবুর কাছে রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে, এমন কি সাময়িকী পত্রিকার পূজাসংখ্যাগুলি পর্যন্ত অপরিসীম ঔদ্ধত্যের সঙ্গে বেশ নিয়মিতভাবেই লেখা চাইতে ভুলে যাচ্ছে বাংলা-ভাষার এই শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীর কাছ থেকে। অন্যদিকে আমরাও এদিক দিয়ে তাঁকে সাহায্য করতে পারলাম না তেমন করে। সে দায় আমাদেরই ঃ

দিনের পর দিন এই কোনঠাসা, দম-আটকানো অবস্থা চলতে লাগল একটানা। অতীতের রাহু আবার তাঁকে গ্রাস করল এরই সুযোগে।

হয়তো একেবারে শেষের দিকে অবস্থান্তর ঘটেছিল কিছুটা। প্রকাশক ও পত্রপত্রিকার রুদ্ধ দরজা আবার কিছুটা খুলেছিল ধীরে ধীরে সমাজের জ্ঞানী গুণী মানী ব্যক্তিরা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন হাত। কিন্তু তখন বড় বেশি দেরি হয়ে গেছে।

তবু মানিকবাবুর মৃত্যু আজ আমাদের সকলকেই মিলিয়েছে এটাই মস্ত সান্ত্বনা।

পুলিসের গুলিতে মরণাহত 'চিহ্নের' সেই ছাত্রটির কথা কেন জানি মনে হচ্ছে—মিছিলের দিকে আঙুল দেখিয়ে যে ক্রমাগত বলছিল: "ওরা এগোচ্ছে না কেন। ওরা কি আর এগোবে না?"

পরিচয় ॥ পৌষ, ১৩৬৩ ॥

বিমল মিত্র

পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ

ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তারপর এলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এর মধ্যে কোনো মূলগত পার্থক্য ছিল না। বেশ সহজ সরল গতিতে ক্রমপরিণতির দিকে এগিয়েই আসছিলাম। চেনাশোনা রাস্তা। উনবিংশ শতাব্দী থেকে সমাজ-মনের যে গঠনধারা যেমনভাবে এগিয়েছে, সাহিত্যেও আমরা তেমনিভাবেই এগিয়েছি। কখনও হাই জাম্পও দিই নি, লং জাম্পও দিই নি। তারপর একদিন কয়েকজন বুড়োবুড়িকে নিয়ে সাগর-সঙ্গমের তীর্থ-সঙ্গমের তীর্থযাত্রায় বেরিয়েছিলাম। ভাটার টানে নৌকোও বেশ ভেসে চলছিল। জোয়ারের আশায় একবার নৌকো বেঁধেছিলাম। রান্নার জন্যে কাঠ আনতে দ্বীপের মধ্যে পাঠিয়েছিলাম নবকুমারকে। নবকুমার কাঠ আনতে বুঝি দেরিও করেছিল একটু। আমরা নবকুমারের দেরি দেখে নৌকো ছেড়ে দিয়েছিলাম জোয়ারের টানে। ভেবেছিলাম নবকুমারের যা হয় হোক। আমরা তো বাঁচি। কিন্তু নবকুমার সেদিন মরেনি। বাঙলা সাহিত্যের বহু সৌভাগ্য যে নবকুমার সেদিন বেঁচেছিল।

কে যেন পেছন থেকে এসে তাকে প্রশ্ন করেছিল—পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ ?

আর তার ফলেই আমরা পেলাম কপালকুণ্ডলাকে !

একটা গল্প বলি।

তিন বছর আগের কথা। কিছু সরকারী লোক, আর আমরা

জন কুড়ি সাহিত্যিক জমা হয়েছি হাওড়া স্টেশনের আট নম্বর প্লাটফরমে। রাত দশটার সময় স্পেশাল ট্রেন ছাড়বে হাওড়া থেকে আমাদের নিয়ে। চারদিন ধরে আমরা ঘুরবো দামোদর-বাঁধ পরিকল্পনার কাজ-কর্ম দেখতে। সবাই জম-জমাট হয়ে প্লাটফরমে বিরাজ করছি। শীতকাল। সঙ্গে লেপ-তোষক সোয়েটার ওভারকোট। কিন্তু ট্রেন আর ছাড়ে না। শোনা গেল রাত বারোটার আগে স্পেশাল ছাড়বে না, কোথায় নাকি এ্যাকসিডেণ্ট হয়ে লাইন আটক হয়ে আছে।

আবার প্লাটফরমে গল্পগুজব জমে উঠলো। সিগারেট, ওভারকোট, শাল, জহরকোট সব দলে দলে বিভক্ত হয়ে গেল। বহুদিন পরে সকলের সঙ্গে দেখা। চার দিন চার রাত এক গাড়িতে একসঙ্গে ওঠা-বসা খাওয়া-দাওয়া ঘুমানো সমস্ত! কথা বলে আড্ডা দিয়ে যেন আর আশ মিটছে না।

হঠাৎ দেখি গেট পেরিয়ে আসছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। এ যেন আসা নয়, উদয় হওয়া। আগমন নয় আবির্ভাব! দুর্গেশনন্দিনী, বড়দিদি, পথের পাঁচালীর পর একেবারে পুতুল নাচের ইতিকথা। প্রথমে ব্যতিক্রম। একে ভালো লাগে, কিন্তু এ যেন ভীতিপ্রদ ভালো লাগা। গোবিন্দলাল, সুরেন্দ্রনাথ কিংবা অপু ওদের কেউ নয়, ওদের কিছু নয়। এ যেন কপালকুণ্ডলা। চারদিকে অরণ্য, জনহীন উপত্যকা আর বালিয়াড়ি, সেই পরিবেশে নিষ্ঠুর সহৃদয়তা, কঠোর মমতা, আলুলায়িত কেশদাম, দু'টি চোখে নিষ্প্রাণ সহানুভূতি আর স্নেহ-মমতাহীন কৌতূহল—পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ?

সে প্রশ্নে বাঙলা সাহিত্যের নবকুমার প্রাণ পেয়েছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু বিস্ময়, ভীতি, কৌতূহল, ভালবাসা, সব মিলিয়ে সে এক নতুন রস। খানিকটা কাপালিক, খানিকটা কপালকুণ্ডলা, খানিকটা নবকুমার—সব মিলিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙলা সাহিত্যের এক অপূর্ব প্রকাশ।

বললাম—এত দেরী যে আপনার?

দেখি, ওভারকোট নয়, শাল নয়, জহরকোটও নয়—একটা ময়লা এণ্ডির চাদর গলায়, একটা আকাচা আধময়লা লংক্লথের পাঞ্জাবী, খাটো ধুতি। আর দু'হাতে দুটো ভারি বোঝা। এক হাতে একটা রঙচটা টিনের স্যুটকেস আর এক হাতে লেপ-তোষক বিছানার বাণ্ডিল, বেশ জুত করে নারকোল দড়ি দিয়ে জম্পেশ করে বাঁধা। সেই দুটোর ভারে বেশ টলতে টলতে আসছেন। মুখে চোখে বিরক্তি।

আমার প্রশ্নের উত্তরে বললেন—এ কী রকম অব্যবস্থা, কারো কোথাও সাক্ষাৎ নেই—চারদিকে ঘুরে ঘুরে হায়রান—

বুঝলাম বাঙলা সাহিত্যে আসবার আগে অনেক হয়রানি সহ্য করতে হয়েছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এ প্লাটফরম থেকে সে প্লাটফরম। কোথাও কারো সাক্ষাৎ পান নি। পান নি ঠিক মনের মতন উত্তরটি। দু'হাতে অনেক প্রশ্নের বোঝা। সে বোঝা কুলির মাথায় তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি। হাতড়ে ফিরেছেন বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র। সব দরজায় গিয়ে ঘা দিয়েছেন। সবাই বলেছেন—এখানে নয়, এখানে নয়, অন্য প্লাটফরমে দেখো—এখানে সব নিয়ম-বাঁধা, স্পেশাল ট্রেন এখান থেকে ছাড়বে না—

কিন্তু এখানে এসেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যেন সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। এখানেও অব্যবস্থা, এখানেও অনাচার। এ সমাজেও সেই অনিয়ম, সেই অপব্যয়। এখানেও গৃহ গৃহ নয়, স্বামী স্বামী নয়, স্ত্রী স্ত্রী নয়। সন্তান স্বার্থ, স্নেহ এখানে পণ্য, ভালবাসা এখানে পণ্য, ভালবাসা এখানে ছল! অনেক দেখেশুনে অনেক বিবেচনা করেও কোনও সমাধান খুঁজে পেলেন না। বললেন—এর প্রতিকার চাই। এর সমাধান চাই, এর সংস্কার চাই। মানুষকে সুখী করতে হবে। সমাজকে সুস্থ করতে হবে। সব অব্যবস্থা দূর করতে হবে।

বললেন—চারদিকে এত অব্যবস্থা কেন! এ কী রকম আয়োজন এদের।

বললাম—প্লাটফরম-এর শেষের দিকে চলে যান, চার্ট টাঙানো আছে। কোন্ গাড়িতে আপনার বার্থ আছে সব লেখা আছে ওখানে।

টলতে টলতে আবার চলতে লাগলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম। যেন ভ্রূকুটি ফুটে উঠেছে সেখানে। সত্যিই কোনও ব্যবস্থা নেই কোথাও। সরকারী কর্মচারী অনেক রয়েছেন। অভ্যর্থনা করা দূরে থাক নির্দেশ দিয়ে সাহায্য করারও কেউ নেই। এতে অন্য দশজন সাহিত্যিকের বিশেষ কিছু আঘাত লাগে নি। তাঁরা ট্যাক্সি চেপে কিংবা ঘরের গাড়িতে স্টেশনে এসেছেন, তারপর কুলির মাথায় মাল চাপিয়ে সোজা আট নম্বরে এসে আস্তানা নিয়েছেন। ব্যবস্থার ত্রুটি নিয়ে অনুযোগ অভিযোগের প্রশ্ন ওঠেনি তাঁদের মনে। আর অভিযোগ উঠলেও মনে মনে একটা আপোস করে নিয়েছেন। সমাজে চলতে গেলে সব অব্যবস্থায় অত অধৈর্য হলে চলে! অন্যায় তো আছেই, অনাচার অত্যাচার তো আছেই। স্টেশনে এসে পৌছলেই যে অভ্যর্থনা করার জন্যে সবাই হাজির থাকবে সামনে—এমন হলেই ভালো হতো অবশ্য, কিন্তু যদি তা না-ই হয় তো মাথা-গরম করবো নাকি। অপমান পকেটে করে নিয়ে হাসিমুখে মিষ্টিকথা বলাই তো ভদ্রতা। আমরা তো এই ভদ্রতারই প্রশংসা করি। এই ভদ্রতারই বড়াই করি। যিনি এই ভদ্রতার কথা ভদ্রভাবে লেখেন আমরা তাঁর লেখা পড়েই বলি—বাঃ, চমৎকার মিষ্টি লেখা! তাই সত্যকথাও অপ্রিয় হবে বলে সময় সময় আমরা চেপে যাই। অব্যবস্থা যদি থাকে কোথাও তো থাক না, আমরা কেন তা প্রকাশ করে অপ্রিয়ভাজন হই। সমাজে যদি কোথাও ঘা থাকে থাকুক, তুলো দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দাও—মাছি বসবে না, আমাদের দৃষ্টিকেও পীড়া দেবে না।

দেশের এমনি এক অব্যবস্থার সময় একদিন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এসেছিলেন। সেদিন তাঁকে অভ্যর্থনা করার কেউ ছিল না। ছিল না

প্লাটফরমের ঠিকানা, ছিল না কোনও নির্দেশসূত্র। নিজের মালপত্র বাক্স বিছানা, নিজের প্রশ্ন নিজের সমস্যা নিজেই ঘাড়ে করে বয়ে নিয়ে এসেছিলেন সেই আট নম্বর প্লাটফরমে। ট্রেন ছাড়বে রাত দশটার সময়। একেবারে জীবনের সন্ধিলগ্নে এসে চারিদিকের অব্যবস্থা অনিয়ম অনাচার দেখে ভ্রূকুটি করলেন তিনি। সেই ভ্রূকুটিতে জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে গেল হারু। মাঠের মধ্যে পথ চলতে চলতে বজ্রাঘাতে অচল কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল হারাধন। তাকে স্নেহ দিয়ে মমতা দিয়ে বাঁচিয়ে তুললেন না মানিক। তিনি বললেন—পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ ?

নবকুমার সে-প্রশ্নে চমকে উঠেছিল বহুদিন আগে।

কিন্তু হারু চমকালো না। একটা টিক্‌টিকি শুধু গাছের ডাল বেয়ে নেমে হারুর পায়ের কাছ দিয়ে নির্ভয়ে চলে গেল। ওরাও বুঝি টের পায়। তারপর এক সময় দড়াম করে মাটিতে পড়ে গেল হারুর শক্ত কাঠ দেহখানা।

আর তার ফলেই আমরা পেলাম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

দূর থেকে দেখলাম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তেমনিভাবে চলেছেন। প্লাটফরমের কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। একেবারে শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়েছিলেন মনোজ বসু এবং আরো কয়েকজন। সামনে একটা খুঁটির গায়ে ছাপানো চার্ট ঝুলছিল। কার কোন্ নম্বরে স্থান—তারই নির্দেশ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থাননির্দেশ সেদিন সরকার কোন্ শ্রেণীতে করেছিলেন তা দেখিনি, দেখলেও আজ তা মনে থাকবার কথা নয়। ওপরে না নিচে, পাশে না সামনে তারও আজ হিসেব নেই। কার নামটা এক ইঞ্চি ওপরে আর কারই বা এক ইঞ্চি নিচে কিংবা কার নাম গ্রেট বোল্‌ডে আর কার নাম পাইকাতে—এসব দিকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নজর ছিল না। তিনি বলতে গিয়েছিলেন এই অব্যবস্থার কথা।

মনোজ বসু বললেন—আপনার কোন্ গাড়িতে সিট্ পড়েছে দেখুন—লেখা রয়েছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন—এ কী রকম আয়োজন এদের—কোনও ব্যবস্থা নেই কোথাও!

মনোজবাবু বললেন—বৃহৎ ব্যাপারে একটু অব্যবস্থা হয়েই থাকে।

—তা বলে সরকারী ব্যাপারেও ব্যবস্থা থাকবে না?

আশেপাশের ভদ্রলোক কয়েকজন হাসলেন। ট্রেন ছাড়ে কি না আগে তাই দেখুন—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আরো তীক্ষ্ণ ভ্রূকুটি করলেন।

বললেন—তার মানে?

—তার মানে, য়্যাক্সিডেণ্ট হয়ে সামনের লাইন আটকে আছে, লাইন পরিষ্কার না হলে এ-ট্রেন ছাড়বে না।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন—কখন লাইন পরিষ্কার হবে?

—তা রাত বারোটায়ও হতে পারে, একটাও হতে পারে—কাল ভোরেও হতে পারে।

হঠাৎ অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন মানিক। এত অব্যবস্থা! এত অনাচার, এত অনিয়ম, এত বেহিসেব! দেশের কোথাও কি সুস্থতা, কোথাও কি শৃঙ্খলা থাকতে নেই! সারাজীবন ধরে এক সুস্থ, সুশৃঙ্খল, সুখী সমাজের বাস্তবরূপ দেখতে চেয়েছেন। সে-সমাজ পাবার আশায় আপোসহীন সংগ্রাম করে এসেছেন—পুতুলের সমাজ ভেঙে মানুষের সমাজ গড়তে চেয়েছেন, সব চেষ্টা কি তবে ব্যর্থ!

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গট্ গট্ করে আবার ফিরলেন। আবার সেই লম্বা প্লাটফরম পার হয়ে চলতে লাগলেন উল্টোদিকে, যেদিক দিয়ে এসেছিলেন।

আমরা দেখলাম—হাতে দুটো ভারি বোঝা। এক হাতে রঙচটা ভারি টিনের সুটকেশ, আর এক হাতে লেপ-তোষক, নারকোল দড়ি দিয়ে জম্পেশ করে বাণ্ডিল বাঁধা। বোঝার ভারে নড়তে পারছেন না। তবু আপ্রাণ শক্তিতে আবার ফিরে চলেছেন! তাঁর চেহারার দিকে চেয়ে দেখলাম—অব্যবস্থার চাপে তিনি যেন হাঁফিয়ে উঠেছেন। বার বার মানুষকে সুখী দেখতে চেয়েছেন, সব অনাচারের প্রতিকার

করতে চেয়েছেন, সমাজের আমূল সংস্কার কামনা করেছেন—আজ যেন ঘৃণায় অসাফল্যে একেবারে ম্রিয়মাণ হয়ে গেছেন। মানুষ আর মানুষ হলো না—পুতুলই রয়ে গেল, এ ক্ষোভ, এ লজ্জা যেন তিনি আর সহ্য করতে পারলেন না। তাই অসহ্য হওয়াতে তিনি আমাদের পাশ কাটিয়ে হন্ হন্ করে প্লাটফরমের গেট পেরিয়ে একেবারে রাস্তায় গিয়ে পড়লেন।

আমরা অবাক হয়ে যে যার মুখ চাওয়াচাওয়ি করেছিলাম সেদিন। সেদিন বুঝতে পারিনি। আমরা নিশ্চিন্তে সংসারের দৈনন্দিন কাজ-কর্ম চালিয়েছি। আপোস-রফা করে বেঁচে আছি। পথে চলবার সময় ফুটপাথের ওপর দিয়ে চলেছি যাতে গাড়িচাপা না পড়ি।

আর কপালকুণ্ডলা?

নবকুমার একদিন কপালকুণ্ডলাকে কাপালিকের হাত থেকে উদ্ধার করে ঘরে নিয়ে এল। তার সিঁথিতে সিঁদূর লাগিয়ে দিলে। তাকে অলঙ্কার দিলে, বেনারসী শাড়ী দিলে। নিজের অঙ্কলক্ষ্মী করে নিলে তাকে।

কিন্তু কপালকুণ্ডলাকে বেঁধে রাখবে এমন নবকুমার কোথায়?

পরিচয় ॥ পৌষ, ১৩৬৩ ॥

অচ্যুত গোস্বামী

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের বিষয়বস্তু

মানিক-সাহিত্য আলোচনা করতে বসে প্রথমেই মনে পড়ছে যে এই সাহিত্যকে ঘিরে পাঠক-মানসে অনেক কুজ্ঝটিকা জমে রয়েছে। সেটা স্বাভাবিকও। যে কোনো মহৎ শিল্পকীর্তি প্রকৃতির রাজ্যের বৃহৎ বস্তু বা ঘটনাগুলোর মতোই বিস্মিত মানুষের ব্যাখ্যা প্রবণতাকে উদ্বুদ্ধ করে। প্রাকৃতিক বস্তুর গায়ে যেমন তার কার্য-কারণের বা নিয়ম পদ্ধতির কথা লেখা থাকে না, সাহিত্য বা অন্য ধরনের শিল্পবস্তু সম্পর্কেও সে কথা সত্য। সেইজন্যই বিখ্যাত সাহিত্যকীর্তি সম্পর্কে নানা মত, অনেক সময় পরস্পর-বিরোধী মতও গড়ে উঠতে দেখা যায়।

মানিকবাবুর উপন্যাস সম্পর্কেও অনেক পাঠক এবং সমালোচকদের মধ্যে এমনি কতকগুলি বদ্ধমূল ধারণা রয়েছে। এই ধারণাগুলি সম্পর্কে কোনো সুনির্ধারিত সিদ্ধান্তে না আসতে পারলে মানিক-সাহিত্যের মূল্যায়ন বা তার প্রকৃতি নিরুপণ করা অসুবিধাকর হয়ে পড়ে। কাজেই আলোচনার শুরুতেই এমনি দু-একটি প্রচলিত ধারণার সত্যাসত্য বিচার করার প্রয়োজন আছে।

পাঠকদের মধ্যে একটি ব্যাপক ধারণা আছে যে মানিকবাবু তাঁর প্রথম যুগের লেখায় অস্বাভাবিক মানসিকতাগ্রস্ত চরিত্রদের নিয়ে লিখতে ভালবাসতেন। 'অহিংসা' উপন্যাসের সাধুর চরিত্রটি বা 'চতুষ্কোণ' উপন্যাসের যে নায়ক একই সময়ে চারটি নারীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছিল, বা 'জীয়ন্তে'র যে পাকা অল্প বয়সেই সন্ত্রাসবাদী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেও কোনোদিনই সে পথে যেতে পারল না,—এরা সবাই বিশেষ এক একটি মানুষ, পাঁচজনের একজন নয়। এদের

চরিত্রের বিশেষ অপ্রত্যাশিত গতি কৌতূহল উদ্দীপ্ত করে, কিন্তু এদের অস্বাভাবিক বিশেষত্বগুলোই এদেরকে সাধারণ স্বাভাবিক মানুষগুলোর থেকে আলাদা করে রেখেছে।

এই ধারণা কি ঠিক?

আলোচনা করতে হলে বাংলাদেশে অস্বাভাবিক মানসিকতা নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস যখন প্রথম শুরু হয় তার খবরও নিতে হয়। মানুষ পারিপার্শ্বিকের চাপে বা জীবনের ভুলভ্রান্তির দরুন বিকৃতির পথে চলে যেতে বাধ্য হয় এমন ঘটনা শরৎচন্দ্রের মধ্যেও পাওয়া যায়। কিন্তু পারিপার্শ্বিকের প্রভাবের কথাটাকে অনুক্ত বা পরোক্ষে রেখে বিকৃত মানসিকতারই সবিস্তার বিবরণ কল্লোলকালীন সাহিত্যেই কিছুটা পরিমাণে দেখা যায়। বুদ্ধদেব বসুর 'ধূসর গোধূলি', 'অসূর্যম্পশ্যা' প্রভৃতি ছু-একখানা বইতে এই প্রয়াস আছে। ধূসর গোধূলির নায়ক ছাত্রজীবনে রাতদিন পড়াশুনা করত পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার জন্য। পড়াশুনার পাট চুকিয়ে যেদিন সে চাকরিতে ঢুকল সেদিন সেই যে সে বই-এর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করল আর কোনোদিন বই স্পর্শ করল না। বিয়ে করে কতকদিন বৌ-কে নিয়ে মশগুল হয়ে রইল, তারপর শুরু হল বৌ-এর উপর অত্যাচার, শেষে সে হল উন্মাদ। এই চরিত্রের মানস-ক্ষেত্রে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভারসাম্যের একটা দারুণ অভাবের পরিচয় রয়েছে। এই জাতীয় চরিত্রকে সাহিত্যে প্রাধান্য দেওয়ার কারণ হচ্ছে ফ্রয়েডের প্রভাব। ফ্রয়েড বিকৃত মস্তিষ্কদের নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে করতেই তাঁর বিখ্যাত সিদ্ধান্তগুলিতে পৌঁছেছিলেন। মানুষের মন নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করতে হলে মন যেখানে বিপর্যস্ত সেখানে গেলেই সত্যের সন্ধান পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। ফ্রয়েডের এই ধারণাকেই বিভিন্ন সাহিত্যিকরা গ্রহণ করেছিলেন।

বলা বাহুল্য, ফ্রয়েডের সিদ্ধান্ত যে, মানুষের মনের সবচেয়ে প্রধান এবং নিয়ামক শক্তি হল যৌন-কামনা এবং অবদমিত যৌন-কামনা

মানুষের চেতন মন ছেড়ে অবচেতন মনে গিয়ে আশ্রয় নেয়—এ কথাগুলোও মোটামুটিভাবে উক্ত লেখকেরা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা ফ্রয়েডকে গ্রহণ করেছিলেন জয়েস লরেন্স প্রভৃতি ইংরেজ লেখকদের মারফত।

মানিকবাবু তাঁর সাহিত্য-জীবনের প্রথম দিকে কল্লোলকালীনদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এ কথা অস্বীকার করা যায় না। তাঁর 'দিবারাত্রির কাব্য' বা 'পুতুলনাচের ইতিকথা' বা 'পদ্মানদীর মাঝি'তে যৌন-কামনা যে মানুষের জীবনে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে তার স্বীকৃতি রয়েছে। কল্লোলকালীনদের মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক যৌন-বৃত্তি নিরোধের বিরুদ্ধে অবাধ যৌন-অধিকারের বিদ্রোহ ঘোষণার ভাবটা স্পষ্ট ছিল। মানিকবাবুর মধ্যে এই তারুণ্য-সুলভ উচ্ছ্বাস-প্রবণতার অভাব ছিল শুরু থেকেই। তিনি বরং স্থির মস্তিষ্কে যৌন-কামনা কীভাবে মানুষের জীবনে প্রভাব বিস্তার করে সেইটে বিশ্লেষণ করতে অগ্রসর হলেন।

এইখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে। কল্লোলকালীনরা যে অবাধ যৌন-অধিকারের দাবি জানালেন তার পিছনে তাঁদের এই বিশ্বাস ছিল যে, যথেষ্ট শিক্ষা-বিস্তারের ভিতর দিয়ে মানুষের মনকে সংস্কারমুক্ত করে তুলতে পারলে সমাজে একদিন বাস্তবিকই এই দাবি স্বীকৃত হতে পারে। আর সমাজ তারপর আনন্দ-নিকেতন হয়ে উঠবে অনায়াসে। সংস্কারের সম্ভাব্যতার উপর এই বিশ্বাস বঙ্কিমের কাল থেকে কল্লোল-প্রকাশের কাল পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন গতিতে চলে এসেছে। খানিকটা তার প্রভাবে এবং প্রধানত দেশের অর্থনৈতিকশক্তি-সংস্থানের পরিবর্তনের ফলে দেশের সমাজনীতি সম্পর্কে চিন্তাধারায় অনেক পরিবর্তন এসেছিল কল্লোলকুলের লেখকদের অস্তিত্বই তার যথেষ্ট প্রমাণ। কিন্তু সমাজদেহে তবু কোন একটি বিচ্ছিন্ন সংস্কার-প্রচেষ্টাও সার্থকতা লাভ করেছে এমন প্রমাণ ছিল না। মানিকবাবুই প্রথম লেখক যিনি দাঁড়িয়ে উঠে বললেন: তোমরা সংস্কার সংস্কার

করে চিৎকার করছ, সত্যিই সংস্কার সম্ভব কিনা কোনোদিন ভেবে দেখেছ কি? দেশবাসী যাতে সেটা ভেবে দেখে সেইজন্য তিনি 'পুতুলনাচের ইতিকথা'তে একজন আদর্শবাদী তরুণ ডাক্তারকে বাংলার এক গ্রামে এনে বসালেন। শশি সন্থ পাশ করা ডাক্তার, শহরে গিয়ে বসলে তার উপার্জনের পথ উন্মুক্ত। তবু সে রোজগারের মোহ ত্যাগ করে নিজের গ্রামে এসে বসল যাতে জ্ঞানের আলো বিতরণ করে কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রাম্য মানুষদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক চেতনা সঞ্চার করতে পারে। স্বাস্থ্য-বোধগুলো পালন করে চললে তারা অনেক রোগের হাত থেকে অব্যাহতি পেতে পারবে এবং সুস্থ সবল শক্তিশালী জন-সমাজে পরিণত হবে। কিন্তু কার্য-ক্ষেত্রে নেমে সে দেখতে পেল যে অপরের ভালর জন্য যে-স্বাস্থ্যবোধ-সম্মত উপদেশ দেয় বিচিত্র অভাবিত যুক্তির সাহায্যে সে উপদেশগুলো তার বিরুদ্ধে আক্রমণ হিসাবে ফিরে আসে। সংস্কারকে সার্থক করে তোলার একমাত্র অস্ত্র হল যুক্তি, কিন্তু বিভিন্ন স্বতঃসিদ্ধের উপর দাঁড়িয়ে একই যুক্তির নিয়ম অনুযায়ী যুক্তি প্রয়োগ করে যে সম্পূর্ণ ভিন্ন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় অনেক দুঃখে শশিকে তা জানতে হল। শুধু তার যুক্তিই যে লোকেরা উড়িয়ে দেয় তা নয়, নিতান্ত আপনজনের কথা শোনা বা তার অবস্থাটা বুঝতে চেষ্টা করা—তাও কেউ করে না। পরান আর তার বৌ কুসুমের মধ্যে কোনো নিবিড় সম্পর্ক নেই, কুসুম আর তার শাশুড়ীর মধ্যে দা-কুড়ুলের সম্পর্ক, কুসুম আর তার ননদ মতির মধ্যে খানিকটা সখিত্ব থাকলেও কোনো বোঝাপড়া নেই। তেমনি হারান কবিরাজ তার মৃত্যুপথযাত্রী বৌ-এর চিকিৎসা করতেও অনিচ্ছুক। তেমনি শশির নিজের বাড়িতে যতজন সভ্য তারা প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন। প্রত্যেকটি মানুষ যেন এক একটি স্বতন্ত্র নিশ্ছিদ্র দুর্গের অধিবাসী,—সেই দুর্গের অধিশ্বরীর যুক্তি এবং নির্দেশ অনুসারে সে চালিত হয়। সেই জন্যই তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করেও মানুষের সঙ্গে মানুষের বিরোধ সীমাহীন সমাধানহীন সংঘর্ষে পরিণত হয়। মানব-দুর্গের এই অসীম শক্তিশালী অধিশ্বরীটি কে? মানিকবাবুর আবিষ্কার যে, সে

হল মানুষের-সবচেয়ে শক্তিশালী জৈবিক বৃত্তি—যৌন-কামনা। স্বল্পবিত্ত, বেকার, দুর্বলদেহ পরান তেজী বৌ কুসুমকে তৃপ্ত করতে পারে না, অতৃপ্ত কুসুমের নিরুদ্ধ আবেগ প্রচ্ছন্নভাবে শশিকে কামনা করে কিন্তু তা প্রকাশ করার পথ খুঁজে পায় না বলে তার চলনে বলনে চাঞ্চল্য, অস্থিরতা, খামখেয়ালীপনা। হারান কবিরাজ তার বৌ-এর চিকিৎসার ভার শশির হাতে দিতে অনিচ্ছুক, তার মূলে রয়েছে তার মনে গোপন যৌন-ঈর্ষা। এমন কি হারান কবিরাজের বৌ-এর প্রতি শশির বাবা গোপালের মনোভাবটিও রহস্যময় এবং সে রহস্য আর কিছুই নয়—অত্যন্ত প্রচ্ছন্ন যৌন-কামনা। অত্যন্ত বিজ্ঞাননিষ্ঠ বলে শশির নিজের মনে অহংকার ছিল। গ্রামের তথাকথিত সিদ্ধপুরুষ যখন নিজের ইচ্ছামৃত্যুর কথা প্রকাশ করে ফেলে আত্মসম্মান রক্ষার জন্য আফিং খেয়ে আত্মহত্যা করল, তখন শশির মনে হল গ্রামের লোকের মিথ্যা মোহকে দূর করার জন্যও সে সত্য কথাটা প্রকাশ করতে পারবে না। জীবনে এমন অনেক মিথ্যা আছে বিজ্ঞান যাকে অজ্ঞাত কারণে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়।

পাঠকের যখন মনে হয় যে 'পুতুল নাচের' চরিত্রগুলো অত্যন্ত জীবন্ত এবং সত্য চিত্র, তখন বুঝতে হবে যে লেখকের কল্পনা মানুষের অন্তর্লোকের সত্যকে স্পর্শ করেছে। বৈজ্ঞানিকের মতো সাহিত্যিকও জীবনের জানা জিনিসগুলোর থেকে অজানা সত্য আবিষ্কার করতে চান। বৈজ্ঞানিকের অস্ত্র অনুমান (hypothesis) ; লেখকের অস্ত্র কল্পনা (imagination)। বৈজ্ঞানিকের অনুমানের যাথার্থ্য প্রমাণিত হয় পরীক্ষার ভেতর দিয়ে ; লেখকের কল্পনার যাথার্থ্যের প্রমাণ পাঠকের প্রত্যয়বোধ। বলা বাহুল্য, সত্যও-আপেক্ষিক সত্য, প্রমাণও আপেক্ষিক প্রমাণ। মানিকবাবুর চিত্রায়ণের সত্যতা সম্পর্কে অখণ্ড প্রত্যয়বোধ সত্ত্বেও পাঠকের মনে এই অভিযোগ জাগে যে মানিকবাবুর এই চরিত্র-গুলোর সবাই তো অসুস্থ, অস্বাভাবিক ; এদের মধ্যে সহজ স্বাভাবিক মানুষ কে ?—এই অভিযোগ নিরর্থক। কারণ উপন্যাসটির মধ্যে

মানিকবাবুর নিজেরও জিজ্ঞাস্য তাই। আমরা যে বৈজ্ঞানিক যুক্তি-তর্কের ভিতর দিয়ে দেশের মানুষকে সংস্কৃত করতে চাই, সে যুক্তি শোনার মত সুস্থ কান কার আছে? লেখক একটি গ্রামের সমগ্র মধ্যবিত্ত সমাজের যত রকমের মানুষ থাকতে পারে প্রত্যেককে উপস্থিত করে দেখাচ্ছেন, এরা সবাই অসুস্থ। এমন কি অমন আদর্শবাদী শশি যে সকলের রোগ সারাবে বলে ভেবেছিল, দেখা গেল শেষ পর্যন্ত সেও তার নিজের মনের জালে জড়িয়ে পড়ল।

এখানে মানিকবাবুর সঙ্গে ফ্রয়েডের দৃষ্টিভঙ্গীর তফাৎটা লক্ষ্যণীয়। ফ্রয়েডের দৃষ্টির সামনে ছিল ব্যক্তি—ব্যক্তির রোগারোগ্যের জন্য মনো-বিকলনের সাহায্য নেওয়ার প্রক্রিয়া তিনি বাতলিয়ে দিয়েছিলেন। ব্যক্তির রোগের জন্য সমাজকে তিনি দায়ী করেছেন; কিন্তু সমাজের চিকিৎসার জন্য তাঁর একমাত্র 'দাওয়াই' হল শিক্ষার বিস্তার। মানিক-বাবু দৃষ্টিটাকে প্রসারিত করে দিয়ে সমগ্র সমাজের উপর ফেলছেন; সমগ্র সমাজ সেখানে অসুস্থ, সেখানে শিক্ষা-বিস্তারে কোনো ফললাভের আশা নেই। যৌন-কামনার উৎস ব্যক্তির মধ্যে প্রোথিত হলেও এটা এমনি জিনিস যে তা নিজের মধ্যে নিজে পরিতৃপ্তি খুঁজে পায় না, তার পরিতৃপ্তির জন্য অন্য মানুষের সহযোগিতা চাই। অর্থাৎ সমস্যাটা মূলত সামাজিক।

মানিকবাবুর এই সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যই তাঁকে আমরা মনস্তত্ত্ব-মূলক ঔপন্যাসিক বলি না। ফ্রয়েডের অনুসরণে মনস্তত্ত্বমূলক ঔপন্যাসিক ব্যক্তিকে কেন্দ্র করেন, সে-সব ব্যক্তির কাহিনী চিত্রিত করেন যাদের মন বিশেষভাবে বিকৃতিগ্রস্ত, যাদের চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের কাছে যাওয়ার সময় এসেছে। মানিকবাবু কিন্তু ভিন্নপথাবলম্বী বলেই এই অনেক চরিত্রকে এবং সমাজের প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্রকে রূপায়িত করেছেন। সমস্যার সামাজিক দিকটাই তাঁর লক্ষ্যস্থল। সেইজন্যই ঔপন্যাসিক হিসাবে তিনি বাস্তববাদী।

সংস্কারকরা বলতে পারেন, গ্রামের অর্ধশিক্ষিত সমাজে বৈজ্ঞানিক

চিন্তাধারা জাগ্রত করা শক্ত হতে পারে, কিন্তু যারা প্রকৃতই শিক্ষিত তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই এ কাজ সম্ভব। এই সম্ভাব্যতাকে যাচাই করার জন্য মানিকবাবু 'শহরবাসের ইতিকথা' লিখলেন, পুতুলনাচে যেমন শশি শহর থেকে পাশ করে গ্রামে ফিরে গিয়েছিল, এখানে তেমনি মোহন গ্রামের বাস তুলে দিয়ে শহরে চলে এল ; তার মনে আশা, শহরের শিক্ষিত পরিবেশের মধ্যে সে উন্নততর জীবনযাত্রার সন্ধান পাবে। এখানে তার বন্ধুবান্ধবরা ফ্রয়েড জানে, নর-নারীর যৌন-সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত তা জানে, নারীর সমানাধিকারকে স্বীকার করে। তবু মোহনকে আবিষ্কার করতে হল, সমস্যা এখানে বরং আরও জটিল। তার উচ্চশিক্ষিতা বান্ধবী তার তেমনি শিক্ষিত এবং অনুরাগী স্বামীর সংশ্রব ত্যাগ করে দূরে থাকে ; অজুহাত—স্বামী সন্তান কামনা করে, সে করে না। তার মনে স্বামীর সংশ্রবে অধিকার ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা। মোহন ভাই-এর সঙ্গে যথাসাধ্য গণতান্ত্রিক ব্যবহার করে, তবু তাকে এই অভিযোগ শুনতে হল যে সে ভাই-এর সঙ্গে অভিভাবক-সুলভ ব্যবহার করে। তাই ভাইও একটা প্রেমের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে। অর্থের প্রয়োজন—এই অজুহাতেই তার কাছে পৈতৃক অর্থের অর্ধাংশের ভাগ নিয়ে পৃথক হওয়ার দাবি জানাল। মা ভাই-এর পক্ষ নিলেন তাঁর নিজস্ব যুক্তি অনুযায়ী। মোহন নিজেই তার অসুখী দাম্পত্যজীবন নিয়ে, সন্ধ্যার প্রতি তার মনোভাবের অনিশ্চয়তা নিয়ে বিপর্যস্ত। মোহন দেখল বিদ্বান-বুদ্ধিমানদের সমাজেও মানুষ তার বায়ু-নিরুদ্ধ দুর্গের কুটিলা দেবীর বিকৃত যুক্তির প্রভাবে সমাজ-জীবনকে বিষাক্ত করে তুলছে।

মানিকবাবুর এই বই দুখানার মধ্যে আর একটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে যার উপর আমাদের গুরুত্ব দেওয়া দরকার। শরৎ-সাহিত্যে, অন্তত শরৎবাবুর প্রথম যুগের বইগুলো পরিবারকেন্দ্রিক, কল্লোলকালীন লেখকেরা ব্যক্তিকেন্দ্রিক। এই দুখানি বইতে কয়েকটি করে পরিবারের চিত্র উপস্থিত করা হলেও, পরিবারই লেখকের একক বলে মনে হয় না। বরং মনে হয় একটি পারিবারিক সম্পর্ককে,—যেমন স্বামী-স্ত্রী

বা ভাই-বোন বা বাপ-ছেলে বা প্রেমিক-প্রেমিকা—তাকেই লেখক তাঁর কাহিনীর একক হিসাবে গণ্য করেছেন এবং সম্পর্কের উভয় শরিকের মানসিক গতির উপর তিনি তুল্য গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শক্তির মানসিক গতি-প্রকৃতি অনুসরণ করেছেন তিনি এই সম্পর্কগত প্রশ্নটাকে কেন্দ্র করেই। এই বই দুখানিতে অবশ্য বৃহত্তর রাজনৈতিক-সামাজিক সমস্যাগুলো কমবেশি অনুপস্থিত, কিন্তু পরে আমরা দেখব, যেখানে বৃহৎ জাতীয় সমস্যা তাঁর সামনে এসেছে, সেখানেও তিনি তার বিচার করেছেন এই পারিবারিক সম্পর্কের ভিত্তিতে। মানিকবাবুর বিশ্বাস, পারিবারিক সম্পর্কের উন্নতি-অবনতিই হল মাপকাঠি যা দিয়ে জাতীয় উন্নতি বা অবনতির পরিমাপ করা যায়। এবং এক হিসাবে এ বিশ্বাস খুব বৈজ্ঞানিক। পারিবারিক সম্পর্কের উন্নতির উপরই ব্যক্তি মানুষের সুখ, তথা মানবজাতির সুখ নির্ভর করে একথা বোধকরি অস্বীকার করা যায় না। এবং পৃথিবীর যাবতীয় শিল্পী-সাহিত্যিকদের মনোগত কামনা ঐ জিনিসটা—সুখ, আনন্দ—মিথ্যাভিত্তিক সুখ নয়, জোড়াতালি দেওয়া সুখ নয় যে সুখ পাঁচজনের সুখের ব্যাঘাত না করেও, মনের গোলমালকে মনে চাপা দিয়ে না রেখেও, নিজে সুখী হতে পারে,—সেই সুখ।

এই সুখের প্রশ্নে কোন আপোসরফায় রাজী নন বলেই মানিকবাবু নৈরাশ্যবাদী (ফ্রয়েড তো প্রায় আশাবাদীই), কল্লোলকালীনদের থেকে বা তাঁর সমসাময়িকদের থেকে তিনি অনেক বেশি নৈরাশ্যবাদী। অসুখী মানুষের অসুস্থতার কারণ তিনি বিশ্লেষণ করে দেখেছেন কিন্তু তার কোনো সমাধান তিনি আজও খুঁজে পাচ্ছেন না। যেখানে কোটি কোটি মানুষের রোগারোগ্যের কোনো পন্থা নেই সেখানে ফ্রয়ডীয় মনোবৈজ্ঞানিকের ল্যাবরেটরীতে দশ-পাঁচজন চিকিৎসিত হয়ে আরোগ্য-লাভ করতে পারলেও তাতে তাঁর মন ওঠে না। তাঁর আন্তরিকতা যে কত গভীর, সততা যে কত নিরঙ্কুশ, সমবেদনা যে কত ব্যাপক, এইখানেই তার প্রমাণ।

কয়েকখানি বইতে মানিকবাবু এই পারিবারিক সম্পর্ককে একক হিসাবে গ্রহণ করেন নি, সেখানে পারিবারিক সম্পর্কের ন্যূনতম বন্ধনও অনুপস্থিত বলে। এই চরিত্রগুলোকে আমাদের কাছে আরও অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। এদের যেন সাহিত্যের পাতায় টেনে না এনে ডাক্তারখানায় পাঠিয়ে দিলেই ভালো হয়। কিন্তু শুরুতেই মনে রাখা দরকার যে সমস্যার গুরুত্ব প্রধানত ব্যক্তিগত, মনস্তত্ত্বমূলক লেখকদের মতো সে সমস্যার প্রতি মানিকবাবুর কোনো আকর্ষণ নেই। মানিকবাবুর প্রত্যেকটি চরিত্র সমাজের কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ অবস্থা বা পরিবেশের উপর আলোকপাত করেছে এবং সেইজন্যই মানিকবাবুর কাছে তার মূল্য। 'অহিংসা'র সাধু, 'সহরতলী'র যশোদা এবং 'জীয়ন্তে'র পাগলা – এ জাতীয় চরিত্ররাও সমাজের ব্যতিক্রম বলে মানিকবাবুর কাছে মর্যাদা পায় নি পেয়েছে বরং ঠিক তার বিপরীত কারণে।

'অহিংসা'র কথাই ধরা যাক। আমাদের দেশে শুধু যে সাধু-সন্ন্যাসীই অনেক তা নয়, সাধু-সন্ন্যাসীদের ঘিরে থাকে যে ভক্তবৃন্দ তাদের মনোভাবের মধ্যেও কতকগুলো অস্বাস্থ্যকর বিশেষত্ব আছে। প্রশ্নটা শুধু সাধু-সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। আমাদের দেশের আত্মনিগ্রহমূলক মনোবৃত্তির ফলে এমন অনেক মানুষ আছেন যাঁরা সন্ন্যাসীর ভেক না নিয়েও মূলত সমস্ত রকম পারিবারিক সম্পর্কের ঊর্ধ্বে বাস করেন। এঁদের সকলের প্রতিনিধি হচ্ছেন 'অহিংসা'র সাধুটি। সাধু এবং তাঁর ভক্তবৃন্দের মধ্যেকার সম্পর্ক প্রতারণা এবং অন্ধ জবরদস্তিমূলক বিশ্বাসের অদ্ভুত সমন্বয়ের দ্বারা গঠিত। লেখক অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে এই সম্পর্কের মর্মোদ্‌ঘাটন করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে অবরুদ্ধ যৌনকামনা আমাদের এই সবচেয়ে অসুস্থ সম্পর্কটিরও মূলীভূত শক্তি।

'সহরতলী' এবং 'জীয়ন্ত'তে মানিকবাবু অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কর্মের পটভূমিকাকে গ্রহণ করেছেন। অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কর্মের যেটুকু প্রসঙ্গ এসেছে, লেখক তা অদ্ভুত অন্তর্দৃষ্টির

সঙ্গে পরিবেশন করেছেন। কিন্তু রাজনৈতিক কর্ম এই দুটি বইএর মূল উপজীব্য নয়। সে সম্পর্কে এখনো দ্বিধাগ্রস্ত লেখক কোনো চূড়ান্ত মন্তব্য করতেও রাজী নন। তাঁর লক্ষ্য হচ্ছে, রাজনৈতিক কর্মী। সহরতলীতে মানিক সত্যপ্রিয়ের মূলত প্রতারণামূলক চরিত্র (ঘরে, কর্মচারীদের কাছে, শ্রমিকদের কাছে, সর্বত্রই তিনি প্রতারক, অনেকটা 'অহিংসা'র সাধুর মতো) এবং তার প্রতারণা-কৌশল 'জীয়ন্ত'তে সন্ত্রাসবাদীদের আন্তরিক স্বাধীনতা-কামনা এবং অতি-নৈতিক প্রবণতা এ সবকে লেখক যে দক্ষতার সঙ্গে উপস্থিত করেছেন তাতে অনেক পাঠকের মনে আপশোস হয় কেন তিনি যশোদা এবং পাকার মত অস্বাভাবিক নায়ক টেনে এনে বই দুখানার রাজনৈতিক চরিত্র ক্ষুণ্ণ করলেন। কিন্তু এইভাবে দেখতে গেলে লেখকের প্রতি অবিচার করা হবে। বই দুখানা মোটেই—যাকে রাজনৈতিক উপন্যাস বলা চলে—তা নয়। 'সহরতলী'র যশোদা স্বামী-বঞ্চিত; সে তার বাড়িতে শ্রমিকদের স্থান দেয় এবং তাদের সর্বদা উপকার করতে চেষ্টা করে। কিন্তু তার অন্তরের নিরুদ্ধ কামনা সমস্ত শ্রমিকদের মধ্যে একজন প্রণয়ীকে খুঁজে বেড়ায়, যদিও সে জানে যে সে স্থূলকায়া এবং কুৎসিত হওয়ার ফলে কারও পক্ষে তার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া সহজ নয়। এই অন্তঃসলিলা প্রণয়কামনার জন্যই সে সত্যপ্রিয়ের মিষ্টি ব্যবহার এবং কৃত্রিম মর্যাদাদানের জালে সহজে ধরা পড়ে এবং প্রতারিত হয়। যৌন-কামনার ব্যাপারটাকে সহজসাধ্য করার জন্য লেখক যশোদাকে নারীরূপে কল্পনা করেছেন, কিন্তু অনেক পুরুষ রাজনৈতিক নেতার জীবনেও যে অনুরূপ ট্র্যাজেডী ঘটতে পারে, লেখকের তাই বক্তব্য। 'জীয়ন্তে'র পাকার ট্র্যাজেডীর কারণও হল, সে কোনো পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে যেতে পারল না। অল্পবয়সে সে খেয়ালের বসে একবার বেশ্যা পাড়ায় বেড়াতে গিয়ে ধরা পড়ে যাওয়ায় রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদী দল থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিল। মনে অপরাধ বোধ ছিল বলে এই অপমানটা তার বুকে খুব বেশি বেজেছিল। আর তার সারা জীবনটাকে

তা দিল নষ্ট করে। পুলিশ কর্তৃক নিগৃহীত হওয়ার পর রাজনীতিকদের থেকে আমন্ত্রিত হয়েও সে নিরুদ্ধ অভিমানবশে তাতে যোগ দিতে পারল না। যৌন-কামনার ফলে সে যে অপমান ভোগ করেছিল, তা তার মনে যৌন-কামনার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ জাগিয়ে দিয়েছিল। তার ফলে সে তার প্রণয়িনীর সঙ্গেও মিলিত হতে পারল না। রাজনৈতিক কর্মীরা আদর্শবাদের ঝোঁকে মানব-প্রকৃতিকে সহানুভূতির সঙ্গে অনুধাবন করতে চেষ্টা না করে কত যে তরুণের ক্ষতিসাধন করে এটি তারই একটি উদাহরণ। অবশ্য পাকার যদি কোনো সুস্থ পারিবারিক সম্পর্ক থাকত তবে এ বিপর্যয় ঘটত না।

রাজনৈতিক কর্ম দেশের, সমাজের উন্নতি সাধন করতে চায়। মানিকবাবু এখনো এ সম্পর্কে নিরুত্তর, অনুসন্ধিৎসু। তাঁর নিরঙ্কুশ সততা সম্পূর্ণ প্রত্যয় না বোধ করা পর্যন্ত কখনোই কোনো পন্থা গ্রহণ করতে পারে না।

আমরা দেখলাম, যে পাকা বা যশোদা বা সাধুর মত চরিত্রও মানিকবাবু উপস্থিত করেছেন বিকৃত মানসিকতার প্রতি প্রীতিবশত নয়; সমাজের রোগের মূলানুসন্ধানের অঙ্গ হিসাবে।

এইবারে পাঠক এবং সমালোচকদের আর একটি ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করব। ধারণাটা হচ্ছে এই যে, মানিকবাবু হঠাৎ একটি রাজনৈতিক মতবাদ গ্রহণ করার ফলে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের বিষয় নিয়ে লিখতে শুরু করেছিলেন—যেগুলো তাঁর প্রতিভার প্রকাশের অনুকূল নয়। তিনি নিরাসক্তচিত্তে সমাজবিশ্লেষণের পন্থা ত্যাগ করে বাস্তবের উপর জোর করে তাঁর মতবাদ চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি রাজনীতিকের দৃষ্টিতে জীবনকে দেখতে চেষ্টা করার ফলে দৃষ্টির গভীরতা হারিয়ে ফেললেন, এবং অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ বিষয়ের উপর নিজের দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করলেন।

পক্ষান্তরে যে-সব বামপন্থী পাঠকেরা রাজনৈতিক সাহিত্য চান তাঁরা আপশোসের সঙ্গে ভাবতে লাগলেন, দেশের বৃহত্তর ভাঙা-

গড়ার কাহিনীগুলি মানিক-সাহিত্যে কোথায়? স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস, সমাজের শক্তিদ্বন্দ্বের কাহিনী, শ্রমিক-মালিকের সংগ্রাম— এ সবের ব্যাপক চিত্রায়ণ তিনি তো করছেন না? কাপড়-সমস্যা, ছাঁটাই-এর সমস্যা নিয়ে তিনি কয়েকটি গল্প লিখলেন বটে, কিন্তু শুধু সেইটুকুই কি আমরা আশা করেছিলাম মানিকের মত প্রতিভার কাছ থেকে?

এই উভয়বিধ চিন্তার মধ্যেই যে ত্রুটি তার কারণ পূর্বাপর মানিক-সাহিত্যের মধ্যে যে মূলগত ঐক্য বর্তমান সেটার স্বীকৃতির অভাব। তার ফলে উভয় পক্ষই মনে করছেন যে মানিকবাবুর মধ্যে হঠাৎ বুঝি একটা গুরুতর পরিবর্তন দেখা দিল। একপক্ষ ভাবলেন, মানিকবাবু গোল্লায় গেলেন, আর একপক্ষ ভাবলেন, পরিবর্তিত হয়েও যা আশা করা গিয়েছিল তা মানিকবাবু দিতে পারলেন না।

কিন্তু পূর্বাপর মূলগত ঐক্যই যদি ছিল তবে মানিকবাবুর ছাব্বিশ বছর বয়সে 'পুতুলনাচ' আমাদের কাছে অসাধারণ সাহিত্য-কীর্তি বলে মনে হয় কেন, এবং অনেক পরে চল্লিশোর্ধ্বে লেখা 'পাশাপাশি' বা 'পরাধীন প্রেম' বা 'সোনার চেয়ে দামী' তেমন মনে হয় না কেন?

প্রথমেই বলি, মানিকবাবুর প্রথম দিককার রচনার থেকেও এমন নজীর দেওয়া যায় যাতে প্রমাণ হয় যে তাঁর মধ্যে ইংরেজ-বিদ্বেষ বা স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা বা শ্রমিক-কৃষক এবং দরিদ্রের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি,—এ সব প্রচুর পরিমাণেই ছিল। কিন্তু শিল্পী সাহিত্যিকের কাছে প্রশ্নটা একটু ভিন্নভাবে আসে। রবীন্দ্রনাথ যে গান্ধীজীর অত নিরুত্তেজক আন্দোলনকেও সমর্থন করতে পারেন নি তার মানে এই নয় যে তিনি ইংরেজের পরাধীনতাকে পছন্দ করতেন বা স্বাধীনতাকে চাইতেন না; তার মানে এই ছিল যে নিছক ইংরেজ বিরোধিতার ভেতর দিয়ে উন্নততর সমাজ সৃষ্টি হবে কিনা সে-বিষয়ে তিনি সন্দিহান ছিলেন। মানিকবাবুর কাছেও প্রশ্ন এসেছিল কতকটা এইভাবে। যে রাজনৈতিক কর্মের ভিতর দিয়ে স্বাধীনতা অর্জনের প্রয়াস চলছিল সে কাজে

স্বাধীনতা এলে তা কি উন্নততর জীবনযাত্রা গড়ে তুলতে সাহায্য করবে ? কংগ্রেসী রাজনীতির উপর তাঁর (এবং কল্লোল-কালীনদেরও) আস্থা এত কম ছিল যে তা নিয়ে কোনোদিন কিছু লেখার প্রয়োজন বোধ করেন নি। সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি তাঁর খানিকটা শ্রদ্ধা ছিল তাদের নিরঙ্কুশ আন্তরিকতার জন্য। কিন্তু তাদের মানব প্রকৃতি বিরুদ্ধ কর্ম-পন্থার সমালোচনা তিনি 'জীয়ন্ত' উপন্যাসে উপস্থিত করেছেন। সাম্যবাদী আদর্শ গ্রহণ করবার প্রাক্কালেও তাঁর মনে এই সংশয় ছিল, শ্রমিক-রাজ প্রতিষ্ঠিত হলেই কি মানুষের সামাজিক এবং পারিবারিক সম্পর্কের উন্নতি হবে ? এই সময়ে তিনি একটি অপেক্ষাকৃত অপ্রধান বই 'প্রতিবিম্বে' বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মের সমালোচনা করেন। তিনি দেখান যে মেয়ে-পুরুষের অবাধ মেলামেশার ভিতর দিয়ে যৌনসমস্যাকে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টার থেকে আর এক ধরনের অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি হয়, যার ফলে আদর্শবাদী গ্রাম্য ধরণের তরুনের রাজনৈতিক কর্মের আকাঙ্ক্ষা প্রতিহত হয়।

কিন্তু সাম্যবাদ গ্রহণের সমস্যাটি আর একটি সমস্যার উপর নির্ভরশীল ছিল। সেটা হল মানুষের অন্তর্লোকের নিয়ামক শক্তি অর্থনৈতিক না যৌননৈতিক। তিনি ফ্রয়েডের যৌন-সর্বস্ববাদকে (pan sexuality) কোনোদিনই পুরোপুরি গ্রহণ করেন নি। কিন্তু 'পুতুলনাচ' ও 'সহরবাসে' তিনি এই নীতির খুব কাছাকাছি এসেছিলেন। 'প্রাগৈতিহাসিকে', এবং 'পদ্মানদীর মাঝি'তে তিনি অর্থনৈতিক সমস্যাকে যৌনসমস্যার মতোই গুরুত্ব দিয়েছিলেন। আবার 'শহরতলী'তে এসে তিনি স্পষ্টতই উপলব্ধি করলেন যে মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থান বিন্দু তার চরিত্রকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। মার্কসবাদ তাঁকে এই শিক্ষা দিল যে মানুষের যৌনবৃত্তির চেয়েও অর্থনৈতিক শক্তি অধিকতর মৌলিক শক্তি, এবং সমাজের বহির্লোকের মত মানুষের অন্তর্লোকেরও তা নিয়ামক শক্তি।

বেশ, কিন্তু সাম্যবাদী সমাজে যে প্রকৃতই মানুষের অন্তর্লোকের

নতুন রূপায়ন ঘটবে এবং মানুষের সামাজিক পারিবারিক সম্পর্কের উন্নতি সাধিত হবে বর্তমান সমাজের মধ্যে বসে কি করে তার প্রমাণ পাওয়া সম্ভব? ধরা যাক, একজন নায়ক বা নায়িকা যে সাম্যবাদের পূর্ববর্তী পর্যায় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। সে কি তার পারিপার্শ্বিক জীবন-যাত্রাকে কিছুটাও পরিবর্তিত করতে পারে? ঠিক এই প্রশ্ন নিয়েই 'পুতুলনাচে'র শশি এবং 'সহরবাসে'র মোহন অগ্রসর হয়েছিল। এবং তারা সিদ্ধান্তে এসেছিল যে পরিবর্তিতও করা যায় না। তার একটা কারণ এই ছিল যে গণতান্ত্রিক প্রচেষ্টা সামান্য যে অগ্রগতি সূচিত করে তাতে তখন লেখকের মন ভরে নি। কিন্তু এখন লেখক সামান্য অগ্রগতিকে অবহেলা করতে পারছেন না। তিনি জানেন সামান্য গুণগত পরিবর্তন ক্রমশ ব্যাপক পরিমাণগত পরিবর্তন সাধন করে এবং তা আবার উচ্চতর গুণগত পরিবর্তনের পথ তৈরি করে। বিপ্লব একদিনে ঘটে না, এমনি তিল তিল পরিবর্তনের প্রস্তুতিপর্ব একদিন দেশব্যাপী আমূল পরিবর্তনের ঝড় টেনে আনে।

কাজেই 'পুতুলনাচে'র শশি 'পাশাপাশি'র সুনীল হয়ে ফিরে এল এবং 'সহরবাসে'র স্বামী ত্যাগী সন্ধ্যা 'সোনার চেয়ে দামী'তে সাধনা হয়ে ফিরে এল। সুনীল তার পারিবারিক ভাই-বোনদের সম্পর্কগত জট ছাড়াতে চেষ্টিত হল, বান্ধবীর সঙ্গে তার ভুল বোঝাবুঝি দূর করতে চাইল, এবং সব ক্ষেত্রেই সে আংশিক সাফল্য লাভ করল। সে জানত বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামোতে সাফল্য আংশিকই হবে, তাতে অসহিষ্ণু বা নিরাশ হবার কোনো কারণ নেই। অর্থনৈতিক পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করার জন্য সে সমবায়ের ভিত্তিতে একটি কাগজ বের করল এবং তারই জন্য সে পূর্ব মালিক কন্যাকে বিয়ে করল, কিন্তু আগে সে তার বান্ধবীকে বিয়ে করবে বলে ঠিক করেছিল। এই ঘটনা প্রমাণ করে যৌন-কামনার প্রাধান্য যে লেখক এখন কত অনায়াসে অস্বীকার করেছেন।

'সোনার চেয়ে দামী'র নায়িকা সাধনা স্বল্প শিক্ষিতা এক বৌ।

গণতন্ত্রের দীক্ষা তার ছিল না, কিন্তু জীবনের ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধানে পারিপার্শ্বিক থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে করতে সে গণতান্ত্রিক হয়ে উঠল। স্বামীর সঙ্গে সে এই বোঝাপড়ায় এল যে, উভয়ে উভয়কে পুরোপুরি মানুষ বলে স্বীকার করে সুস্থ সম্পর্ক গড়ে তুলবে।

এইভাবে একদিক দিয়ে লেখক যেমন পজেটিভমূলক পরীক্ষা করছিলেন গণতান্ত্রিক চিন্তা সামাজিক পারিবারিক সম্পর্কের উন্নতি করে কিনা, আর একদিক দিয়ে তিনি নেগেটিভমূলক পরীক্ষা চালাচ্ছিলেন। তিনি দেখছিলেন মানুষের সম্পর্কের মধ্যে যে জট তার আসল কারণ অর্থনৈতিক অসাম্য।

'পরাধীন প্রেমে' তিনি দেখালেন, একে একে কয়েক জোড়া প্রেম সার্থক হতে পারল না অর্থনৈতিক কারণে। মানুষের মনোরাজ্যে অর্থনীতির প্রভাব যত গভীর।

'হলুদ নদী সবুজ বনে' তিনি বনের ধারের এক কারখানা কল্পনা করেছেন। সেখানে কারখানার ডাইরেক্টররা শ্রমিক দিয়ে বাঘ মেরে নিজে মেরেছে বলে প্রচার করতে অকাতরে অর্থ ব্যয় করে। লেখক দেখিয়েছেন যে ডাইরেক্টরদের জীবন পরস্পরের স্বার্থ-সংঘাতে এবং নিজেদের ক্ষমতা বজায় রাখার গরজে অত্যন্ত বিপর্যস্ত। তাদের পারিবারিক সম্পর্কের ত্রুটি-দুর্বলতার জন্যেও দায়ী এই অর্থনৈতিক কারণ। পক্ষান্তরে মজুরদের পারিবারিক সম্পর্কের তুলনায় অনেক সহজ এবং বলিষ্ঠ যদিও অর্থনৈতিক কারণেই তার মধ্যেও গলতির অভাব নেই। লেখক দেখিয়েছেন, অসাম্যমূলক সমাজে শোষকদেরই পারিবারিক-সম্পর্ক বেশি ক্ষুণ্ণ হয়।

'আরোগ্য' বইতে অর্থনৈতিক অসাম্য কি করে মোটর-ড্রাইভার কেশবের জীবনে অসুস্থ মানসিকতার সৃষ্টি করেছিল তার বিবরণ আছে। কেশব যার অধীনে কাজ করত তার বোনের প্রতি গোপন যৌন আকর্ষণ বোধ করত, তেমনি এক গরীবের ঘরের বিধবার প্রতিও তার ছিল কামনা। এই দুই বিরোধী কামনার টানা পড়েনে

বিপর্যস্ত হল তার মন এবং শরীর। এক মনঃসমীক্ষক তাকে পরামর্শ দিলেন ধনী তরুণীর প্রতি আকর্ষণকে বুদ্ধির দ্বারা ত্যাগ করতে। কিন্তু বুদ্ধির দ্বারা ব্যাপারটা বুঝেও তার অসুস্থতা না যাওয়াতে সে অসাম্যমূলক সমাজ ধ্বংসের সংগ্রামে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল।

'সোনার চেয়ে দামী' বা 'আরোগ্য'র মতো বই আর কোনো লেখক লিখলে আমরা তাঁকে নিয়ে নাচানাচি শুরু করতাম। কিন্তু মানিকবাবুর 'পদ্মানদী' বা 'পুতুলনাচ' আমরা পড়েছি বলে এ বইতে আমাদের মন ওঠে কি ?

তাহলে আমরা দেখলাম যে পূর্বাপর মানিকবাবুর বিষয়বস্তু একটিই,—মানুষের পারিবারিক সম্পর্কের প্রকৃতি নির্ধারণ। পারিবারিক সম্পর্কের উন্নতি অবনতির মাপকাঠিতেই তিনি সভ্যতার গুণাগুণ বিচার করেন। এই বিচারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি এক সময়ে নৈরাশ্যবাদীর মত আধুনিক সভ্যতাকে বিকৃত করেছিলেন। আবার সেই বিচারের ভিতর দিয়েই তিনি দেখতে পেলেন শোষণমুক্ত সমাজে যে মানব-সম্পর্কের উন্নতি হবে তার লক্ষণ বর্তমান সমাজে উপস্থিত।

* তাঁর শেষ জীবনের বইগুলোর সব ক'খানাই জীবনের খণ্ড চিত্র; 'পুতুলনাচ' বা 'পদ্মানদী'র মত এ-কাহিনীগুলো ব্যাপক জীবনসত্যের প্রতিনিধিত্ব করে না। তার কারণ তাঁর যে শেষোক্ত উপলব্ধি, তাকে তিনি জীবনের বিচ্ছিন্ন ক্ষেত্রে আয়ত্ত করেছিলেন। সমগ্র জীবনের ক্ষেত্রে আয়ত্ত করার আগেই তাঁকে বিদায় নিতে হল।

এ-বইগুলো স্পষ্টতই পরীক্ষামূলক। লেখক তাড়াহুড়ো করে তাঁর নতুন নতুন আবিষ্কারগুলোকে লিপিবদ্ধ করে যাচ্ছিলেন মাত্র। এই-গুলোতে সেই জন্যই বিস্তারের কত অভাব। আর সেইজন্য কোনো কোনো বই পাঠকের কাছে একটু নীরস মনে হয়। তিনি যদি তাঁর এই বিচ্ছিন্ন উপলব্ধিগুলোকে গ্রথিত করে সমগ্র সমাজের সমাজতন্ত্রের পথে উত্তরণের কাহিনী লিপিবদ্ধ করে যাওয়ার সময় পেতেন তবে তা পৃথিবীর একখানা উল্লেখযোগ্য বই হত।

এই আলোচনা আর বাড়িয়ে লাভ নেই। মানিক-সাহিত্য এত জটিল এবং চিত্তাকর্ষক এবং বাংলা-সাহিত্যে বাস্তববাদের ভিত্তিরচনায় মানিক-প্রসঙ্গ এত গুরুত্বপূর্ণ যে আলোচনা শুরু করলে এর শেষ পাওয়া কঠিন। জানি না, এ প্রবন্ধে সম্পূর্ণতা থাকল কিনা। তবে একটা কৈফিয়ৎ হিসাবে বলে রাখি মানিকবাবুর উপন্যাসের ধারাবাহিক আলোচনার কোনো চেষ্টা আমি করিনি। বরং তার কতকগুলো প্রাথমিক কাজ সেরে রাখাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমত কতক-গুলো প্রচলিত ভুল ধারণার নিরসন করা। দ্বিতীয়ত সেই প্রসঙ্গে মানিক-সাহিত্যের মূল বিষয়বস্তুর অনুসন্ধান এবং তার মধ্যে পূর্বাপর ঐক্য আবিষ্কার। এককথায় মানিকবাবুর বাস্তববাদের স্বরূপ নির্ণয় করা।

পরিচয় ॥ পৌষ, ১৩৬৩ ॥

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিতার দ্বারা উপন্যাসের আক্রমণ আধুনিক পশ্চিমী সাহিত্যের একটি বিশেষ লক্ষণ ;—শুধু আক্রমণ নয়, রীতিমতো জয়, রাজত্ববিস্তার ; গত একশো বছরের কথাসাহিত্যের দিকে তাকালে তার মধ্যে স্পষ্ট দুটো বিভাগ চোখে পড়বে : একদিকে সরল বাস্তবপন্থা, লোকে যাকে জীবন বলে তার নিষ্ঠাবান আলেখ্য, অন্যদিকে নির্বাচন, অতিরঞ্জন, উদ্দেশ্যময় বিকৃতি—এক কথায়, কাব্যধর্ম। কবিতা, ছন্দ-মিলের শুদ্ধ রূপায়ণে বিপন্ন বোধ ক'রে, কেমন ক'রে বহুব্যাপ্ত গদ্য সাহিত্যের বড়ো একটা অংশকে অধিকার ক'রে নিলে, তার ইতিহাস রোমান্টিসিজম-এর পরিণতির সঙ্গে সমান্তর। বলতে লোভ হয়, ফরাশি প্রতীকীবাদের প্রভাব পরবর্তী কথাসাহিত্যেও সংক্রমিত হয়েছে—নয়তো মান্ কেমন ক'রে 'ভেনিসে মৃত্যু' লিখতে পেরেছিলেন বা জয়স তাঁর শিল্পী-যুবকের প্রতিকৃতি ?—কিন্তু এও স্মর্তব্য যে ডস্টয়েভস্কি, যিনি কবি-ঔপন্যাসিকের গুরুস্থানীয়, তিনি শার্ল বোদলেয়ার-এরই সমকালীন হ'য়েও কখনো 'ল্য ফ্ল্যর দ্যু মাল' পড়েছিলেন ব'লে জানা যায় না। অবশ্য এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য ঐতিহাসিক তদন্ত নয়, তবে অনায়াস দৃষ্টিতেই এটুকু ধরা পড়ে যে সাহিত্যের চিরকালীন বাস্তববাদ যে-সময়ে জোলা-র হাতে উগ্র প্রকৃতিবাদে পরিণত হ'লো, সেই একই সময়ে য়োরোপীয় উপন্যাসে একটি বিপরীত ধারা বলীয়ান হ'য়ে উঠছে, যে-ধারা, তথাকথিত বাস্তবকে অস্বীকার ক'রে, বাস্তবের অন্তরালবর্তী স্বপ্ন বা সত্যের সন্ধানী।

কিন্তু এর সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের পরিণতির ধারা মেলে না

য়োরোপীয় কবিতায় ও উপন্যাসে যে-বিনিময়জনিত ভ্রাতৃত্ববন্ধন গ'ড়ে উঠেছে, বাংলায় তার লক্ষণ এখনো ক্ষীণ। বাংলা কবিতার কোনো-একটি অংশকে ঐতিহাসিক অর্থে আধুনিক বলা যায়, কিন্তু বাংলা কথাসাহিত্যের বৃহত্তম অংশ আজ পর্যন্ত উনিশ-শতকী বাস্তববাদে আবদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ, অদম্য কবি হ'য়েও, তাঁর কথা-সাহিত্যে বঙ্কিমের অনুগামী হয়েছেন, এবং যেখানে তা হন নি অর্থাৎ যেখানে তাঁর মৌলিক কবিতাকে উপন্যাসের মধ্যে মুক্তি দিতে গিয়েছেন, সেখানে তাঁর উপন্যাসের—হয়তো কবিতারও—ক্ষতি হয়েছে। শরৎচন্দ্র চাঁদের দিকে তাকিয়ে কখনো কোনো 'মুখ-টুখ' দেখতে পান নি ব'লে গর্ব করেছেন, কবিদের উদ্দেশে তাঁর এই উপহাস নিজের মর্যাদার পক্ষে হানিকর মনে হয়নি তাঁর, কোনো বাঙালি পাঠকেরও রুচিহীন মনে হয়নি। যুক্তিবাদী প্রমথ চৌধুরী প্রথম থেকেই নিজেকে কমনসেন্স, সাধারণবুদ্ধি বা 'সুবুদ্ধি'র প্রবক্তারূপে ঘোষণা করেছিলেন, 'চার ইয়ারী কথা'র রূপসী উন্মাদিনী কোনো মায়াপুরীর আভাস এনে দিলো না—নেহাৎই ডাক্তারি অর্থে পাগল হয়ে কল্পনার ডানা কেটে দিলে। এবং, সব ফেনিলতা সত্ত্বেও, 'কল্লোল' পত্রিকার মূল মন্ত্র ছিলো 'রিয়্যালিজম', তার তরুণ গোষ্ঠী রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রে আপত্তি করেছিলো—তাঁরা বাস্তববাদী ব'লে নন, যথেষ্ট বাস্তববাদী নন ব'লে। তত্রাচ, সেই উত্তেজনার অধ্যায়েও 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর প্রত্যেক রচনাই বাস্তব শিল্পের অবিকল উদাহরণ হয়নি—কেননা কোনো লেখক বা গোষ্ঠীর ঘোষিত উদ্দেশ্যের সঙ্গে তাঁদের ব্যবহার কখনোই সম্পূর্ণ মেলে না—আর মেলে না ব'লেই বাঁচোয়া—এবং রবীন্দ্রনাথ নিজেও যেমন শেষ বয়সে বুঝেছিলেন তাঁর 'গল্পগুচ্ছ' বাস্তবতার গুণেই আদরণীয়, তেমনি, ততদিনে, নব্য লেখকরাও কেউ-কেউ মেনেছিলেন যে নিছক বাস্তববাদে, শেষ পর্যন্ত, তৃপ্তি নেই।

বাংলা সাহিত্যের এই সন্ধিক্ষণে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবেশ। দৈবাৎ, এবং অল্পের জন্য, 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর লেখক তিনি হন নি, কিন্তু

তাঁর স্বাভাবিক স্থান সেখানেই চিহ্নিত ছিলো; প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ ও 'যুবনাশ্বে'র সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা সুস্পষ্ট। প্রভেদ এই, তাঁর রচনায় কোনো সচেতন বিদ্রোহ ছিলো না, কেননা যার জন্য 'কল্লোলে'র বিদ্রোহ, সে-জমি ততদিনে জেতা হয়ে গেছে, এবং, একই কারণে মণীন্দ্রলাল-গোকুলচন্দ্রের স্কুলেও তাঁকে কখনো হাত পাকাতে হয় নি। তিরিশের যুগে যাঁরা তাঁর প্রথম রচনাবলী পড়েছেন তাঁদের বুঝতে দেরি হয় নি যে সদ্যমৃত 'কল্লোলে'র সর্বশেষ, বিলম্বিত ও পরিপক্ব ফলের নামই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বভাবতই, তাঁর বিষয়ে প্রথম গুণগ্রাহী আলোচনা করেন 'কল্লোলে'রই প্রাক্তন লেখকরা, কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের 'পরিচয়'-গোষ্ঠী—যার আদর্শের উচ্চতা সে সময়ে কুখ্যাত ছিলো আর যার সঙ্গে 'কল্লোলে'র কোনো মিল ছিলো না, তারও তরফ থেকে ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে বেশি দেরি করেন নি। মতভেদ ছিলো না সে-সময়ে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাভাবিক শক্তিতে অসামান্য।

বর্তমান নিবন্ধকার একবার বলেছিলেন যে বাংলা কথাসাহিত্যে দুটো ধারা লক্ষ্য করা যায়; একটা বঙ্কিম-শরৎচন্দ্র, অন্যটা রবীন্দ্রনাথ-প্রমথ চৌধুরী থেকে উৎসারিত। এই কথাটাকে এখন মনে হচ্ছে শোধনসাপেক্ষ; সত্যের নিকটতর হয় এ-কথা বললে যে বঙ্কিম, পূর্ব-রবীন্দ্র ও শরৎচন্দ্র একই মূল ধারার অন্তর্গত, এবং উত্তর-রবীন্দ্র ও প্রমথ চৌধুরী বাংলা গদ্য ভাষাকে যতটা বদলেছেন, বাংলা কথা-সাহিত্যের ধারণা বিষয়ে ততটা পরিবর্তন আনতে পারেন নি। আনতে পারেন নি—এই ব্যর্থতার আংশিক দায়িত্ব পরবর্তী লেখকদেরও নিতে হবে, অন্তত রবীন্দ্রনাথ যে কোথাও কোনো পরিণতির ইঙ্গিত দেন নি তাও নয়। কিন্তু আজকের দিনে যখন বলি যে অন্নদাশঙ্কর রায় শরৎচন্দ্রের বিপরীত লেখক, তার অর্থ এই যে অন্নদাশঙ্কর সম্পূর্ণ আলাদা জাতের গদ্য লেখেন, সামাজিক বিষয়ে তাঁর মতামতও ভিন্ন, কিন্তু উপন্যাস বস্তুটি কী—সে-বিষয়ে এই অসবর্ণ

লেখকদ্বয়ের মূল ধারণায় বিশেষ প্রভেদ বোঝা যায় না। বাংলা কথা-সাহিত্যের বৃহত্তম ধারাটি আজ পর্যন্ত বাস্তববাদের পরিপোষক; ব্যতিক্রম একেবারে নেই তা নয়, কিন্তু উষ্ণ ও ঘনিষ্ঠ বাস্তবতাই বৃহত্তম ধারাটির মহত্তম উপজীব্য। উপন্যাস বলতে বাঙালি পাঠক বোঝে—তথ্যের সজীব ও হৃদয়গ্রাহী প্রতিচিত্রণ, যে-সব তথ্য স্বভাবী মানুষের সম্ভাব্য অভিজ্ঞতার অন্তর্ভূত: এবং অধিকাংশ বাঙালি লেখকও তা-ই বোঝেন।

বলা যেতে পারে, এই স্থল থেকে সব ঔপন্যাসিকই যাত্রা ক'রে থাকেন। অর্থাৎ স্বভাবী বা স্বাভাবিকের বর্ণনায় যাঁর কিছুমাত্র দক্ষতা নেই, তিনি কখনো ঔপন্যাসিক হবেন না, যদিও কবি হ'তে পারেন। কিন্তু অনেক পশ্চিমী লেখক বাস্তব থেকে যাত্রা করে বাস্তবের পরপারে পৌঁছন: উত্তীর্ণ হন, সারি সারি আপাতবাস্তব চিত্রকল্পের সাযুজ্যে, প্রতীকের, এমনকি পুরাণের মায়ালোকে। বাস্তব চিহ্নসমূহ 'জীবন্ত' হয় না তা নয়—তা না-হ'লে তাঁদের প্রয়াস নীরক্ত রূপকমাত্রে পরিণত হ'তো—কিন্তু তাঁদের কাছে বাস্তব একটা ছল বা উপায় বা অভিনয় মাত্র, যার ব্যবহারে, সত্যিকার কবির মতো, মানব-মনের গোপন, সনাতন, নামহীন সম্পদকে তাঁরা ছেঁকে তোলেন। লক্ষ্যণীয়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলী এর উল্টো প্রক্রিয়ার সাক্ষ্য দিচ্ছে: তাঁর পূর্ব-রচনা কবিতার গুণে সমৃদ্ধ, কিন্তু সেখান থেকে প্রথম বাস্তববাদে, তারপর প্রকৃতিবাদে তাঁর স্থায়ী প্রতিষ্ঠা। তাঁর প্রথম উপন্যাসের শিরোনামাতেই কবিতা আছে; 'দিবারাত্রির কাব্য' শুধু নামত কাব্য নয়, সারত তাকে একটি দীর্ঘ গদ্যকবিতা বললে অত্যুক্তি হয় না। এটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সবচেয়ে কম 'পাকা লেখা', সবচেয়ে কম স্পষ্ট, কিন্তু, সেইজন্যেই তাতে বার-বার দিগন্ত দেখা যায়, যেন আশ্চর্যের আভাস দেয় থেকে-থেকে। 'পদ্মানদীর মাঝি'তে, এমনকি 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য়—তাদের নিখুঁত বাস্তবসদৃশতা সত্ত্বেও—এই অলৌকিকের উদ্ভাস আমরা অনুভব করতে পারি; বর্ণিত মানুষেরা যেন অন্য কিছুর

প্রতিনিধি, এই অনুভবের ফলে তারা নতুন একটি আয়তন পায়—যেটা তথ্যগত নয় ভাবগত। পরবর্তী এবং এক দিক থেকে আরো পরাক্রান্ত রচনায়, এই ভাবায়তনের বদলে দেখা দিলো কঠোরতর বস্তুনিষ্ঠা, এবং এক মর্মভেদী তীক্ষ্ণতা, যা পাঠকের কোনো দুর্বলতাকেই দয়া করে না, সমাজের নিম্নতম পাঁক থেকে বাস্তবের ছবি উদ্ধার ক'রে আনে। আস্তে আস্তে এক দিগন্তহীন চতুষ্কোণ প্রদেশ তিনি দখল করে নিলেন: মানুষের নিশ্বাসে ঘন ও তপ্ত সেই দেশ, উদ্ভাবনে উর্বর, জীবনসংগ্রামে আরক্তিম—যেখানে চোর, ভিখিরি, কুষ্ঠরোগী, কেরানি এবং কেরানির বৌ জীবন ও প্রজননের মূলসূত্রে অবিরাম ঘূর্ণিত হচ্ছে। এই প্রদেশের বাস্তবতা অনস্বীকার্য, এবং বাস্তবতাই এর প্রধান গুণ। অর্থাৎ এর মধ্যে অস্বভাবী মানুষ বা ঘটনার অভাব নেই, হত্যা, আত্মহত্যা, স্নায়বিক বিকার, মানসিক ব্যাধি, লোভ এবং ক্ষুধাজনিত মত্ততা—এই সব ঘুরে ফিরে দেখা দেয়, এমনকি অপ্রাকৃতও যে কখনো স্থান পায় না তা নয়, কিন্তু এই উপাদানসমূহ কোনো অন্তরালবর্তী অর্থের দ্বারা রঞ্জিত হয় না, আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পটভূমিকাতেই যথাযোগ্য বিন্যাস পায়। একটি গল্প মনে পড়ছে যার নাম 'বিবেক'; তাতে এক দারিদ্র্যক্লিষ্ট পুরুষ মুমূর্ষু স্ত্রীকে বাঁচাবার চেষ্টায় প্রথমে এক ধনী বন্ধুর ঘড়ি, পরে তার নিজেরই মতো এক দরিদ্রের টাকা চুরি করলে, তারপর, তার স্ত্রীর বাঁচার আশা নেই, বড়ো ডাক্তারের এই রায় শুনে সন্তপ্ত চিত্তে ধনীর ঘড়ি ফিরিয়ে দিলে কিন্তু গরিব বন্ধুর প্রাপ্য বিষয়ে নীরব ও নিষ্ক্রিয় রইলো। মানুষের বিবেক সুদ্ধ ধনীর পক্ষপাতী, এই ব্যঙ্গই এখানে অভিপ্রেত, এবং অনুরূপ আরো অনেক উদাহরণ অনেক পাঠকই মনে আনতে পারবেন। বোঝা যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সামাজিক চেতনাকে মানবিক মূল্যবোধের দ্বারা আক্রান্ত হ'তে দেন নি, তাঁর জগতে এমন কোনো স্তর নেই যেখানে 'ধনী-নির্ধন', 'উচ্চ-নীচ', 'সুস্থ-রুগ্ন' প্রভৃতি সমাজস্বীকৃত বিপরীতগুলো কোনো ভাবগত আদর্শের চাপে ভেঙে পড়ে। সেইজন্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অস্বভাবীরাও

ছায়ামূর্তির মতো হানা দেয় না, রক্তেমাংসে সীমিত হ'য়ে থাকে, তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনায় ঘটনাবিন্যাসও সর্বদাই যথাযথ মনে হয়। মধ্য-বিশ-শতকের বাংলাদেশের সামাজিক বিশৃঙ্খলার ঘনিষ্ঠ রূপকার তিনি; যে সময়ে তথাকথিত ভদ্রলোক শ্রেণীর একটা অংশ নিচে নেমে এলো, এবং তথাকথিত দীন শ্রেণীর একটা অংশ প্রবল হ'য়ে উঠলো, সেই অধ্যায়ের বিবিধ লক্ষণ ভাবীকালের জন্য মূর্ত হ'য়ে রইলো তাঁর রচনায়। বাংলা কথাসাহিত্যে বস্তুনিষ্ঠায় তিনি অদ্বিতীয়; বঙ্কিমের মতো, অথবা কোনো উত্তরপুরুষের লেখকের মতো, তাঁকে কখনো স্থানে অথবা কালে দূরে স'রে যেতে হয় নি; উপন্যাসের আসর সাজাতে হয় নি অতীতের কোনো নিরাপদ অধ্যায়ে, অথবা কৌতূহলোদ্দীপক বৈদেশিক পরিবেশে; বর্তমান, প্রত্যক্ষ ও সমসাময়িকের মধ্যেই তিনি আজীবন শিল্পের উপাদান খুঁজেছেন এবং তার যে অংশটিকে শিল্পরূপ দিয়ে গেছেন তা স্বাক্ষর ও বিত্তহীন সর্বসাধারণের সর্বাধিক পরিচিত। এইখানেই তাঁর বৈশিষ্ট্য ও সার্থকতা।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি ॥ [রচনাকাল—১৯৫৭]

বিমল কর

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গদ্যরীতি

প্রথমেই বলে নেওয়া ভাল, এই রচনাটি পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ নয়, প্রবন্ধ সম্পর্কীয় একটি প্রস্তাব।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গদ্য রচনার সঙ্গে যাঁদের পরিচয় গভীর, জানি না এ-কথা তাঁদের কখনো মনে হয়েছে কিনা যে মানিকবাবুর ভাষার একটা মৌলিকতা রয়েছে এবং তাঁর শিল্পকর্মের বিচারে এর উল্লেখ আবশ্যক।

সাধারণত সমালোচক, এমন কি মানিকবাবুর বিশেষ অনুরাগীদের মধ্যেও, শৈল-রীতি প্রসঙ্গে মানিকবাবুর নৈপুণ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয়ে থাকে। এ বিষয়ে এঁদের খুঁত-খুঁত ভাবটা স্পষ্ট। অমার্জিত ভাষা, বাক্য গঠনে শিথিল শব্দ যোজনা, কিছু চলতি মজুত শব্দের একঘেয়েমি ব্যবহার, ভাষার রস-দোষ ইত্যাদির উল্লেখ হতে আমি শুনেছি। সমালোচক এবং রসিক পাঠকদের এই অভিযোগের যথার্থতা সম্পর্কে বিচার চলতে পারে বলে আমার মনে হয়েছে।

ব্যক্তিগতভাবে মানিকবাবুর শৈলরীতি এবং গদ্যের গঠন ও শব্দ ব্যবহারকে আমি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করি। এখানে তার সবিস্তার আলোচনার অবকাশ নেই, দ্বিতীয়ত আমি সমালোচক নই, যোগ্যজনের শুধু মাত্র দৃষ্টি আকর্ষণ করাই আমার উদ্দেশ্য; আর সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ।

আজ থেকে বছর পঁচিশ-ত্রিশ আগে মানিকবাবু বাংলা সাহিত্যের আসরে আসেন। আসর তখন বেশ সরগরম। 'কল্লোল', 'কালিকলমে'র যুগই বলা যায়। এই দুই পত্রিকার প্রতিভাবান লেখকরা তখন

সাহিত্যের কনটেণ্ট নিয়েই শুধু নয়, ভাষা নিয়েও প্রচুর পরিশ্রম করছেন। 'সবুজপত্র' চলতিভাষাকে সাহিত্যের দরবারে ঠাঁই দিতে চেয়েছে আগেই, কাজেই তার প্রভাব তো ছিলই কিছুটা, নতুন করে যোগ হল রবীন্দ্রনাথের ভাষার প্রভাব কাটিয়ে বাইরে আসবার চেষ্টা। বাংলা গদ্যরীতির নতুন একটা রূপ দেবার চেষ্টা এ-সময় খুবই স্পষ্ট। প্রেমেন্দ্র, অচিন্ত্য এবং বুদ্ধদেবকে এ-বিষয়ে অগ্রণী বলতে হয়। গল্প-উপন্যাসের (কবিতার কথা এখানে আলোচ্য নয়) গদ্য সম্পর্কে এঁরা ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। বাংলা বাক্য-বিন্যাসের পদ্ধতিকে এঁরা পাল্টাবার চেষ্টা করেছেন, নতুনভাবে সাজাবার চেষ্টা করেছেন বাক্যাংশ, জটিলতম পদ রচনা করেছেন কখনো, কখনো অতি হ্রস্ব, সংক্ষিপ্ত তীর্যক অর্থপূর্ণ পদ, বহু অপ্রচলিত শব্দ সাহস করে চালাবার চেষ্টা করেছেন, সংস্কৃত ভাষা থেকে দুরূহ শব্দ নিয়েছেন, তাকে বাংলায় ভেঙেছেন, উপমা উপমেয়, সমাসোক্তি ইত্যাদি ভাষার অলংকারের ব্যবহারেও নতুনত্ব দেখিয়েছেন। মোটামুটি এই। বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করলে আরও অনেক কিছু দেখানো যায়। সরল-ভাবে বললে এ-কথা না বলে উপায় নেই যে, এইসব লেখকরা ভাষার ব্যাপারে অজ্ঞ, অন্ধ ও অলস ছিলেন না। যে-কোনো পাঠক অচিন্ত্য-কুমার বা বুদ্ধদেবের সে-কালের লেখা পড়লে এ-সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন। প্রেমেন্দ্রের ভাষার মধ্য থেকে অবশ্য এই লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যটি আবিষ্কার করা একটু কঠিন। কঠিন এই জন্যে যে, নতুনত্বের চেষ্টায় অপর দুই লেখক যত বেশি সচেষ্ট ও সরব তৃতীয় লেখকটি ততটা নন। তাঁর পরিশ্রম এবং সাফল্য আড়াল দিয়ে রয়েছে—কেননা তিনি মাত্রা রক্ষা করেছেন। আতিশয্য সহজে চোখে পড়ে, মাত্রা রক্ষা সহজে চোখে ধরার নয়।

ভালো-মন্দের কথা নয়, কথা এই যে, তখনকার দিনে ভাষার ব্যাপারে কয়েকজন প্রতিভাবান লেখকের যে আন্দোলন তা-থেকে সমসাময়িক নবীন সাহিত্যিকরা কেউই মুক্ত হতে পারেন নি এবং

এ-বিষয়ে অগ্রণীদের প্রভাব থেকে এড়িয়ে যেতেও সক্ষম হন নি। ব্যতিক্রম শুধু দু'জন—তারাশঙ্কর এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

তারাশঙ্করের গল্পরচনা যেহেতু আমার এই প্রবন্ধ সম্পর্কীয় প্রস্তাবটির বিষয় নয় সেহেতু প্রসঙ্গটি বাতিল করছি। মানিকবাবুর সম্পর্কে আমার মনে হয়েছে, সমসাময়িক এই প্রভাব থেকে তিনি কি করে বিচ্যুত ছিলেন?

আমার ধারণা, সমসাময়িক যে-কোনো উল্লেখযোগ্য সাহিত্য-আন্দোলন থেকে একজন বিচ্ছিন্ন থাকতে পারেন প্রধানত দু'টি অবস্থায়। এক, যদি তিনি অজ্ঞ, অন্ধ হন; আর দ্বিতীয়ত, যদি এই সাহিত্য-আন্দোলনের আদর্শের ঘোরতর বিরোধী হন। মানিকবাবু 'কল্লোল', 'কালিকলম' প্রবর্তিত ভাষা আন্দোলনের বিষয় অজ্ঞ বা অন্ধ ছিলেন না বলেই আমার ধারণা। তাঁর মতন সচেতন, শিল্প-আঙ্গিকের কুশলী লেখকের পক্ষে সেটা সম্ভবও নয়। ভাষার নতুন রূপ-সম্ভাবনার ক্ষেত্রে তিনি বিরোধিতা করবেন এ-যুক্তিও গ্রাহ্য নয়। কেন না ক্রমশই ইনি নিজের যে মৌলিক লিখনরীতিটি গড়ে তোলেন তার সঙ্গে সমসাময়িকদের রীতির প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাকলেও, আদর্শগত একটা সম্পর্ক ছিল। অর্থাৎ সমসাময়িকদের প্রভাব ভাষার শোভনতার ক্ষেত্রে নয়, ভঙ্গির ক্ষেত্রে। "দেখিতে দেখিতে সে (কুবের) হাই তোলে. বড়লোকের পোষা কুকুরের মতই চাটাইয়ে একটা গড়ান দিয়া উঠিয়া বসে···" [পদ্মানদীর মাঝি]। শরৎচন্দ্র পর্যন্ত বাংলা গদ্যে শব্দ ব্যবহার ও ভাষা সজ্জায় যে শুচিতা-জ্ঞানের চল ছিল তাতে মানুষের সঙ্গে কুকুরের উপমাটি ক্ষুধার লোলুপতা, ভীরুতা, বিরক্তি, বড়োজোর ভয়াবহ কিছু বোঝাবার বেলায় ব্যবহার করা হতো। পাঠক লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন, আলোচ্য উপমাটি অন্য ধরনের। এর একটা মৌলিকত্ব আছে, আর সেটা তার অত্যন্ত প্রাকৃত, রূঢ়, ঈষৎ শ্লেষাত্মক অথচ প্রচ্ছন্ন বেদনাত্মক ভঙ্গির মধ্যে। বলা বাহুল্য এই ভঙ্গিটি 'কল্লোল', 'কালি-কলমে'র লেখকদের।

প্রসঙ্গত আর একটা কথা এখানে বলতে হয়। কল্লোল বা কালি-কলমের প্রতিভাবান লেখকরা ভাষার চর্চায় হু'টি স্বতন্ত্র পথের পথিক ছিলেন। একদল ছিলেন আবেগ-ঘেঁষা ভাষা ব্যবহারের পক্ষপাতী, অন্য দল গদ্য রচনায় যথাসম্ভব এই পিছল পথটি এড়িয়ে চলতেন। এঁদের রচনায় থাকত সংযম, সুনির্বাচিত শব্দ ব্যবহার, যথাসম্ভব বাস্তবতার স্বাদ সৃষ্টি করার চেষ্টা। প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প-উপন্যাসের গদ্যকে তার দৃষ্টান্ত হিসাবে ধরা যেতে পারে। (যদিও এঁর বহু গল্পে একটা কাব্যিক পরিমণ্ডল রয়েছে। কিন্তু এরকম গল্প খুব বেশি নেই। থাকলেও সেগুলি 'সাগরসঙ্গমের' মতন মহৎ গল্প নয়।) শৈলজানন্দের রচনাও অন্যতম উদাহরণ।

মানিকবাবুর গদ্যের আদর্শ সেদিক থেকে প্রেমেন্দ্র বা শৈলজানন্দের আদর্শের যতটা কাছাকাছি ততটা আর কারও নয়।

মানিকবাবুর গদ্যের মুখ্য বৈশিষ্ট্য, সরলতা এবং সংযম। আবেগ-ঘেঁষা ভাষাকে অত্যন্ত নির্দয়ের মতন তিনি বাদ দিয়ে গেছেন। অথচ কাব্য করার সুযোগ বা সাধ্য যে তাঁর না ছিল এমন নয়। 'পদ্মানদীর মাঝি', 'পুতুল নাচের ইতিকথা'—এই সব গ্রন্থে এমন বহু বর্ণনাময় অংশ আছে যেখানে তথাকথিত কাব্য করার সুযোগ কিছু কম ছিল না। যদি সাধ্যের কথা তোলা হয় তবে বলব, সে-ক্ষমতা মানিকবাবুর একেবারেই অনায়ত্ত ছিল না। "জীবন অতিবাহিত হয়। ঋতুচক্রে সময় পাক খায়, পদ্মার ভাঙন-ধরা তীরে মাটি ধ্বসিতে থাকে, পদ্মার বুকে জল ভেদ করিয়া জাগিয়া ওঠে চর, অর্ধশতাব্দীর বিস্তীর্ণ চর পদ্মার জলে আবার বিলীন হইয়া যায়। জেলে পাড়ার ঘরে ঘরে শিশুর ক্রন্দন কোনোদিন বন্ধ হয় না। ক্ষুধাতৃষ্ণার দেবতা, হাসি-কান্নার দেবতা, ইহাদের পূজা কোনোদিন সাঙ্গ হয় না।...জন্মের অভ্যর্থনা এখানে গম্ভীর, নিরুৎসব, অবিষণ্ণ। জীবনের স্বাদ এখানে শুধু ক্ষুধা ও পিপাসায়, কাম ও মমতায়, স্বার্থ ও সঙ্কীর্ণতায়" [পদ্মানদীর মাঝি]। এই অংশটির মধ্যে কাব্যের অবকাশ রয়েছে, আবেগকে চালনা করার ক্ষমতাও যে

লেখকের আয়ত্তে তার প্রমাণ এই অংশটির বাক্যবিন্যাসের রীতি, শব্দ ব্যবহার। তথাপি এই অংশ কাব্য নয়, অমার্জিত গদ্যও নয়। সরল, অকৃত্রিম, অনাবেগ বাকভঙ্গি।

মানিকবাবুর গদ্যের ধরনটা খুব সম্ভব এই আদর্শ এবং রীতির ছাঁচ ধরে চলেছে। প্রথম দিকের লেখায় যাও বা মাঝে মাঝে আবেগ-ছোঁওয়া ভাষার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, পরবর্তীকালের লেখায় ক্রমশই তা কাটছাঁট দিতে দিতে তিনি এমন একটি গদ্যরীতি সৃষ্টি করে নেন--যার গায়ে না অলংকারের ছিঁটেফোঁটা, না একটু কাজল কুঙ্কুমের শোভা।

মনে করলে অবাক হতে হয়, আজ থেকে বিশ বছর আগে যখন বাংলা গদ্যরীতির প্রসাধনে একটি নতুন রূপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তখন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় খুব সম্ভব একমাত্র লেখক যিনি মেয়ের রূপ-বর্ণনায় লিখছেন, "সাধারণ বাঙালী ঘরের গোটাকয়েক পরম স্বাস্থ্যবতী যুবতীকে অনায়াসে গড়া চলিত এতখানি মাল-মশলা দিয়া ভগবান তাকে সৃষ্টি করিয়াছেন" [সহরতলী, ১ম], আর ছেলের বর্ণনায়, মুখে "মেয়েদের মত তেলতেলা ধরনের কোমলতা" [সহরতলী, ১ম]। শুধু নারী-পুরুষের চেহারা বর্ণনায় নয়, তাদের মানসিক অনুভূতি বর্ণনাতেও এই অতি সরল, বিস্ময়কর শব্দ ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়: "ধনঞ্জয় আসিয়া সে দরদ গাফ করিয়া লইল,* মেয়েটার মুখের চাহনি লঙ্কাবাটার মত সারাক্ষণ মুখে লাগিয়া থাকিবে।" স্থানাভাবে এ ধরনের উদাহরণ যথেষ্ট দেওয়া গেল না। কিন্তু যত্নশীল পাঠক মানিকবাবুর কিছু পুরনো এবং হালের গ্রন্থ পড়লেই বুঝতে পারবেন ভাষার ব্যবহারে এই লেখকটি একটি মৌলিকতা সৃষ্টি করেছিলেন। বলা বাহুল্য

*প্রসঙ্গটা এই রকম যে, একজন অশিক্ষিত বাঙালী পুরুষ ভাবছে অন্য এক পুরুষ এসে একটি মেয়ের প্রেম আত্মসাৎ করেছে তাকে বঞ্চিত করে। বলা বাহুল্য এখানে 'দরদ' 'গাফ' এই শব্দ দু'টি যতটা যথাযথ ততটাই মৌলিক এবং কাহিনীর চরিত্রের মন-চিত্রের সার্থক চিত্রণ।

সে মৌলিকতা শব্দ গঠন বা ব্যবহারের নমনীয়তায় নয়, ধ্বনি-বহুল সংস্কৃত-ভাঙা বাংলা শব্দ সৃষ্টিতেও নয় ; এই মৌলিকতা অন্য শ্রেণীর। বিষয় ও বস্তু উপযোগী ভাষা ব্যবহার। এর ফলে হয়তো তাঁর গদ্য-রীতি আপাতদৃষ্টিতে নীরস, শুষ্ক, অমার্জিত, শিথিল মনে হতে পারে, কিন্তু মানিকবাবুর রচনার বিষয় বিচারে এবং তাঁর শিল্প-সাফল্যের ঔচিত্য বিচারে, আমার ধারণা, তাঁর গদ্যরীতি ত্রুটিহীন। একথা বহুবার আমার মনে হয়েছে, লেখক যদি রিয়ালিটির সাধক হন, তাঁর ভাষাকেও সেই আইন মেনে চলতে হবে। অন্যথায় সাধারণত বেশির ভাগ তথাকথিত বাস্তবপন্থী লেখকদের যা হয়—বিষয় থাকে বস্তির, ভাষাটা হয় কফি হাউসের। যার ফলে সমগ্রভাবে লেখাটি পড়লে একটি আর্টিফিসিয়াল রিয়্যালিটির অসুস্থতা মনকে বিরূপ করে তোলে। মানিকবাবুর শিল্পী হিসাবে সাফল্যের হয়তো একটা বড়ো কারণ এই যে, তাঁর উল্লেখযোগ্য, অসামান্য রচনাগুলির কোনোটাই বিষয়ের সঙ্গে যেমন বক্তব্যের, তেমনি বক্তব্যের সঙ্গে বাক্যপদ্ধতির স্বাভাবিকতাকে বিনাশ করে নি।

পরিচয় ॥ পৌষ ১৩৬৩ ॥

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

সাহিত্যিকের জীবন, সাহিত্যিকের মৃত্যু

"His conduct towards his friends, and especially to those who tried to help him, was cavalier. He made a principle of biting the hands that tried to feed him. And the curious thing is that he loved those friends none the less, while they were grateful to accept his abuse."

—*Richard Church on D. H. Lawrence.*

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে কিছু বলতে গিয়ে সূচনাতেই লরেন্স সম্পর্কে জনৈক ইংরেজ সমালোচকের একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছি। উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে, লরেন্সের সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সত্যিই কিছু সাদৃশ্য ছিল। শিল্পাদর্শে না হোক, শিল্পের উপকরণে। এবং জীবনেও।

শিল্প এবং জীবনকে ইংল্যাণ্ডের আর ক'জন সাহিত্যিক অভিন্ন রাখতে চেয়েছিলেন ? লরেন্সের মত ? শিল্প এবং জীবনকে বাংলাদেশের আর ক'জন সাহিত্যিক একীভূত করতে পেরেছিলেন ? মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত ? এবং এই একীকরণের প্রয়াসে লরেন্স অথবা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত এতখানি মূল্যই বা আর ক'জনকে দিতে হয়েছে ?

সাহিত্য-জীবনে এই এক্‌ীকরণের পরিণাম দু'জনেরই পক্ষে ফলপ্রদ হয়েছিল। ব্যক্তি-জীবনে কারও পক্ষেই হয়নি। যেমন লরেন্সের, তেমনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়েরও জীবন এবং মৃত্যু সেই আংশিক

অসাফল্যের প্রমাণ হয়ে রইল। কিন্তু তার জন্য আক্ষেপ জানিয়ে লাভ নেই। কেন না, ব্যক্তি-জীবনের স্বতন্ত্র কোনও অস্তিত্বে তাঁর ঈষণ্মাত্র আস্থা ছিল না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছিল না।

নির্বিচার প্রয়োগের ফলে 'বিপ্লব' কথাটির গুরুত্ব ইদানীং হ্রাস পেয়েছে। অন্যথায় বাংলা কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবির্ভাবকে এক বৈপ্লবিক ঘটনা বলে আখ্যাত করা চলত। সত্যিই বৈপ্লবিক। সাহিত্যের আদর্শ না হক, উপায় এবং উপকরণ সম্পর্কে যে সমস্ত ধারণা এদেশে প্রচলিত ছিল, সর্বাংশে না হোক, অনেকাংশেই তিনি তার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছেন। তাঁর সাহিত্যের মাধ্যমে। এবং, আদর্শই বা নয় কেন? আদর্শের ক্ষেত্রেও তাঁর বিশ্বাস তো প্রচলিত বিশ্বাসের সমর্থক ছিল না। সে কথা তিনি ইতস্তত ব্যক্তও করেছিলেন। তাঁর প্রবন্ধে, ভাষণে, বক্তৃতায়। এ সবই আমরা জানি। কিন্তু সত্যের খাতিরে শেষ পর্যন্ত বলতেই হয় যে, অন্তত এক্ষেত্রে—আদর্শের ক্ষেত্রে—তাঁর বিশ্বাস বাংলা সাহিত্যে কোনও স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেনি। এমন কি, তাঁর আপন সাহিত্যেও না। সাহিত্যের কোন্ আদর্শে তাঁর আস্থা ছিল? মনোহরণের আদর্শে অবশ্যই নয়। হিতসাধনকেই তিনি তাঁর লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সাহিত্যের দ্বারা সমাজের কতখানি হিত সাধিত হয়েছে, সে বিষয়ে চূড়ান্ত কথা বলবার সময় এখন আসেনি। আপাতত এইটুকুই বলবার যে, শেষ লক্ষ্য যাই হোক, মানবজীবনের এক অজ্ঞাতপরিচয় অংশের সঙ্গে তিনি আমাদের পরিচয় করিয়ে দেবার প্রয়াস পেয়েছিলেন, এবং সেই প্রয়াসের সাফল্য প্রায় অভূতপূর্ব।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ই বোধহয় প্রথম বাঙালী সাহিত্যিক, আমাদের শিক্ষাগত নানাবিধ পূর্বসংস্কার এবং চিন্তাগত নানাবিধ ভাবালুতা সম্পর্কে যাঁর বিন্দুমাত্র মোহ ছিল না। সমাজের অবহেলিত মানুষকে নিয়ে তাঁর আগে কি আর কেউ সাহিত্যরচনা করেন নি? অনেকেই করেছেন। এককভাবে তো বটেই, এমন কি সঙ্ঘবদ্ধভাবেও।

ভুলে না যাই, বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর আবির্ভাবের আগেই কল্লোল-গোষ্ঠীর কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাতন্ত্র্য তাতে ক্ষুণ্ণ হয় না। হয় না এই কারণে যে, তাঁর অগ্রবর্তী শিল্পীরা যেখানে সাহিত্যের উপকরণ নির্বাচনে চরম দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েও বুদ্ধির আভিজাত্যকে ত্যাগ করতে পারেন নি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে ছিলেন সম্পূর্ণ মোহমুক্ত মানুষ। নীচের তলার মানুষকে তিনি দেখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাতেই তিনি অনন্য নন। অনন্য এই কারণে যে, সাহিত্যিকদের মধ্যে একমাত্র তিনিই বোধহয় নীচের তলায় গিয়ে দেখেছিলেন।

যাওয়া তাঁর পক্ষে সহজ হয়েছিল। তার কারণ তথাকথিত শিক্ষিত এবং সভ্য সম্প্রদায়ের অসার সম্ভ্রমবোধ সম্পর্কে তাঁর অশ্রদ্ধার অন্ত ছিল না। তাদের চিন্তায় যে কতখানি ভ্রান্তি, আচরণে কতখানি কৃত্রিমতা, এবং এ-দুয়ের মধ্যে যে কত বড় অসঙ্গতি রয়ে গিয়েছে, তা তিনি জানতেন। একমাত্র তিনিই বোধহয় জানতেন যে, শুধু অন্যকেই নয়, নিজেদেরও তারা ফাঁকি দিয়ে থাকে, দিতে বাধ্য হয়। কার্নিশের দিকে চোখ দেবার আগে বাড়ির ভিত্‌টাকে যে পাকা করে তুলতে হয়, তা তারা জানে না। কিংবা জানলেও হয়ত ভুলে থাকতে চায়।

এদের নিয়ে কি তিনি লেখেন নি? এদের নিয়েও লিখেছেন। এই ফাঁপা আভিজাত্য নিয়ে তিনি বিদ্রূপ করতে পারতেন। তা তিনি করেন নি। এমন অনেক ছোটগল্প এবং একাধিক উপন্যাস তাঁর আছে, বিকৃতবুদ্ধি অথবা বিভ্রান্ত মানুষরাই যার উপজীব্য। এদের তিনি আঘাত দিয়েছেন, কিন্তু ব্যঙ্গের লক্ষ্য করে তোলেন নি। তার কারণ আর অন্য কিছুই নয়, তিনি সিনিক ছিলেন না। সমাজ-শরীরের নানা বিচ্যুতি এবং সমাজ-মানসের নানা অসঙ্গতি সম্পর্কে তাঁর প্রচণ্ড অশ্রদ্ধা ছিল। কিন্তু শুধুই অশ্রদ্ধা ছিল না, বেদনাও ছিল। এবং তারও তীব্রতা বড় সামান্য নয়। হৃদয়ে বেদনা নিয়ে আঘাত হয়ত করা যায়, ব্যঙ্গ করা যায় না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও করেন নি। এমন কি,

তাঁর অন্যতম স্মরণীয় গল্পের সেই ঠিকাদার নায়কটিকেও না, যুদ্ধের বাজারে যে রাতারাতি বড়লোক হতে চেয়েছিল এবং মোটা রকমের একটি কন্ট্রাক্ট আদায়ের অভিপ্রায়ে নিজের স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে মিলিটারী অফিসারের গুহায় ধাওয়া করতে যার বাধেনি। কিংবা সেই নিষ্ঠুর চরিত্রটিকেও না, আপন প্রণয়িনীকে যে গণিকালয়ে নিয়ে তুলেছিল। তারা জানত না যে, তাদের মূর্খতার পরিণাম মাত্র একটিই হতে পারে এবং সেই পরিণামের হাত থেকে কেউ নিষ্কৃতি পায় না। অনায়াসে এদের নিয়ে বিদ্রূপ করা চলত। কিন্তু, বিদ্রূপ যেহেতু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বভাবধর্ম ছিল না, এদেরও তিনি করুণার পাত্র করে তুলেছেন।

সমাজের যারা উপরতলায় মানুষ, লোভের পাত্রে যারা মুখ ডুবিয়ে বসে থাকে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখনী তাদের ক্ষমা করেনি। মধ্যস্থানে থেকে যারা উপরতলার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে, তিনি তাদের করুণা করেছেন। তাঁর মমতা এবং সহানুভূতি শুধু তাদের জন্যই সঞ্চিত ছিল যারা নীচের তলার মানুষ, জীবনে যাদের বিড়ম্বনার অন্ত নেই। সাহিত্য-জীবনের প্রথম পর্যায়ে সেই বিড়ম্বনার হেতুনির্ণয়ে তাঁর ততটা আগ্রহ ছিল না, যতটা তার প্রকৃত রূপচিত্রণে। বলতে বাধা নেই, তাঁর সেই সময়কার সাহিত্যে ঈষৎ নিয়তিবাদী মনোভাবও পরিস্ফুট হয়েছিল। যেমন "পুতুলনাচের ইতিকথা"য়। এ বই যে বাংলা-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে, তাতে বোঝা যায়, আর্টের দরবারে উদ্দেশ্যের ভূমিকা সত্যিই হয়ত উল্লেখযোগ্য নয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৎকালীন মনোভাব অবশ্য স্থায়ী হয়নি। পরে তিনি সাম্যবাদে দীক্ষা নিয়েছিলেন। সাহিত্যের সামাজিক উদ্দেশ্য কী হওয়া উচিত এবং কী হওয়া উচিত নয়, সাম্প্রতিক কালে সে-বিষয়ে তাঁর সুস্পষ্ট মতামতও তিনি জানিয়েছেন। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, সামাজিক দাবির তুলনায় আর্টের আপন দাবিকেই তিনি বড় বলে গণ্য করতেন। তাঁর সাহিত্য অন্তত সেই কথাই বলবে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনকে ভালবাসতে চেয়েছিলেন। তাঁর আপন পন্থায়। কিন্তু জীবন যেহেতু তার প্রেমিককেই সর্বাধিক দুঃখ দেয়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সে শুধু দুঃখই দিয়েছে! এ নিয়ে তাঁকে আক্ষেপ করতে শোনা যায়নি। আক্ষেপের কোনও হেতুও হয়ত ছিল না। কেন না বিরহের স্বস্তিকে নয়, মিলনের যন্ত্রণাকেই তিনি কাম্য মনে করতেন।

মাসিক বসুমতী ॥ পৌষ ১৩৬৩ ॥

ভবানী মুখোপাধ্যায়

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

"যার নামের ঠিক নেই, তার গুণ থাকে? যারা মানুষ করবে তারাই তার নাম দেবে? ছেলের ভালো একটা নাম যারা ধার দিতে পারবে না তারা কোন্ গুণে গুণী করতে পারবে ছেলেটাকে? যেমন ধরো খুব একজন নামকরা লোকের নাম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। নামটার কোনো মানে হয়? নামটা আর উপাধিটা জগতের কোন ভাষার ব্যাকরণে টিঁকতে পারে না। তবু মানকে শর্মা নাম দিলেও লোকটার নাম হতো। কেন জানিস? লোকে জানে এটা ছদ্মনাম। এটা বিনয়ের প্রমাণ। আর একটা গুণের প্রমাণ। যে গুরুতর কাজে নামলাম, যে কাজ অনেকে প্রাণ দিয়েও ঠিকমত করতে পারে না, যে কাজ করতে পারলে খুব নাম-ডাক হয় আর না করতে পারলে নিন্দা হয়, সে কাজ করতে নেমে নিজের নাম জাহির করার কি দরকার।"

[প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান—১৩ পৃষ্ঠা : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়]

এই আমাদের মানিক, এই ক'টি লাইনে সে লিখেছে তার আত্মজীবনী তার সর্বশেষ বা সর্বাধুনিক উপন্যাসে। আত্মজীবনী মানে আত্মপ্রচার নয়। নিজেকে জাহির করা নয়,—অথচ নিজের চরিত্রের আর কি পরিচয় এই ক'টি লাইনে কে দিতে পারতো?

তার চিতার আগুন এখনো হয়তো উত্তপ্ত, শোক এবং দুঃখে সবাই কাতর, মানিকের প্রশংসা ও প্রশস্তিতে সবাই প্রতিযোগিতায় নেমেছেন, কিন্তু আশ্চর্য তার জীবদ্দশায় কেউ একছড়া মালা হাতে করে গিয়ে তাকে সম্বর্ধনা জানায় নি, তখন কারো মনে হয় নি রবীন্দ্র-

পুরস্কারটা তাকে দেওয়া উচিত, কিংবা বাংলা সাহিত্যে তার কোথায় স্থান!

প্রশ্ন হবে এ-কথা কেন? অপ্রিয় আলোচনার প্রয়োজন কি? প্রয়োজন আছে মনে করেই প্রসঙ্গটা উত্থাপন করছি। আমার মনে হয়, এবং আমার সঙ্গে আমাদের আরো কয়েকজন সাহিত্যিক বন্ধুরও ধারণা যে, জীবনে যদি মানিক এই অকুণ্ঠিত স্বীকৃতি লাভ করত তাহলে হয়তো ঠিক এইভাবে অভিমানভরে সে মাঝপথে যাত্রাভঙ্গ করে চলে যেত না।

দুঃসাহসী, বলিষ্ঠ, দুর্দম ইত্যাদি নানা বিশেষণ মানিক সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু এ-কথাও মনে রাখতে হবে যে লোকটি সেই "অতসী মামী"র যুগের মুখচোরা কলেজের তরুণ ছাত্রই রয়ে গেছে।

বয়সে সে আমার চেয়ে সামান্য কিছু বড়ো ছিল। তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল অচিন্ত্যকুমার। দীর্ঘায়ত দেহ, চোখে চশমা, পায়ে চটিজুতো, আর প্রতিভাদীপ্ত মুখচ্ছবি আজো মনে আছে: গায়ের রঙ ময়লা হলেও যেন সাঁওতালী ছেলের লাবণ্য। সেই আলাপ ঘনিষ্ঠ হল কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের দোতলায় আর্য পাবলিশিং-এর আড্ডায়। তখনকার কালে বৃহস্পতিবার বিকালে ছোট বড়ো অনেক সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক সেই মজলিসে যোগ দিতেন। মানিকও আসতো। মনে আছে শ্রদ্ধেয় শচীন সেনগুপ্ত একদিন প্রেমেন্দ্রকে প্রশ্ন করছেন, কার লেখা এখন বেশ সম্ভাবনাময়? প্রেমেন তৎক্ষণাৎ মানিকের নাম করল। মানিক তখন মাত্র কয়েকটি গল্প লিখেছে। কিছু পরেই সে এসে পড়ল, প্রেমেন শচীনদার সঙ্গে মানিকের পরিচয় করিয়ে দিল। মানিকের কী সলজ্জ ভঙ্গি, প্রশংসা গ্রহণে তার কী অপরিসীম কুণ্ঠা!

সেই সময় মানিকের কলকাতা শহরের যান্ত্রিক সভ্যতার কোন জ্ঞানই ছিল না। অনেক সময় অনেক শিশুসুলভ প্রশ্ন করত এবং

সকলের অট্টহাসিতে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ত। যেমন হঠাৎ সে এসে হাজির হতো তেমনই হঠাৎ আবার উঠে পড়তো। সব সময়েই সে ব্যস্ত, অনেক কাজ পড়ে আছে, এতটুকু সময় নেই এই তার ভাব। একটু সুস্থির হয়ে বসতে পারতো না।

একদিন তখনকার গ্লোব সিনেমার ওপরতলায় সস্তার টিকিটে তিনটের শোতে ছবি দেখছি, পিছন থেকে কে কাঁধে হাত রাখল, পিছন ফিরে দেখি মানিক। হাতে তার একখানি কালো এক্সারসাইজ বই। সিনেমা ভাঙতে মানিক আমাকে টেনে নিয়ে কার্জন পার্কের একপাশে বসে তার নতুন লেখা পড়ে শোনালো। তখন সেটি একটি গল্প ছিল, কিন্তু পরে বঙ্গশ্রীতে যখন প্রকাশিত হয় তখন সজনী-কান্তের উপদেশানুসারে সে আরো কয়েকটি অনুচ্ছেদ রচনা করে। এবং পরে এই কাহিনীগুলি 'দিবারাত্রির কাব্য' নামে প্রকাশিত হয়।

সেকালেও লক্ষ্য করেছি এবং মৃত্যুর কিছুদিন আগেও দেখলাম, মানিকের জীবনে এক সর্বগ্রাসী অস্বস্তি ছিল। "বঙ্গশ্রী" সম্পাদক সজনীকান্তর স্নেহে মানিকের অনেকগুলি রচনা বঙ্গশ্রীতে প্রকাশিত হয়, এবং মানিক পরে বঙ্গশ্রীর সম্পাদকীয় বিভাগের অন্যতম হয়ে পাকাপাকিভাবে যোগ দেয়।

আমার সঙ্গে আবার যখন দেখা হল তখন 'বঙ্গশ্রী' আপিস ধর্মতলা স্ট্রীট থেকে উঠে গিয়ে লোয়ার সার্কুলার রোডের যে-বাড়িতে তার মরদেহ কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম করেছিল সেই বাড়ির কাছেই (সম্ভবতঃ ৯০ লোয়ার সার্কুলার রোড) উঠে গিয়েছে। বন্ধুবর কিরণকুমার রায় (এই নামের আধুনিক লেখক নন) আর মানিক দুজনে বঙ্গশ্রীর কর্ণধার। তাদের আশেপাশে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি শাস্ত্র-রচনায় ব্যস্ত। মানিক তখনও ছেলেমানুষ, কিরণ তার স্বভাবসিদ্ধ রসিকতায় সবাইকে বিব্রত করত, আর মানিক হাসত, কদাচিৎ একটা জুৎসই উত্তর দিত।

এই কালটা মানিকের জীবনে সংগ্রামের কাল। একটা মানসিক

দ্বন্দ্ব তার অন্তরকে আচ্ছন্ন রেখেছিল। সাহিত্য তার কাছে 'পার্ট-টাইম' কাজ ছিল না। সাহিত্যই তার জীবন যেখান থেকে অন্য কোথাও মন ফেরানো তার পক্ষে সম্ভব ছিল না, তবু সে সেই সংকটকালে সনাতনী মনোভাবাপন্ন পত্রিকা-মালিকের সঙ্গে মতান্তর হওয়ায় বাঁধা মাইনের চাকরি ছেড়েছে। সুবিধামত আবার যখন ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রণ্টে চাকরি পেল তখন তা সানন্দে গ্রহণ করল, তখন তার মনে এক রাজনৈতিক চেতনা জেগেছে। মানবেন্দ্র রায়ের র‍্যাডিকাল ডেমোক্র্যাটিক দলের সঙ্গে তার যোগাযোগ হওয়ার ফলেই মানিক ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রণ্টের কাজটা গ্রহণ করেছিল।

পরবর্তীকালে সে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিল কিন্তু তার ক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রণ্টের কাজ করার সময়। এই সময়েই সে প্রথমে প্রগতি লেখক সংঘে যোগদান করে এবং ক্রমে পুরোপুরিভাবে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করে।

মানিক স্বধর্মচ্যুত হলে সম্মান পেত জীবদ্দশায়, খেতাব খেলাৎ পেতে পারতো, কিন্তু যে-কাজ অনেকে প্রাণ দিয়েও ঠিকমত করতে পারে না—সেই কাজে সে আত্ম-সমর্পণ করেছে, সেখান থেকে সে ফিরতে পারবে না। নাই বা হল গাড়ি জুড়ি, নাই বা হল বাড়ি। মানিকের শিল্পী-মানস একটা আদর্শকে বরণ করেছে, সেখানে ফাঁকি আর ফাঁক নেই। শেষ পর্যন্ত সেই আদর্শকেই সে আঁকড়ে ছিল। সরে গিয়ে একটা বিবৃতি দিয়ে দায়মুক্ত হবার কথা বোধকরি সে ভাবতেই পারত না। যুদ্ধক্ষেত্রের পতাকাবাহী সৈনিক যেমন প্রাণ দিয়েও পতাকা রক্ষা করে, মানিকও তেমনই রণক্লান্ত সৈনিকের মত আদর্শের পতাকা উঁচু রেখে প্রাণ দিয়েছে।

গত বছর যখন ইসলামিয়া হাসপাতালে কিছুদিন ছিল, তখন একটা চিঠি পাঠালো।

একটা শনিবার বিকালে অনেক খুঁজে তিনতলার উপরে মানিকের

কেবিন খুঁজে বার করলাম। সেদিন ‘নতুন সাহিত্যে’র সম্পাদক বন্ধুবর অনিলকুমার সিংহও উপস্থিত ছিলেন। অনেকক্ষণ ধরে নানা কথা হল। বিশেষ করে বাংলা সাহিত্যের বর্তমান আকৃতি ও প্রকৃতি সেদিনের প্রধান আলোচ্য ছিল। মানিক কয়েকদিন হাসপাতালের নিয়মের গণ্ডিতে আবদ্ধ থেকে কিঞ্চিৎ সুস্থ। নার্স এসে ওষুধ খাইয়ে গেল, কমলা লেবু চুষতে চুষতে মানিক বলল—

“যাই বলো বাস্তবের রাজত্ব ছেড়ে পিছু হটে কল্পনার ক্ষেত্রে চলে গিয়ে পিরিয়ডের রোমান্টিক কাহিনীতে কৃতিত্ব থাকতে পারে গবেষকের, কিন্তু তাতে শিল্পীর পরিচয় পাওয়া যাবে না। মাল-মশলা যোগাড় করে ঠিকাদারের বাড়ি তৈরির মতো ইঁটের স্তূপ হবে। তার মধ্যে শিল্প-নৈপুণ্য কোথায়। আশেপাশের মানুষকে ছেড়ে দিয়ে যাদের কখনো দেখিনি শুনিনি তাদের ব্যথা বেদনার কি ইতিহাস লিখবো আমরা ?”

এই রকম আরো অনেক কথা বলেছিল সেদিন, ডায়েরী রাখিনি তাহলে সেই কথার মধ্যে মানিকের মনের পরিচয় পাওয়া যেত।

অনিলবাবুকে ‘নতুন সাহিত্য’ কিভাবে আরো মনোহর করা যায় সে বিষয়ে মানিক নতুন আইডিয়া দিয়েছিল। সেইদিনই বোধহয় ‘নতুন সাহিত্য’কে আবার বর্তমান বড় আকারে পরিবর্তিত করার কথা হল!

মানিক সেই রোগশয্যায় শুয়ে ‘নতুন সাহিত্য’ এবং সেই সঙ্গে মূলধনহীন অল্প পুঁজির সাহিত্যপত্রের সমস্যা নিয়ে অনেক কথা বলল। বলল যে এই সব পত্র পত্রিকাকে যদি বাঁচানো না যায় তাহলে বাংলা সাহিত্য তার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হারাবে, সাহিত্য পুঁজিবাদী মালিকের কথামত রচিত হবে এবং সাহিত্যিকের মানসিক স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হবে।

সন্ধ্যার পর আমরা মানিককে বিশ্রাম করতে অনুরোধ জানিয়ে উঠে এলাম। কয়েকদিন পরে আবার গিয়ে দেখি সেই কেবিনে অন্য রোগী, মানিক হাসপাতাল ছেড়ে বাড়ি পালিয়েছে।

মানিকের 'জননী' উপন্যাসখানি একটি ফুলস্কেপ সাইজের বিরাট খাতায় লেখা ছিল। ছোট অক্ষরে লেখা সেই উপন্যাসটি হাতে করে তাকে অনেক ঘুরতে হয়েছে। জেনারেল প্রিন্টার্সের সুরেশবাবু 'জননী' ছাপবার আগে আর্য পাবলিশিং-এর শশাঙ্ক চৌধুরীর কাছে অনেকদিন রাখা ছিল।

কিশোর মানিকের মনে পদ্মা এক গভীর ছায়াপাত করেছিল, অনেকদিন সেই ভাবে সে আচ্ছন্ন ছিল। পদ্মার ঢেউ-এর এক ঝলক তাই সে বাংলা সাহিত্যে দান করেছে, এবং বোধকরি দীনবন্ধুর 'নীল-দর্পণে'র নাটকের আঞ্চলিক ভাষায় লেখা 'পদ্মানদীর মাঝি' বাংলা সাহিত্যে এক দুঃসাহসিক এক্সপেরিমেন্ট—(পরীক্ষা কথাটা ইচ্ছা করে ব্যবহার করলাম না), এবং সমালোচকরা যাই বলুন আমার মতে 'পদ্মানদীর মাঝি' মানিকের শ্রেষ্ঠতম কীর্তি। বিশ্বসাহিত্যের যে কোন দশখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের সমপর্যায়ভুক্ত হওয়ার যোগ্য। সিসিলি উপকূলস্থ চাষী-মাঝিদের কাহিনী অবলম্বনে বিখ্যাত ইতালীয়ান লেখক জিওভান্নি ভারগার ক্লাসিক উপন্যাসে "The House by the Medlar Tree" এবং 'পদ্মানদীর মাঝি' সমগোত্রীয়।—বিদেশী ভাষায় গ্রন্থটির অনুবাদ হয়েছে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই উপন্যাস একদিন তার যথাযোগ্য সমাদর পাবে। 'পদ্মানদীর মাঝি' যখন পূর্বাশায় প্রকাশিত হয় (তখন পূর্বাশার প্রচার সংখ্যা বড়জোর দেড় হাজার) তখনই সকলে গ্রন্থটির প্রশংসা করেন, কিন্তু তখনও বাংলা গ্রন্থের বিক্রি তেমন বাড়েনি, তাই তাজা কেকের মত হয়তো বিক্রি হয়নি।

'বঙ্গশ্রী'র কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় যখন মানিক সেই পত্রিকা ছেড়ে দেয় তখন তার আর্থিক অবস্থা অতিশয় হীন তবু সে 'কম্প্রোমাইজে' রাজী হয়নি। এই কালের কিঞ্চিৎ ছাপ তার 'শহরতলী' উপন্যাসে আছে।

লেখকের কাছে তার সব লেখাই ভালো, তাই মানিক কখনও বলেনি এই আমার শ্রেষ্ঠ রচনা, বলেছে—

"খ্যাঁদা নাক, থ্যাবড়া গাল, কালো নোংরা মেয়েটাই হয়ত বাপের সব চেয়ে আদুরে—জগৎ সংসারে উলঙ্গ সত্যের নির্ভীক, নিরাবরণ নিছক খাঁটি মহান প্রতীক হিসাবে হয়তো আর কোন তুলনা খুঁজে পাওয়াই সম্ভব নয়, বাপের স্নেহান্ধ দৃষ্টি এবং বিচারে !

এটাই কি শেষ কথা ?

মায়া ?

কি হাস্যকরভাবেই মায়াকে অস্বীকার করেন মায়াবাদী পণ্ডিতেরা ! জীবনকে জানা আর জীবনকে মায়া করা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। একটাকে বড় করে অন্যটাকে তুচ্ছ করা জীবনদর্শীর পক্ষে বীভৎস অপরাধ।

অসম্ভব অবান্তর কথা টেনে আনলাম কি ? বেদ বেদান্ত উপনিষদের মূলতত্ত্ব ?"

[ভূমিকা—স্ব-নির্বাচিত গল্প, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়]

কিংবা—

"শ্রেণীবিভক্ত জীবন কোন দেশে কস্মিনকালে প্যারালাল বা সমান্তরাল ছিল না, এখনও নেই—

আমি বলছি জীবনের কথা, শ্রেণীতে শ্রেণীতে ভাগ হয়েও একত্র সংগঠিত সমগ্র সমাজের কথা। সমান্তরাল কাহিনী খুবই সম্ভব, একটু কায়দা করে বানিয়ে লিখলেই হল—কিন্তু সম্পর্কহীন সমান্তরাল জীবন !"

[হলুদ নদী সবুজ বন—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়]

জীবন সম্বন্ধে এই ছিল তার দৃষ্টিভঙ্গি। উপরকার দুটি উদ্ধৃতিই ১৩৬২ সালের রচনা। মানিক সচেতন শিল্পী নয়, সে অচেতন শিল্পী, নিজেকে সে চিন্‌তে পারেনি, চেনাতেও চায়নি। 'সেকেণ্ডহ্যাণ্ডে'র কারবারী সে ছিল না, জীবনকে প্রত্যক্ষ দেখেছে সে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, সোজা ঝাঁপিয়ে পড়েছে আগুনে—সেখানে সে জন্ম রোমাণ্টিক। তার রিয়্যালিজমে তাই রোমান্সের খাদ মেশানো আছে। তার মত মানুষকেও

জীবনের কুৎসিত বীভৎসতার হাত থেকে পলাতক হতে হয়েছে। কঠোর জীবনকে এড়িয়ে অদৃশ্যলোকে পলায়নের সিদ্ধিলাভ করলো মৃত্যুতে।

তিরিশ দশকের সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের মধ্যে অনেকের সুরাসক্তি ছিল, এ-কথা অনেকেই জানেন। গোপনতার প্রয়োজন নেই, এদিকে মানিকও ক্রমশ আকৃষ্ট হয়। 'জননী' যখন প্রকাশ হয় তখনই তার হাতে খড়ি, তারপর সেই সুরা তাকে একদিন গ্রাস করলো, হয়তো শান্তিও দিয়েছে। তার জ্বালা মিটিয়েছে। 'এ্যালকহলিজম' নিয়ে কানাকানি চলছে চারদিকে, কানাকানির প্রয়োজন আজ ফুরিয়েছে। সমগ্র বিশ্বের অসংখ্য প্রতিভাধর মানুষের এই সুরার হাতে অপমৃত্যু ঘটেছে। বিখ্যাত ইতালিয় চিত্রকার মদিল্লিয়ানী বা সাম্প্রতিক কালের শ্রেষ্ঠ ইংরেজ কবি ডিলান টমাসের অপমৃত্যুর কাহিনী সবাই জানেন। ডিলান টমাসের বন্ধু জেমস্ ম্যালকম্ ব্রিনাইন তাঁর সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থ "Dylan Thomas In America" গ্রন্থে লিখেছেন—

"···And then begins the endless series of beers, whiskies and wines, which led to the oxygen tent and most tragic death of a young poet since Byron."

উগ্র প্রতিভার এইভাবেই অপমৃত্যু ঘটে, ইতিহাস তার সাক্ষ্য। মানিকের জীবনও তার কিছু ব্যতিক্রম নয়। তার জন্য কাউকে দায়ী করা চলে না, সে তার কাজ শেষ করেই চলে গেল,—বাকী কাজ শেষ করবে তার পরবর্তীগণ।

যে কালে সে জন্মেছে সেই কালে সাহিত্য রচনায় স্বীকৃতি পাওয়া সহজ ছিল না, মানিক একটি গল্প লিখেই সাহিত্যক্ষেত্রে স্থায়ী আসন পেতে নিয়েছিল, এমন কি শেষের দিনে তার জীবনের কাহিনীতে কে আর বিয়োগান্ত গল্প রচনা করে গেল।

যে ব্যক্তি সাতান্নখানি গ্রন্থ লিখেছে, যার নাম মানিক বন্দ্যো-পাধ্যায়, তার শোক সভাতেও চাদর ধরে চাঁদা তুল্তে হয়, এই আমার দেশ। সাতান্নখানা গ্রন্থের প্রকাশকরা সবাই মিলে পাঁচশো টাকা দিতে পারতেন, দেবেনও একদিন, সেদিন আসন্ন। কিন্তু এ দিনের কলঙ্ক কি মুছবে?

মানিকের গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত প্রবন্ধাবলী সংকলন প্রকাশ করে যে কোন প্রকাশক ঐ টাকাটা দিয়ে দিতে পারতেন। মৃত্যুর পর চিতার ওপর মঠ গড়ার চেষ্টা আমরা করে থাকি, এটা আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য। "মানিকের সাহিত্যের প্রচার হোক্, তার রচনার মর্মকথা এদিনের মানুষ বুঝেছে" একথা বোঝা গেল ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিট্যুটের শোক সভায়। নতুন করে আবার মানিককে যদি আবিষ্কার করে এদিনের সাহিত্য-পাঠক, তাহলেই সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা প্রদর্শনই করা হবে। বন্ধুবর বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় একটা চমৎকার কথা বলেছিলেন ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিট্যুটের সভায়, "পশ্চিমের নবাগত শিল্প-সমৃদ্ধ সভ্যতা উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যপটে ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে যে সংঘর্ষ বাধিয়েছিল তাতে ছিল অমৃত আর গরল, মাইকেল সেই গরল পান করে দেশকে দান করেছিলেন অমৃত। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ধনতান্ত্রিক প্রাচীন সভ্যতা ও সমাজতন্ত্রের নূতন ভাবাদর্শের সংঘাতে যে গরল উঠেছিল, মানিক ব্যক্তি-জীবনে স্বয়ং সেই গরল পান করে সাহিত্য-জীবনে অমৃত দান করেছেন।"

মানিকের জীবনী একদিন লিখিত হবে। অনেক প্রবন্ধ লেখা হয়েছে, অনেকে আরো লিখবেন, তার কিছু অপ্রকাশিত রচনা হয়তো এখনও প্রকাশিত হবে তার ফলে তার সামগ্রিক জীবনের পূর্ণাঙ্গ ছবি পাওয়া যাবে। যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন তাঁরা দৈনন্দিন জীবনের অন্তরঙ্গ কাহিনী শোনাবেন, কিন্তু প্রচারবিমুখ মানিকের পরিচয় কতটুকু আমরা পাব, আজীবন যে মুখচোরা রয়ে গেল। জীবনে সে নিজের প্রাপ্য আদায় করে নিতে পারেনি, মরণে হয়তো তার পাওনা আমরা

দিতে পারব। শুভ্র পদ্মের ওপর রঙ ফলিয়ে তার সৌন্দর্য কতটুকু বাড়ানো যাবে, মানিকেরও তা পছন্দ ছিল না। তার সম্পর্কে কবিতা বা প্রবন্ধ লেখাও তার মনঃপুত ছিল না। কিন্তু ১৯৪১-এ W. H. Auden রচিত "The Novelist" নামক সম্পূর্ণ কবিতাটি উদ্ধৃত করছি, এ কবিতা মানিককে মনে রেখেই যেন লেখা হয়েছিল :

Encased in talent like a uniform,
The rank of every poet is well known ;
They can amaze us like a thunderstorm,
Or die so young, or live for years alone :

They can dash forward like hussars ; but he
Must struggle out of his boyish gift, and learn
How to be plain and backward, how to be
One after whom none think it worth to turn.

For, to achieve his lightest wish, he must
Become the whole of boredom ; subject to
Vulgar complaints like love ; among the Just

Be just ; among the Filthy filthy too ;
And in his own weak person, if he can,
Must suffer dully all the wrongs of man.

এ দিনের মানুষের সকল ত্রুটি, সকল দৈন্য, সকল দৌর্বল্য আত্ম-বলিদানে মুছে দিয়ে গেল মানিক।

নতুন সাহিত্য। পৌষ, ১৩৬৩॥

মিহির সেন

লেখকের কথা ঃ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

'লেখা ছাড়া অন্য কোন উপায়েই যে-সব কথা জানানো যায় না সেই কথাগুলি জানাবার জন্যই আমি লিখি।'—'কেন লিখি' প্রশ্নের জবাবে অনাড়ম্বর জবাবদিহি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

কিন্তু নিজের লেখা প্রসঙ্গে কোন লেখকের এটাই সব কথা নয়; শেষ কথা নয়। বরং বলা যায় কথার শুরু মাত্র। যে কোন সৎ, সচেতন লেখকের কাছে পরবর্তী প্রশ্ন বা আত্মানুসন্ধান, 'কি লিখি'। অবশ্য নিছক খ্যাতি বা অর্থই যাঁদের লক্ষ্য তাঁদের কাছে প্রশ্নটা খুবই সহজ। অথবা, 'শিল্পের জন্যই শিল্প' যাঁদের আদর্শ, জবাবটা তাঁদের ক্ষেত্রেও কঠিন নয়। প্রশ্নটা ধারালো এবং জটিল তাদের ক্ষেত্রেই, যাঁরা নিছক কোন জীবন-দর্শন সামনে রেখে লিখতে চান। শিল্প-কর্মকে যাঁরা একটি অবশ্য পালনীয় সামাজিক-কর্ম হিসেবে শ্রদ্ধা করেন; অথবা, জীবন-সংগ্রামের অপরিহার্য অস্ত্র হিসেবে গণ্য করেন।

লেখক হিসেবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন এই শেষ দলের শরিক। নিজেকে, শুধু ব্যাপক অর্থে বামপন্থী বা প্রগতিশীল নয়, সোচ্চারে একজন মার্কসবাদী লেখক হিসেবে ঘোষণা করতেও তিনি ভীত বা কুণ্ঠিত ছিলেন না, বরং গর্বিতই ছিলেন। যে কোন ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় এ-পরিচয় আপোশের সহজ পথ রুদ্ধ করে লেখককে অসংখ্য সংকটের ভেতর নিক্ষেপ করে। শুধু এই সচেতন হিসেব থেকেই নয়, প্রচলিত ধ্যান ধারণার পরিপন্থী বলেও হয়তো ধনতান্ত্রিক দেশে অধিকাংশ শিল্পী-সাহিত্যিক প্রথাসিদ্ধ পথ চলতেই অভ্যস্ত বা ইচ্ছুক। চিন্তায় ও সৃষ্টিতে মার্কসবাদী শিল্পী আজও তাই ব্যতিক্রমের

দলে পড়েন। শিল্প সাহিত্য বিষয়ে তাঁদের চিন্তা ও বক্তব্য প্রসঙ্গে পাঠকের জিজ্ঞাসা, ঔৎসুক্য ও কৌতূহল তাই স্বাভাবিক।

বিশেষ করে দুটো কারণে মানিকের ক্ষেত্রে আমাদের এই জিজ্ঞাসা আরো প্রবল ছিল। প্রথমত, তিনি ছিলেন একজন প্রচণ্ড শক্তিশালী সাহিত্য-স্রষ্টা। দ্বিতীয়ত, নিজস্ব রাজনৈতিক আদর্শ ও জীবনদর্শন প্রসঙ্গে ছিলেন অনমনীয়, অবিচল। চিন্তায় ও সৃষ্টিতে কোন বৈপরিত্য বা শৈথিল্যের ফাঁক ছিল না তাঁর রচনায়।

কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, মানিক আমাদের সে প্রত্যাশা পূরণ করে যান নি। তারও বোধহয় দুটো কারণ। আত্মকথায় তাঁর সহজাত কুণ্ঠা বা নির্লিপ্তি। এবং, তর্ক-বিতর্ক বা প্রবন্ধ রচনায় অনাগ্রহ বা আলস্য।

তাই অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত কোন ভূমিকা, আলোচনা, প্রতিবাদ বা সংঘ-সমিতির আনুষ্ঠানিক কোন প্রস্তাব বা ভাষণ—ইত্যাদি থেকেই তাঁর সাহিত্যচিন্তার সূত্র খুঁজে পেতে হয় আমাদের। অবশ্য পরিমাণ কম হলেও, এ থেকেই তাঁর সাহিত্য-চিন্তার একটি সুস্পষ্ট পরিচয় পেতে কোন অসুবিধে হয় না।

মানিকের সাহিত্য-সাধনার কোন আশৈশব চর্চা ছিল না। লিখতে শুরু করেছিলেন আচমকাই। বাজি রেখে। নতুন লেখকদের ভাল গল্পও সম্পাদকরা ফেরত দেন কিনা, এই প্রশ্নের ওপর বাজি রেখে প্রথম গল্প 'অতসী মামী' লেখেন যখন, তখন তিনি বি. এস.-সি., ক্লাসের ছাত্র।

কিন্তু কোন রকম প্রস্তুতি ছাড়াই কি কারো সাহিত্য-জীবন শুরু হয়ে যেতে পারে? এটাই কি তবে প্রতিভার নিদর্শন?

না, এর কোনটিকেই মানেন না মানিক। প্রথম প্রশ্ন প্রসঙ্গে তাঁর নিজের জবাব, 'আমি বলবো, না, এ রকম হঠাৎ কোন লেখকই গজান না। রাতারাতি লেখকে পরিণত হওয়ার ম্যাজিকে আমি বিশ্বাস করি না। অনেক কাল আগে থেকেই প্রস্তুতি চলে।… প্রস্তুতির কাজটা অবশ্য লেখক সচেতনভাবে নাও করতে পারেন।

জীবনযাপনের সমগ্র প্রক্রিয়ার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে থাকায় লেখক হবার আগে এই প্রস্তুতি প্রক্রিয়ার বিশেষ তাৎপর্য ধরতে না পারাই স্বাভাবিক।'

আর, প্রতিভা? এ প্রসঙ্গে মানিকের সাফ জবাব, 'প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণের কথাটা বাজে। আত্মজ্ঞানের অভাব আর রহস্যাবরণের লোভ ও নিরাপত্তার জন্য প্রতিভাবানেরা কথাটা মেনে নেন।...মাথা নিচু করে এই মূল সত্যটিকে মেনে নিতে হবে যে, কবিতা লেখাও কাজ, ছবি আঁকাও কাজ, গান করাও কাজ, চাকা ঘোরানোও কাজ, তাঁত চালানোও কাজ এবং কাজের দক্ষতা শুধু কাজেরই দক্ষতা।... প্রতিভা এই দক্ষতা অর্জনের বিশেষ ক্ষমতা। আর কিছু নয়।'

তাই, অলৌকিক প্রতিভা নয়, নিজের আত্মবিশ্লেষণে লৌকিক প্রক্রিয়ার ওপরই জোর দিয়েছেন তিনি। প্রতিটি লেখকের ক্ষেত্রে যে প্রক্রিয়া গড়ে ওঠে সাহিত্য প্রসঙ্গে তাঁর তীব্র আগ্রহ, তীক্ষ্ণ জীবন-জিজ্ঞাসা, জীবন প্রসঙ্গে নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া, নিজস্ব বাস্তব-জীবন ও পরিবেশের ঘাত-প্রতিঘাতের ভেতর দিয়ে সঠিক জীবন-দর্শন খুঁজে নেবার চেষ্টা, ইত্যাদির নির্ভরে।

নিজের জীবনেও এই প্রক্রিয়াকে 'সংস্কার ও স্বপক্ষপাতিত্ববর্জন করে বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে' বিচার করার চেষ্টা করেছেন তিনি।

গভীর জিজ্ঞাসা ছিল তাঁর আশৈশব প্রবণতা। 'ছেলেবেলা থেকে 'কেন?' নামক মানসিক রোগে ভুগছি, ছোট বড় সব বিষয়ের মর্মভেদ করার অদম্য আগ্রহ সে রোগের প্রধান লক্ষণ।'

স্বভাবতই এই জিজ্ঞাসা নিয়েই তিনি পরবর্তী সময়ে তাঁর নিজস্ব পরিবেশ ও মানুষকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু যথার্থ উত্তর খুঁজে না পেয়ে যন্ত্রণায় বিদ্ধ হয়েছেন। অন্বেষণ আরো তীব্র হয়েছে। তীব্রতর হয়েছে সংস্কার ও চেতনার সংঘাত।

জন্মসূত্রে মধ্যবিত্ত ভদ্রজন তাঁর স্বশ্রেণী, কিন্তু সেই জীবনের কৃত্রিমতা, সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে চেতনায় বিদ্রোহ দানা বাঁধছে। অবশ্য

নিচুতলার মার-খাওয়া লোকগুলোর প্রতি মমতা রয়েছে। অথচ তাদেরও রুক্ষ কঠোর সংস্কারাচ্ছন্ন জীবনে গিয়ে মানসিক আশ্রয় খুঁজে পাচ্ছেন না তিনি।

এই মর্মান্তিক মানসিক দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে মানিকের নিজস্ব নির্মোহ বিশ্লেষণ : 'ভদ্রজীবনকে ভালবাসি, ভদ্র আপনজনদেরই আপন হতে চাই, বন্ধুত্ব করি ভদ্রঘরের ছেলেদের সঙ্গেই, এই জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা স্বপ্নকে নিজস্ব করে রাখি, অথচ এই জীবনের সংকীর্ণতা, কৃত্রিমতা, যান্ত্রিকতা, প্রকাশ্য মুখোশ-পরা হীনতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি মনটাকে বিষিয়ে তুলছে।

এই জীবন আমার আপন অথচ এই জীবন থেকেই মাঝে মাঝে পালিয়ে ছোটলোক চাষা-ভূষোদের মধ্যে গিয়ে যেন নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচি। আবার এই ছোটলোকদের অমার্জিত রিক্ত জীবনের রুক্ষ কঠোর নগ্ন বাস্তবতার চাপে অস্থির হয়ে নিজের জীবনে ফিরে এসে হাঁফ ছাড়ি।

বাড়তে বাড়তে এই সংঘাত প্রথম যৌবনে অবর্ণনীয় প্রচণ্ডতা লাভ করে'।

এই একই সংঘাতের মুখোমুখি হন পাঠক হিসেবেও। মাত্র বারো তেরো বছরের ভেতর যাঁর বিষবৃক্ষ, গোরা, চরিত্রহীন পড়া হয়ে গেছে, পাঠক হিসেবে নিশ্চয়ই তাঁর আগ্রহ, ঔৎসুক্য ও ঐকান্তিকতা প্রশ্নাতীত। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল মানিকের সহজাত জিজ্ঞাসা।

কিন্তু পঠিত সাহিত্য থেকেও তিনি কোন জবাব খুঁজে পেতেন না। নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিল খুঁজে পেতেন না গল্প-উপন্যাসের চরিত্র ও পরিবেশের। শুধু তাই নয়, সেখানেও আর এক সংঘাত। ভাবপ্রবণ মধ্যবিত্তিক মন,—অবাস্তব হলেও, সেই সব কল্পনার রঙে রঙীন সাহিত্যে মশগুল হয়ে থাকে। আবার একই সঙ্গে যুক্তিবাদী অন্বিষ্ট মন সেই সাহিত্যে বাস্তবতার অভাবে, মিথ্যের মুখোশ খুলে

দেবার সৎসাহসের অভাবে 'এবং বাস্তব-ঘেঁষা সতেজ ও বলিষ্ঠ জীবনের অধিকারী মানবতার বিরাট অংশকে ঠাঁই না দেওয়ায়' ক্ষুব্ধ হয়। আপশোস বাড়ে।

বাংলাদেশে বাস্তববাদের দাবী নিয়ে তখন কল্লোল যুগের লেখকরা আসরে নেমে পড়েছেন। তাঁদের দাপটে চারদিক প্রকম্পিত। বাংলা সাহিত্যের ভিত পর্যন্ত নড়ে উঠেছে। প্রাচীনপন্থীদের শিবিরে গেল-গেল রব।

কিন্তু মানিক সেখানেও তাঁর জিজ্ঞাসার উত্তর পেলেন না। তৃপ্তি পেলেন না। বিজ্ঞানের জিজ্ঞাসু ছাত্র মানিক তখন একই আগ্রহ নিয়ে যৌন-বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব ও বিশ্বসাহিত্যের পাঠক। এই 'বস্তুপন্থী' বিদ্রোহী লেখকদের ফাঁকিটা সহজেই তাঁর চোখে পড়ে গেল। ভাষা, ভঙ্গি ও আঙ্গিকের চমকটাই সেখানে বেশী। নতুন মানুষ ও পটভূমির সঙ্গে নতুন কোন জীবনবোধ ওঁরা আমদানি করতে পারেন নি। বস্তি, খনি, কারখানার মানুষকে ওঁরা সাহিত্যে হাজির করেছেন ঠিকই, কিন্তু স্বশ্রেণী, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবাস্তব ভাবালুতা থেকে তাদের রক্ষা করতে পারেন নি।

নতুন করে আবার অতৃপ্ত মন প্রশ্ন করেছে মানিকের, 'শৈশব থেকে সারা বাংলার গ্রামে শহরে ঘুরে যে জীবন দেখেছি, নিজের জীবনের বিরোধ ও সংঘাতের কঠোর চাপে ভাবালুতার আবরণ ছিঁড়ে ছিঁড়ে জীবনের যে কঠোর নগ্ন বাস্তব রূপ দেখেছি—সাহিত্যে কি তা আসবে না?'

এই অতৃপ্তি এবং সংগ্রামই, পোড়-খাওয়া মানুষ ও নিচুতলার জীবনের প্রতি একান্ত দরদই তাঁকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করে তুলেছিল, তিনি নিজেই একদিন কলম ধরবেন। লেখক হবেন। সাহিত্যের অপূর্ণতা পূরণ করবেন।

এই সংকল্পের সঙ্গেও অবশ্য কিছুটা কৈশোরের ভাবাবেগ জড়িত ছিল একসময়। নিজেই তিনি তাঁর লেখক হবার সময় সীমা

ঠিক করে নিয়েছিলেন তিরিশ বছর। কারণ তার আগে সবদিক দিয়ে নিজেকে তৈরী করে নেওয়া যায় না। সেজন্যই বাজি রেখে লেখা প্রথম গল্পটা তিনি নিজের নামে লেখেন নি। ডাক নামে লিখেছিলেন। নিজের 'অফিসিয়াল' নাম প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়টা হাতে রেখে দিয়েছিলেন পরবর্তী সময়ের জন্য। যখন তিনি সত্যি সাহিত্য করতে শুরু করবেন তখনকার জন্যে।

কিন্তু ভাগ্যের এমনই পরিহাস, প্রথম গল্পের খ্যাতি তাঁর অখ্যাত ডাক নামটাকেই বিখ্যাত করে দিল চিরদিনের জন্য।

এই অপ্রত্যাশিত সাড়াই মানিকের সমস্ত পূর্ব-সিদ্ধান্ত গুলোট পালট করে দিল। সব ছেড়ে দিয়ে শুরু করলেন লেখা।

কিন্তু এই খ্যাতি কুড়োনো প্রথম গল্প বা সে সময়ের লেখা প্রসঙ্গে মানিক নিজে ছিলেন নির্মোহ। নির্মম আত্মসমালোচক। 'অতসী মামী' প্রসঙ্গে তাঁব নিজের স্বীকৃতি, 'রোমান্স ঠাসা অবাস্তব কাহিনী। কিন্তু এ গল্প সাহিত্য করার জন্য লিখিনি—লিখেছিলাম বিখ্যাত মাসিকে গল্প ছাপানো নিয়ে তর্কে জিতবার জন্য।'

'দিবারাত্রির কাব্য' প্রসঙ্গেও মানিক এই দুর্বলতার কথা স্বীকার করেছিলেন।

এ-পর্বে মানিকের মনে জিজ্ঞাসা ছিল, জ্বালা ছিল, ভাবপ্রবণতার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ ছিল, কিন্তু যথার্থ বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী তখনও গড়ে ওঠেনি তাঁর। পুরোনো চেতনা থেকে নতুন জীবন-দর্শনে উত্তরণের পর্ব শুরু হয়েছিল আরো পরে। মার্কসবাদের সঙ্গে পরিচিত হবার পর। মার্কসবাদের ভেতর তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন নিজের উত্তর। ইতিহাস বিচারের সূত্র।

এবং সেই সঙ্গেই অর্জন করেছিলেন একজন খাঁটি মার্কসবাদীর নির্মম আত্মসমালোচনার সৎসাহস :

'আমার লেখায় যে অনেক ভুল, ভ্রান্তি, মিথ্যা অসম্পূর্ণতার ফাঁকি আছে আগেও আমি তা জানতাম। কিন্তু মার্কসবাদের সঙ্গে পরিচয়

হবার আগে এতটা স্পষ্ট ও আন্তরিকভাবে জানবার সাধ্য হয় নি।··· মার্কসবাদই যখন মানবতাকে প্রকৃত অগ্রগতির সঠিক পথ বাতলাতে পারে, অতীতে কি ছিল, বর্তমানে কি হয়েছে এবং কিভাবে কোন্ ভবিষ্যৎ আসবে জানিয়ে দিতে পারে তখন মার্কসবাদ সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে সাহিত্য করতে গেলে এলোমেলো উল্টোপাল্টা অনেক কিছু তো ঘটবেই।'

কিন্তু মার্কসবাদে বিশ্বাসই কোন শিল্পী-সাহিত্যিকের ক্ষেত্রে শেষ বিচার নয়। সেই বিশ্বাসকে শুধু বুদ্ধি দিয়ে অর্জন করা নয়, চেতনায় উপলব্ধি করে আপন সৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনি তা সঠিক প্রয়োগ করতে পারছেন কিনা, সেটাই বিচার্য।

সেখানে মানিক কতটা উত্তীর্ণ সে বিচার সমালোচকের। কিন্তু এই নতুন জীবনদর্শনে দীক্ষিত হবার পর থেকে তাঁর সতর্ক সংকল্প ছিল এই নতুন জীবনবোধকেই সাহিত্যে প্রতিফলিত করা। একজন যথার্থ সংগ্রামী লেখক হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলা।

সংগ্রামের আসল স্বরূপ প্রসঙ্গেও কোন মোহ বা ভ্রান্তি ছিল না মানিকের। এই জীবন-দর্শনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত দায়িত্ব ও প্রতিবন্ধকতা প্রসঙ্গে সচেতন ছিলেন তিনি। জানতেন, এ সংগ্রাম একদিকে নিজের পুরোনো ধ্যান ধারণা, সংস্কার, আত্মকেন্দ্রিকতা ইত্যাদির বিরুদ্ধে অনলস, যন্ত্রণাদায়ক সাধনা। অন্য দিকে এই ধনতান্ত্রিক শ্রেণী শাষিত সমাজের যে কোন রকম 'প্রগতিশীল চিন্তা-ধারাকে চেপে মারার বহুরূপী প্রত্যক্ষ ও প্রচ্ছন্ন' অভিযানের বিরুদ্ধে আপোশহীন সংঘাত।

কিন্তু এই সংগ্রাম অত্যন্ত সহজভাবেই মেনে নিয়েছিলেন তিনি। শ্রমিক শ্রেণীর শিবিরকেই লেখক হিসেবে নিজের শিবির বলে বেছে নিয়েছিলেন। স্বভাবতই সেজন্য পরবর্তী জীবনে অনেক ঝড়-ঝাপটা সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে। রাজ-রোষ, প্রতিক্রিয়ার আক্রমণ,

দারিদ্র্যের মুখোমুখি হতে হয়েছে বহু সময়। কিন্তু তবু কোন রকম আপোসের প্রশ্নে তিনি ছিলেন অনমনীয়। অনলস সংগ্রামী।

কিন্তু মার্কসবাদকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা ও তার প্রয়োগ এক কথা নয়। এ-কথা প্রতিটি ব্যক্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ক্ষুরধার এই ফলিত-দর্শনটির দুদিকে দুই বিচ্যুতির আশঙ্কা প্রতি পদক্ষেপে। সে দুটি বিপদ-সংকীর্ণতা এবং অতি উদারতার।

একজন মার্কসবাদী লেখক হিসেবে এ প্রসঙ্গে সর্বদাই সচেতন ছিলেন মানিক। অথবা, থাকার চেষ্টা করতেন। সাহিত্য ও সাহিত্যিক প্রসঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে। প্রগতিশীলতার কোন যান্ত্রিক সংজ্ঞায় বিশ্বাসী ছিলেন না তিনি।

বাংলাদেশের বামপন্থী চিন্তায় বেশ কিছুদিন কতগুলো বিষয়ে একটা স্পর্শকাতরতা ছিল। এবং এখনও যে কোন কোন মহলে নেই তা বলা যায় না। সাহিত্যে যৌন প্রসঙ্গ তার ভেতর একটি। দ্বিতীয়টি সাহিত্যের উপজীব্য চরিত্র। শ্রমিক কৃষক বা প্রত্যক্ষ সংগ্রামী চরিত্র ভিন্ন অন্য চরিত্রকে তাঁরা প্রসন্ন মনে প্রগতিশীল হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন না।

এ দুটি ক্ষেত্রেই মানিক ছিলেন সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে। দেহ বা যৌন সমস্যাকে সাহিত্যে আনতে আদৌ আপত্তি ছিল না তাঁর। বহুক্ষেত্রে নিজেও তা এনেছেন। কিন্তু আপত্তি ছিল ব্যবসায়িক স্বার্থে তার বিকৃতি ঘটানতে। 'দেহ তো আর অশ্লীল নয়, দেহের চেতনাও নয়—ঐ চেতনার বিকৃতিই শুধু অশ্লীলতা।···যৌন বিপর্যয়েরও একটা বিপ্লবাত্মক সত্য থাকে—বিপ্লবটা বাদ দিলে যা অর্থহীন।'

এ প্রসঙ্গে তাঁর সবচেয়ে আপত্তি ছিল সেই সব লেখক প্রসঙ্গে, যাঁরা নিচুতলার জীবন অবিকৃতভাবে হাজির করার ভান করে সেই জীবনের যথেচ্ছ যৌনাচারকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। শোষণ ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে তাদের কঠোর জীবন সংগ্রাম ও যথার্থ পরিবেশ বাদ দিয়ে 'বাবুদের মনোরঞ্জনের' জন্য শুধু তাদের যৌন সম্পর্ককেই

সাহিত্যে প্রতিফলিত করে থাকেন। মানিক একে বলেছেন অশ্লীলতা, ন্যাচারালিজম্। 'চাষী মজুরদের দেহ নিয়ে সাহিত্যের হাটে ব্যবসা' চালানো।

সাহিত্যে প্রগতিশীলতার মাপকাঠি প্রসঙ্গেও তিনি ছিলেন মুক্ত-দৃষ্টি। শ্রমিক কৃষকের জীবনের পটভূমি ভিন্ন প্রগতিশীল সাহিত্য হয় না, অথবা, সম্মুখ যুদ্ধে প্রত্যক্ষ যোদ্ধা না হলেই প্রগতিশীল চরিত্র নয়—এমন কোন সংকীর্ণ বিচার ছিল না তাঁর। এ প্রসঙ্গে স্পষ্টই বলেছেন তিনি, 'চাষীর জীবনে, জনসাধারণের জীবনে, অত্যাচারী শক্তির সঙ্গে সামনা-সামনি সংঘর্ষ ছাড়া সংগ্রামের আর কোন রূপ নেই, অভিব্যক্তি নেই—এ তো সংগ্রামকেই অস্বীকার করা, সাময়িক একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনায় পরিণত করা। জীবনে ও চেতনায় ওতপ্রোত-ভাবে মিশে আছে বলেই সংগ্রাম সত্য।'

সাহিত্যবিচারে সংকীর্ণতার বিপরীত বিচ্যুতি অতি উদারতা প্রসঙ্গেও সতর্ক ছিলেন মার্কসবাদী মানিক। এবং একজন নির্মম সমালোচকও ছিলেন।

সাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমারকে নিয়ে এক সময় প্রগতিশীল মহলে বাগবিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছিল। কিছুদিন কলম থেমে যাবার পর অচিন্ত্যকুমার হঠাৎ তখন পূর্ববঙ্গের চাষীদের নিয়ে গল্প লিখতে শুরু করেছেন। পটভূমি চাষী-জীবন বলেই বোধহয় তাঁকে নিয়ে প্রগতিশীল মহলে কিছুটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিল। কবি সমালোচক বিষ্ণু দে 'পরিচয়' পত্রিকার একটি সমালোচনার উত্তরে অচিন্ত্যকুমারের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। এবং কিছুটা উষ্মার সঙ্গে বলেছিলেন, অচিন্ত্যকুমার হাকিম কিনা তা জানবার প্রয়োজন গল্প সমালোচনায় নেই, তিনি কৃষকসভার রিপোর্ট থেকে গল্প লেখেন কিনা তাও জানবার প্রয়োজন নেই।

একজন মার্কসবাদী হিসেবে মানিক এই অতি উদারতার বিরুদ্ধে ছিলেন। বিভিন্ন দিক দিয়ে এক দীর্ঘ আলোচনায় তিনি বিষ্ণু দে-র

মতের বিরোধিতা করেছিলেন। সে আলোচনায় কোন অবিনয় ছিল না। কিন্তু অনমনীয় দার্ঢ্য ছিল। অচিন্ত্যকুমার প্রসঙ্গে বিষ্ণুবাবুর মত খণ্ডন করে তিনি বলেছিলেন, 'অচিন্ত্যকুমার ভাল গল্প লিখতেন। আজ আরো ভাল গল্প লিখছেন। তাঁর পূর্ণতর বিকাশ হয়েছে। বিকাশ পরিবর্তন নয়। ধারা পরিপুষ্ট হওয়া ধারাবাহিকতাই। সমাজ-ভাঙা জর্জর বাংলার চাষী-জীবনের আসল বাস্তবতা কোথায় তাঁর সাহিত্যে ? কোথায় বাঁচার সংগ্রাম, যা তাদের হাসি-কান্না আনন্দ-বেদনা প্রেম-বিরহ নীতি-দুর্নীতি কলহ-বিবাদ একতা প্রতিরোধ—জীবনের সমস্ত অভিব্যক্তিকে প্রভাবান্বিত করেছে ?'

প্রগতি-সাহিত্য বিরোধী যে কোন প্রচারের বিরুদ্ধেও মানিক ঋজু-কণ্ঠ ছিলেন। প্রগতি-সাহিত্য প্রসঙ্গে বিরুদ্ধবাদীদের একটি প্রধান অভিযোগ, প্রচারধর্মীতা। এই কুৎসার জবাবে, এটা ত্রুটি জেনেও, পরিষ্কার জবাব মানিকের, 'বাংলা প্রগতি-সাহিত্য প্রচারধর্মী হয়েছিল জীবনবিরোধী মিথ্যা আদর্শবাদিতা থেকে আত্মরক্ষার জন্য। এটা ত্রুটি, বাস্তবজীবনের গতি-প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের অভাবেরই সুস্পষ্ট নিদর্শন। কিন্তু মিথ্যাকে তুলে ধরার চেয়ে সাহিত্যে প্রচারধর্মী হওয়া ঢের ভালো—সমাজ ও সাহিত্যের রূপান্তর গ্রহণের বিশেষ স্তরে প্রচারধর্মী হওয়াটাই তাই সাহিত্যের প্রগতির লক্ষণ এবং আশার কথা হয়ে দাঁড়ায়।'

কথাটায় জেদের সুর আছে। একে একজন প্রগতিশীলের আত্ম-সন্তুষ্টি বলে ভুল করারও অবকাশ আছে হয়তো। কিন্তু এ প্রসঙ্গে কোন আত্মসন্তুষ্টিরও ঘোর বিরোধী ছিলেন মানিক। বরং নিজের এবং নিজ শিবিরের আত্মসমালোচনায় তিনি ছিলেন আরো কঠোর, অকুণ্ঠ। তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ১৯৪৯ সালে অনুষ্ঠিত প্রগতি লেখক সংঘের চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলনে প্রদত্ত তাঁর ভাষণটি।

এই নির্মোহ নির্মম আত্মসমালোচনার শিক্ষাও তিনি পেয়েছিলেন মার্কসবাদ থেকে। নিজের সমগ্র জীবন ও সাহিত্যে মার্কসীয় জীবন-

দর্শনই অনুসরণ করার দীক্ষা নিয়েছিলেন মানিক। নিজেকে যথার্থই 'শ্রমিক শ্রেণীর একজন' করে তুলতে চেয়েছিলেন ; কারণ, শ্রেণী হিসেবে 'শ্রমিক শ্রেণীকেই ষোলআনা বিপ্লবী, সেরা মানুষ বলে' ভাবতেন তিনি।

তাই বোধহয় আত্মীয়স্বজনদের, 'তোর দাদা লেখাপড়া শিখে দু'হাজার টাকার চাকরি করছে, তুই কি করলি বলতো, মানিক ?— না একটা বাড়ি, না একটা গাড়ি—।' —এই সখেদ প্রশ্নের উত্তর দেবার মত কোন সহজগ্রাহ্য লৌকিক জবাব জমা রেখে যেতে পারলেন না মার্কসবাদী লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়! বরং পাঠকদের কাছেই সকৌতুকে প্রশ্নটা রেখে গেলেন, 'আপনারা কি বলেন ?'

জ্যোতিপ্রসাদ বসু

মানিকবাবুকে যেমন দেখেছি

ছাত্রজীবনের দুটি বন্ধু সম্পর্কে দুটি ঘটনা ভুলতে পারি না। কাজের ফাঁকে ফাঁকে আজও সে কথা মনে পড়ে যায়। কারণ, সেই বন্ধু দুটি দু'ধরনের নেশা আমায় ধরিয়ে দিয়েছিল। যে নেশা আজও ছাড়তে পারি নি। আর বোধ হয় পারবোও না।

অতীত থেকে সুদূর অতীতে ঘটনা দু'টি ঘটে। দু'টি ঘটনার মধ্যেই দুরন্ত চমক ছিল। অতীত থেকে সুদূর অতীতের পরম্পরাতেই তার উল্লেখ করছি।

তারিখটা ১৬ই আগষ্ট ১৯৪৭। আগের দিন মধ্য রাত্র থেকে ভারত স্বাধীন হয়েছে। অনেক দিন চাকরী করার পর হঠাৎ একদিন অবসর নিলে যেমন ফাঁকা-ফাঁকা লাগে, আমাদের মত রাজনৈতিক কর্মী ছাত্রদের মনে সেরকম একটা ভাব। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিয়ন ঘরে আমরা মিলিত হয়েছি। ভাবনাটা হল কিভাবে স্বাধীনতার আনন্দটা উপভোগ করা যায়। আবাল্য গান্ধীবাদী বন্ধু রফিক ফস্‌ করে আমার মুখে একটা সিগারেট ধরিয়ে দিল। স্বাধীনতার আস্বাদের মতই সিগারেটের আস্বাদ আমার সেই সর্বপ্রথম। কেশে কেশে হয়রাণ হয়ে গেলাম। চমকেও গিয়েছিলাম, এত বন্ধু থাকতে পরম গান্ধীবাদী ও কট্টর নীতিবাগিশ রফিকের এই কাণ্ড কারখানায়। কিন্তু, সেদিন না বুঝলেও আজ বুঝতে পারি রফিক আমার কত উপকার করেছিল। এখন, সিগারেটে আমার রীতিমত নেশা হয়ে গেছে। সিগারেটের মত এত ঘনিষ্ঠ বন্ধু আর কে আছে ?

এই ঘটনার কয়েক বছর আগেকার কথা। তখন ফার্স্ট ক্লাশে পড়ি (আমাদের সময় ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা ছিল)। ক্লাশের বন্ধু

রবি একদিন আমাকে অদ্ভুত এক প্রশ্ন করল, 'বনফুলের ছোটগল্প পড়েছিস্?' শুনে অবাক হলাম। স্কুল ম্যাগাজিনে বা হাতে লেখা ম্যাগাজিনে তখন আমার লেখা বেরোয়, ক্লাশের বাঙলা পরীক্ষায় আমার জুড়ি কেউ নেই। সে-হেন আমাকে সাহিত্য সম্পর্কে প্রশ্ন করল কিনা রবি ঘোষাল, যে রবি ঘোষাল ব্রহ্মদেশের আকিয়াব থেকে বছর চারেক আগে কোলকাতায় এসেছে এবং যে শুদ্ধ বাঙলা লিখতে পারে না বলে আমাদের ধারণা!

বনফুল কেন, হেমেন্দ্রকুমার বা শিবরাম বা মোটামুটি শিশু-সাহিত্যের চৌহদ্দির মধ্যে যার গতায়াত সেই আমি তখন কোনও আধুনিক লেখকের কোনও লেখা পড়ি নি। রবি আমায় 'বনফুলের ছোটগল্প' এনে পড়তে দিল। আমার সাহিত্যে নেশা ধরল। যে নেশা আজও ছাড়তে পারি নি। পারা যায় না।

বছর দু'এক বাদে রবি ঘোষাল এক কপি 'শনিবারের চিঠি' নিয়ে এসে হাজির করল। তাতে বনফুলের ভঙ্গিতে লেখা একটি ছোট গল্প প্রকাশিত হয়েছে। নাম 'ইনি আর উনি'। লেখক রবি ঘোষাল নিজে। স্বভাবতই আমি যেন কুঁচকে এতটুকু হয়ে গেলাম। তখনও কোনও জাত পত্রিকায় আমার লেখা বেরোয় নি। হিংসে হল। অবাকও হলাম। রবি বলল, 'এসব কিছু নয় রে। 'অতসী মামী' পড়েছিস? পড়লে বুঝবি গল্প কাকে বলে।'

সিগারেটের নেশা বলতে যেমন সব সিগারেট বোঝায় না, প্রত্যেকেরই একটা করে বিশেষ ব্র্যাণ্ড আছে, সাহিত্যের নেশাও তাই। মানিকবাবুর লেখা একটা ব্রাণ্ড। যার আমেজ আলাদা।

সেই মানিকবাবুর সঙ্গে যে একদিন ঘনিষ্ঠতা হবে, তা কল্পনাও করতে পারি নি। মানিকবাবুর বইয়ের মতই তিনি এত হাতের কাছে চলে এলেন কয়েক বছরের মধ্যেই।

এখানে বলে রাখা ভাল যে ছাত্রজীবনের শেষভাগেই আমি সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের সঙ্গে বড় বেশি জড়িয়ে পড়েছিলাম। বিভিন্ন

পত্র-পত্রিকায় আমার লেখা তখন বেরোচ্ছে। নামকরা সাহিত্যিকদের সঙ্গে মেলামেশা করি বলে আমার তখন প্রচুর অহঙ্কার। গল্পের ফাঁকে প্রেমেনদা একদিন বললেন, 'লিখতে গেলে আগে জানতে হয় কোথায় থামতে হবে। ঠিক জায়গায় থামতে পারা হল আর্ট।' আর একদিন বললেন, 'মানিক লেখে আমাদের জন্যে!' আমাদের মানে লেখকদের।

ক্রমশঃ বুঝতে পারলাম মানিকবাবু কেন লেখকদের লেখক। কারণ, তিনি থামতে জানতেন। এখানেই তিনি জীবনশিল্পী। কারণ, জীবন একদিন থেমে যায়। মানিকবাবুর লেখায় সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য যা আমার চোখে পড়েছে তা হল যে তিনি তাঁর কোনও লেখার মধ্যে উপদেশ দেন নি (যে পীড়ায় আমাদের লেখকদের বহু লেখাই পীড়িত। যেখানে পড়ার নেশা ছুটে যায়)। কারণ, মানিকবাবু ঠিক জায়গায় থেমে যেতেন।

অথচ, মানুষ-মানিকবাবুর মধ্যে কত-না উচ্ছলতা দেখেছি। তাঁর কথা বলার মধ্যে কেমন একটা পৌরুষ ছিল, যেমন ছিল তাঁর সুদীর্ঘ চেহারায়। যদিও আর্থিক অনটনে কতবার তাঁকে বিপর্যস্ত দেখেছি। বরানগরের একতলা বাড়িতে যখন তিনি থাকতেন তখন বারবার তাঁর কাছে আমায় যেতে হয়েছে নানা কাজে। কখনও কখনও তাঁকে অসংযমী অবস্থায়ও দেখেছি। কিন্তু খুব সহজ ও সরলভাবে তিনি সব অবস্থা মানিয়ে নিতেন।

অত্যন্ত সাধারণ মানুষের মতই অনাড়ম্বর বেশভূষায় তিনি আসতেন আমাদের ক্যালকাটা বুক ক্লাবের আড্ডায়। বিশেষতঃ শনিবারের সন্ধ্যায়। আজ বলতে কুণ্ঠা নেই, সামান্য কয়েকটি টাকাও কতবার চেয়ে নিয়েছেন। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে হাত তুলে দেখাতেন পাঁচটি আঙুল। ইঙ্গিতটা খুবই স্পষ্ট। আজ এই শনিবারের সন্ধ্যায় তাঁর স্মৃতিচারণ করতে বসে মনে হচ্ছে এখনই হয়ত দরজায় একটি সুদীর্ঘ ও ঋজু দেহের ছায়া পড়বে। শুনতে পাব হয়ত—'জ্যোতিবাবু, দশটা··· পাঁচটা···!' দারিদ্র্যের গ্লানি তাঁকে স্পর্শ করেনি, প্রাণের প্রাচুর্যে

তা ধুয়ে মুছে গিয়েছিল। কত সহজে কত নিকটে আসতে পারতেন তিনি মানুষের। মানুষকে নিকট থেকে দেখা, তাঁর রচনার ছত্রে ছত্রে প্রমাণিত হয়ে আছে।

চালচলনে যতই অগোছাল মনে হোক না কেন, তাঁর সাধনার প্রতি মানিকবাবুর নিষ্ঠা মনে রাখবার মত। লেখা ছিল তাঁর প্রাণ। লেখা ছাপার সময় একটি শব্দের এদিক ওদিক হয়ে গেলে তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হতেন, তাঁর মুখে একটা যন্ত্রণার ছাপ ফুটে উঠতে দেখেছি। সময়টা ১৯৫২ বা ১৯৫৩ সাল হবে। গ্রন্থপ্রকাশনায় আমি তখন ঘোরতর লিপ্ত। মানিকবাবুর একটি অনন্যসাধারণ উপন্যাস 'আরোগ্য' আমার কাছে ছাপা হচ্ছে। যেদিন শেষ ফর্মাটি ছাপা হবার কথা, সেদিন সন্ধ্যে পর্যন্ত ছাপাখানা থেকে ছাপা শেষ হওয়ার খবরটি না পাওয়ায় একটু বিচলিত বোধ করছিলাম। পরে ছাপা না হওয়ার কারণ জেনে বিস্মিত হয়ে গেলাম। রচনাটির শেষদিকের একটি পঙ্‌ক্তি সম্পর্কে মানিকবাবুর সন্তুষ্টি হচ্ছিল না। যদিও, ফর্মা আটকে না রেখে তিনি প্রুফ দেখে ছেড়ে দিয়েছিলেন আগের দিন। কিন্তু অস্বস্তিতে তাঁর প্রায় ঘুম হয় নি সে রাতে। পরের দিন সকালে ছাপাখানা খোলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছেন। ছাপার জন্য ফর্মা তখন মেশিনে তোলা হয়ে আঁটা হচ্ছে। তিনি মেশিনম্যান ও কম্পোজিটারদের রাজী করিয়ে ফর্মা নামিয়ে সেই অমনোমত পঙ্‌ক্তিটি পরিবর্তন করে তারপর আবার ছাপার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। ফর্মা মেশিন থেকে নামিয়ে নেওয়ার পর অন্য কাজ চাপানো হয়েছে এবং সেজন্য ঐ দিন ঐ ফর্মা আর ছাপা সম্ভব হয় নি।

মানিকবাবুর জীবিকা নির্ভর করতো লেখার ওপর। কাজেই, প্রকাশকদের সমৃদ্ধির সঙ্গে তাঁর জীবনযাত্রার অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক থাকবার কথা। কিন্তু তা সত্ত্বেও সাহিত্যকে তিনি অন্য চোখে দেখতেন। একটা ব্যক্তিগত কথা বলে তার প্রমাণ দিতে চাই। গ্রন্থ প্রকাশনায়

জড়িয়ে পড়ায় সাহিত্য রচনা থেকে আমায় সরে আসতে হয়েছিল। সাহিত্য জগতে আমার মত অতি ক্ষুদ্র সাহিত্যকর্মীর থাকা না থাকায় কিছু যায় আসে না। কিন্তু মানিকবাবু সেটা বরদাস্ত করতে পারতেন না। বলতেন, 'পাবলিশার হতে গিয়ে লেখাটা নষ্ট করলেন? এ সব বন্ধ করে দিন মশাই।' প্রসঙ্গত মনে পড়ে যে এ ধরনের মন্তব্য আর একজন দিকপাল লেখকের মুখে শুনেছি কয়েকবার। সেই অগ্রজ-প্রতিম সুহৃদ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকর্মী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় আর আমাদের মধ্যে নেই। মানিকবাবুর সঙ্গে নারাণবাবুর নাম আমার মনে একই সঙ্গে জাগরিত হয় এই কারণেই যে মানিকবাবুর রচনার মূল্যবোধে নারাণবাবুর কাছ থেকে কত সাহচর্য পেয়েছি।

তবে, মানিকবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের জন্য কথাশিল্পী শ্রীমনোজ বসুর কাছে আমার ঋণ স্বীকার করতে হয়। আজ থেকে প্রায় ২৩।২৪ বছর আগে কোলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন সাহিত্যিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার নিয়ে একটি ধারাবাহিক কথিকা প্রচারিত হয়। সেই আলাপের বিষয়বস্তুর সঙ্গে সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত পরিচয় যুক্ত করে একটি মনোজ্ঞ সংকলন প্রকাশ করেন মনোজদা। ঐ সংকলন সম্পাদনা করার ভার দিয়েছিলেন তিনি আমার ওপর। সেই সম্পর্কে আমি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সান্নিধ্যে প্রথম আসি। তখনই জানতে পেরেছিলাম যে প্রবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক জনৈক কলেজ-ছাত্র খেলার ছলে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নামক ছদ্মনামে একটি গল্প লিখে সুনাম পেয়েছিলেন, যে গল্পের নাম 'অতসী মামী'। সেইটেই তাঁর প্রথম রচনা। বৃত্তান্তটি শোনবার পর আমার আবার চমক লেগেছিল, যেমন লেগেছিল কয়েক বছর আগে আকিয়াবের রবি ঘোষাল আর নীতিবাগিশ রফিকের কথায় ও আচরণে। এবার অবাক হয়েছিলাম এই ভেবে যে তবে আর আমরা কেন লিখি বা লিখছি বছরের পর বছর! এবং আমার নেশা লেগেছিল মানিকবাবু সম্পর্কে!

মানিকবাবুকে নিয়ে এইটুকুই আমার 'মিহি ও মোটা কাহিনী'।

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা

আধুনিককালের বাংলা সাহিত্যের এক শক্তিশালী ঔপন্যাসিক ও জাত কথাশিল্পীর আগে 'কবি' পদটিকে বিশেষণ হিসেবে ব্যবহার করে যদি বলা যায়—কবি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তবে নিয়মিত সাহিত্য পাঠকেরও একটু বিস্ময় জাগবে। সম্প্রতি শ্রীযুগান্তর চক্রবর্তী সম্পাদিত 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা' শোভনদৃশ্য গ্রন্থখানি প্রকাশিত না হলে অনেকেরই কাছে এই বিস্ময় অবিশ্বাসের পর্যায়ে বদ্ধ থাকতো। ভূমিকায় তাই সম্পাদক মশাই যথার্থই বলেছেন যে আজ যারা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রধান পাঠক, তাদের কাছে তাঁর কবিতার প্রথম প্রকাশ তাই প্রায় আবিষ্কারের মতো গুরুত্বপূর্ণ হতে বাধ্য।

আবিষ্কারের অর্থ সম্পাদক মশাই যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—তার সঙ্গে সকলে একমত হয়তো হবেন না, কারণ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতার সম্যক্ পরিচয় না পেলেও গদ্যশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে উপলব্ধি করার ব্যাপারে কোথাও বাধে না। গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে মানিকবাবুর কোথায় ঔজ্জ্বল্য, একাকীত্ব, স্বকীয়তা, অমরত্ব, অনিবার্যতা, বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্থান ও অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য কোথায়—এ বিষয়ে আজ আর কারুর দ্বিমত নেই, এমন কি বিশ্ব-সাহিত্যিক হিসাবে তাঁর স্থান কোথায় হওয়া উচিত—তাও সকল সচেতন পাঠকের ধারণার বাইরে নয়। সুতরাং গদ্য শিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে উপলব্ধি করতে হলে তাঁর কবিতার পূর্বাহ্ন-পরিচয় আবশ্যক—একথা শ্রদ্ধার সঙ্গেই সরিয়ে রাখা যায়। তাই সম্পাদক মশায়ের—"মানিক বন্দ্যো-পাধ্যায়ের কবিতার পাশ কাটিয়ে আজ তাঁর সাহিত্যের মৌলিক

অভিজ্ঞতা পর্যন্ত বুঝে নেওয়া অসম্ভব হবে"—এই বক্তব্যটি সর্বজনগ্রাহ্য নাও হতে পারে।

তবু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যে কবিতা লিখতেন, তাঁর কবিসত্তাও সৃজনশীল কাব্য রচনা করেছে—এটি নিঃসন্দেহে এক মূল্যবান আবিষ্কার, এবং গল্পলিখিয়ের প্রথম জীবনে প্রস্তুতিপর্বে হাত মক্স করার মতো দু'একটি কবিতা লেখার মতো ব্যাপার যে মানিকবাবুর নয়, তা বোঝা যায়, এবং কবিতাগুলি পড়ার পর তাঁর কবিত্ব সম্পর্কে কোনো সন্দেহ জাগে না ; বরং উচ্চস্বরে ঘোষণা করতে হয় যে তিনি কবিও বটেন। প্রাথমিক পর্যায়ের কবিতাগুলি বাদ দিলে দেখা যাবে মানিকবাবুর মধ্যে একজন জীবন-সচেতন কবির অস্তিত্ব ছিল। এদিক থেকেই মনে হয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতার প্রকাশ পাঠকের কাছে এক নতুন আবিষ্কার।

তবু তাঁর এই কাব্যগ্রন্থটি পাঠ না করেও একথা অসংকোচেই বলা যায় যে গল্পশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৌলিক সত্তায় কোথায় যেন একজন কবি তাঁর সাহিত্যিক লেখনীকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন ; 'দিবারাত্রির কাব্য' উপন্যাসের কবিত্বধর্ম লক্ষ্য করে একথা বলছি না, এটি লেখকের অপেক্ষাকৃত নবীন বয়সের লেখা, এখানে তারুণ্যের ধর্ম বর্তমান, কবিত্ব থাকাই স্বাভাবিক। পুতুল নাচের ইতিকথা, জননী, সহরতলী, ছন্দপতন, স্বাধীনতার স্বাদ প্রভৃতি সব গ্রন্থেই ঔপন্যাসিকের মধ্যে একটি কবি-মন উপলব্ধি করা যায়। রূঢ় বাস্তব জীবনের মাল-মশলা নিয়ে তিনি কারবার করতেন ঠিকই, কিন্তু 'আপন মনের মাধুরী' মিশিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্যকে কাব্য-ধর্মে তথা সাহিত্যীয় উৎকর্ষে মণ্ডিত করতেন। তাঁর গল্প-উপন্যাসের বেশ কিছু চরিত্রের মধ্যেও কবিত্বের আরোপ আছে।

এই কারণেই বলতে পারি যে ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কবি-ও। তবে কবিতার চর্চা তিনি করতেন, এ খবরটা নিশ্চিতভাবে জানা যায় নি। এদিক থেকে সাম্প্রতিক এই গ্রন্থ প্রকাশ মানিকবাবুর

পাঠকের পক্ষে সত্যিই আবিষ্কার, এবং প্রকাশ-কর্তারাও ধন্যবাদ ভাজন।

কবিতা লেখা সম্পর্কে মানিকবাবুর হয়তো কিছু সংশয় থাকবে, তাই তিনি কবিতাগুলি প্রকাশের জন্যে ব্যস্ত হন নি; নিতান্ত চাপে না পড়লে দু'একটি কবিতা পত্রস্থ-ও করতেন না। আমাদের দেশে, বাংলা সাহিত্যে সার্থক ঔপন্যাসিক যে সত্যকার কবিও—এ নজির প্রচুর আছে, এবং মানিকবাবুর সমসাময়িক কবি-সাহিত্যিকের অনেকেই ত' রয়েছেন। এঁদের মোট সংখ্যায় আরেক জনের নাম যুক্ত হতেও ত' পারতো, কিন্তু মানিকবাবুর কিছু সঙ্কোচ ছিল—তাঁর কবিতাগুলি পাঠক সমাজ কিভাবে নেবে ও কোন দৃষ্টিতে দেখবে। সঙ্কোচের কারণ আমার মনে হয় কাব্যের বিষয়বস্তু নিয়ে নয়, প্রকরণ সম্পর্কে তিনি সংশয়ান্বিত হতে পারেন। তাই তিনি নিজেকে কবি বলতে কুণ্ঠিত হতেন।

একথা ঠিক যে 'মেজর পোয়েট' বলতে যে ছবি আমাদের মনে জাগে, মানিকবাবুর কাব্য পাঠে তাঁকে আমরা তেমন আখ্যায় ভূষিত করতে পারি না, তবে একথাও ঠিক যে যথার্থ কবির লক্ষণগুলি তাঁর কবিতায় পুরোমাত্রাতেই উপস্থিত আছে। এখানে সে সম্পর্কেই আমি দু-চার কথা বলবো।

'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা' গ্রন্থে তাঁর খাতা থেকে তিরিশটি কবিতা গৃহীত হয়েছে, শিরোনামহীন কবিতা হিসেবে আরো সতেরোটি কবিতা এতে স্থান পেয়েছে। এই সাতচল্লিশটি কবিতায় পরিণতির চিহ্ন আছে, সেখানে কবি-মনের প্রত্যয় ও পরিচয় স্পষ্ট এবং উচ্চকিত। এ ছাড়া গ্রন্থের শেষাংশে আরো চোদ্দটি কবিতা 'প্রাথমিক কবিতা' হিসেবে তথা উপসংহার হিসেবে গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে, বোধহয় কবি-মনের প্রস্তুতি-ভূমির মৌল খোঁজ-খবর দেবার উদ্দেশ্যেই গ্রন্থে স্থান করে দেওয়া হয়েছে। কবির ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা বোঝার

পক্ষে এগুলির গুরুত্ব আছে, কিন্তু এই অংশের কবিতাগুলির মধ্যে তেমন প্রতিভার স্বাক্ষর নেই। বিশেষ করে তাঁর পনেরো ষোলো বছর বয়সের লেখা কবিতা দুটি 'দিগ্বিজয়ী' এবং 'নাস্তিকের কথা'য় বিন্যাসের দিক থেকে পূর্বসূরীর প্রভাব লক্ষণীয়। বলা বাহুল্য, বালক কবির লেখায় এই প্রভাব থাকাই স্বাভাবিক। এমন কি, এই পর্যায়ের 'পত্র' কবিতাটিতেও কবির রোমান্টিক মানবিকতার প্রতি ঝোঁক দেখা যায়; এখানেও কবি গতানুগতিক পথকে ছাড়িয়ে যেতে পারেন নি। প্রেম প্রীতি ভালবাসা এবং ফুল পাখি আকাশের কথা বলা, ছন্দবিন্যাস ও ভাষা ব্যবহার—সব দিক থেকেই কবি সাধারণভাবে প্রচলিত পথ ও মতের দিশারী গতানুগতিক রোমান্টিক ধ্বজাধারী বলেই আমরা ভাবতে পারি। এই কবিতা থেকে কয়েক পঙ্‌ক্তির উদাহরণ দিলেই পাঠকও বুঝবেন—

> সঙ্গীতেরে আজো ভালোবাসি ;—আজো মোর সেই বাঁশী বাজে,
> আজো আমি পারি নাই কাটাইতে স্বভাবের মোহ
> আজো শান্ত হয় নাই চঞ্চলিত শোণিত প্রবাহ—
> অজানার সেই ডাক আজো মোর অন্তরেতে রাজে!

কিম্বা.

> নিত্য সন্ধ্যা আসে, নিত্য আনে আপনার মায়া,
> নিত্য তবু নব নব রহস্যের দানে সে আভাষ,
> তারকার দীপ জ্বালি অন্তহীন বিরাট আকাশ!
> সরসীর কালো জলে দোলে সেই তারকার ছায়া!

এই 'প্রাথমিক কবিতা' অংশে 'পাঁকের ফুল' নামে প্রেমের কবিতাও গ্রন্থে স্থান পেয়েছে, সেটি তদানীন্তন কালের উপযোগী করে লেখা, প্রচলিত তত্ত্ব, তথ্য, ছন্দ, অলঙ্কার, গতি বা বিন্যাস—সবই তাৎকালিক। এই পর্যায়ে 'যৌবন' নামে যে কবিতাটি আছে, সেখানেও কাঁচা হাতের ছাপ, ছন্দেরও ঈষৎ গণ্ডগোল রয়েছে।

এই পর্যায়ের কবিতাগুলি পড়ার পর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে

যথার্থ কবি বলে স্বীকৃতি দিতে সকলেই কুণ্ঠিত হবেন, এক রাজ্যের বড় শিল্পী অন্য এলাকায় অবসর বিনোদনের জন্যে যেমন কাজকর্ম করেন, মনে হতে পারে—মানিকবাবু বোধহয় গদ্যকর্মের মাঝে মাঝে রিলিফ হিসেবে কবিতা লিখেছেন। কিন্তু তাঁর কবিতার খাতা থেকে নেওয়া কবিতাগুলি—যা তাঁর কাব্যগ্রন্থের গোড়ার দিকে সংগ্রথিত—পড়লে বোঝা যাবে, কবিতার রাজ্যেও তিনি যথার্থ শিল্পী ছিলেন। এগুলিতে তার কাব্যভাষা তাৎকালিক চালুভাষা থেকে স্বতন্ত্র, বক্তব্য তাঁর নিজস্ব, গতানুগতিক পথে তা তিনি উপস্থাপিতও করেন নি। বহুক্ষেত্রেই তিনি তাঁর বক্তব্যকে বলিষ্ঠভাবে হাজির করেছেন। কিন্তু এই অংশে মাত্র তিবিশটি ছোট বড় ও মাঝারি রকমের কবিতা আছে, 'শিরোনামহীন কবিতা' বলে যে সতেরোটি কবিতা আছে, সেগুলির মধ্যেও পরিণত কবিমনের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। সুতরাং মানিকবাবুর কবিতার আলোচনা তাই সামনের দিকে গ্রথিক কবিতা-গুলির মধ্যেই নিবদ্ধ থাকবে। বালক-কবির অপরিণত কবিতাগুলি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে শুধুমাত্র কৌতূহলী বা গবেষক পাঠকদের জন্যেই আলাদা এলাকাভুক্ত বলে চিহ্নিত হোক। রত্নসন্ধানে আমাদের সেখানে যাবার কোনো দরকার নেই।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিঃসন্দেহে সমাজসচেতন শিল্পী। গদ্যের ক্ষেত্রে এ বিষয়ে তাঁর সকলের ভালবাসার রাজমুকুট তাঁর শিরোপা, কিন্তু কবিতার ক্ষেত্রেও তিনি সর্বদা সমাজসচেতন। তিনি বিশ্বাস করতেন গতানুগতিক পথে চলে পথযাত্রীর সংখ্যাধিক্য ঘটানোর কোনো দরকার নেই, তাই প্রাথমিক পর্যায়ের কবিতাগুলির প্রকাশ-সম্পর্কে কখনো ভাবতেনই না। তাঁর পরিণত শিল্পসৃষ্টিতে উত্তরণই তাঁর কবিতা সৃষ্টিত সাফল্যবহন করে আনে।

সমাজসচেতনতার তীব্র উপলব্ধির অনেকখানিই কাব্যরাজ্যের এক বিস্তীর্ণ এলাকার মধ্যে দেখা যাবে। সেই উপলব্ধির এক মোটা

ভগ্নাংশ আবার রাজনৈতিক ব্যঙ্গবিদ্রূপে ভরা। উনিশশো সাতচল্লিশ থেকে কংগ্রেসের হাতে দেশের শাসনভার এসেছে। কবির জীবনান্ত কাল পর্যন্ত কবি দেখেছেন—স্বাধীনতা দেশের সকলের কাছে উপলব্ধ হয় নি, বহুলোক স্বাধীনতাকে প্রত্যক্ষগম্য বলে ভাবতেও পারছে না ; এই কারণে স্বাধীনতার প্রতি অবজ্ঞায় মানিকবাবুর মন ভরে গেছে। তাই তিনি এই স্বাধীনতার প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ হেনে কটাক্ষ করেছেন এবং বীতশ্রদ্ধ হয়ে কাব্য রচনা করেছেন। 'ছড়া', 'স্বাধীনতার স্বাদ থেকে', 'সুন্দর', 'গুড়ের ভাঁড়', 'ডিসেম্বর', শিরোনামহীন কবিতার চার নম্বর কবিতা প্রভৃতি পড়লেই তা বোঝা যাবে।

'ছড়া' কবিতাটি ১৯৫৩ সালের এক পয়সা ট্রামভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে কোলকাতায় যে প্রতিরোধ আন্দোলন হয়েছিল, তারই পরিপ্রেক্ষিতে লিখিত হয়েছে। দৈনিক 'স্বাধীনতা' কাগজে এটি প্রকাশিতও হয়েছে, সম্পাদক মশায়ের কাছ থেকে এ তথ্য আমরা পাই। তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার ব্যঙ্গ এখানে আছে—সেটি লক্ষ্য করার বস্তু। অথচ আন্দোলনের স্পষ্ট উল্লেখ নেই, অত্যাচারিদের প্রতি মমত্ব আছে ঃ

আমরা শুনেছি তার
পুলিসী ঝঙ্কার,
অনেক অনেক বার—
সাদা রাজা কালো দাস
মিলে যিনি অবতার,
স্বাধীনতা হীনতার !
বার বার ফোস্কায়
কড়া পড়ে সেরে যায় ;—
লাঠি ও গুলির ঘায়
জনতার প্রাণটায়
মোটে আর ব্যথা নেই

ভীরুতার ফোস্কায়,

কড়া পড়া একতায়।

নীচে যে কবিতাটি উদ্ধৃত করছি—সেটি 'স্বাধীনতার স্বাদ' উপন্যাস থেকে উৎকলিত। একটি কারখানায় ধর্মঘট হয়েছে, এবং তার ফলশ্রুতি হিসেবে সেখানে গুলি চলেছে। ঐ উপন্যাসের একটি কবি-চরিত্র এই কবিতাটি লিখেছে,—

কান ঘেঁষে গেল বুলেটটা, কি আওয়াজ!
কানে যেন কোটিখানেক বিঁধলো সরু ছুঁচ!
প্রাণটা যেন ছুঁলো হঠাৎ কোটি কোটি প্রাণ।
তীক্ষ্ণ ইশারায়।
নক্ষত্রের মতো।

মনের আকাশ জুড়ে জীবনের অপলক চাওয়া—গুলি ছোঁড়ার ঘটনার মাধ্যমে ধর্মঘটীদের সম্পর্কে কবির সজ্ঞানতা প্রকাশিত হয়েছে, এবং সংগ্রামশীল জনতার প্রতি কবি সজাগ হয়ে উঠলেন—সেই ঘোষণা কিন্তু যথার্থ কাব্যময় হয়ে উঠেছে,—'প্রাণটা যেন ছুঁলো হঠাৎ কোটি কোটি প্রাণ। তীক্ষ্ণ ইশারায়'—বোঝা গেল মানিকবাবু সত্যিই কবিপ্রাণ।

রেশনের চালের গুণাগুণ সম্পর্কে ধারণা এবং অভিজ্ঞতা আমাদের সকলেরই। সেই চালের ভাতকে নিয়ে এবং সেই ভাত খেয়ে বেঁচে-থাকা মানুষকে নিয়েই 'সুন্দর' কবিতা সেখানে তীক্ষ্ণ নিপুণ ব্যঙ্গ ছুঁড়ে দিয়ে কবি সহজভাবে অনায়াসেই লেখেন—

বাপটা মরল, ভাইটাও,
বোনটা ভগবান পেয়েছে টাকা-ওলা গান্ধী-ভাঙানো ব্যবসায়।
ছেলেটা মরেছে, মরেছে!
শুকনো মাই বলে ছেলে বুঝি মরেছে?

সত্যি, সাধারণ মানুষের জীবনে এর চেয়ে সুন্দর আর কি থাকতে পারে?

'ডিসেম্বর' কবিতার মধ্যে ব্যঙ্গ আছে, কিন্তু তার চেয়ে শীতের তীব্রতা ও নগ্নতার আশ্রয়ে মানুষ নামের যে জীবগুলি 'মরণ-ধোঁয়ার কুয়াশা'য় কুঁকড়ে পড়ে আছে, তাদের করুণ অসহায় অবস্থার কথা বলতেই কবি সহানুভূতিপূর্ণ হয়ে উঠেছেন, বেদনা এসে ব্যঙ্গের ঝাঁঝকে ঢেকে দেয়।

দুটি ব্যঙ্গ কবিতার বিশেষ উল্লেখের প্রয়োজন আছে, অন্ততঃ মানিকবাবুর কবি-মন বোঝাবার পক্ষে এ দুটি অপরিহার্য। এগুলিতে ব্যঙ্গ আছে, বেদনা আছে, স্বাধীনতা নামক এক দুর্বোধ্য সংজ্ঞা দিয়ে মানুষকে ভ্রমাত্মক মাদকতায় ভুলিয়ে চালাকি করার কূট কৌশলের প্রতি ইঙ্গিত আছে—আর এতসব আছে কবিতার ছদ্মবেশে। শুধু রাজনৈতিক বুকনি আউড়ে পোষ্টার-কাব্য করার মতো উচ্চকণ্ঠ নেই। আমি 'গুড়ের ভাঁড়' এবং শিরোনামহীন পর্যায়ের 'চার নম্বর কবিতা'র কথা বলছি।

ভিক্ষে করা গুড়ের ভাঁড়ে পিঁপড়ে অগণন—
রইল মধু হুল উচানো মৌমাছিদের চাকে,
স্বাধীনতার জীবন সুধারস,
শূন্য গুড়ের ভাঁড়েই লোভী পিঁপড়ে হল খুশী।
সবার কাছেই সস্তা যেন
ভাঁড় চেটেই জীবনটাকে মিষ্টি করার সাধ।
ফুলেল তেলের গন্ধ ভয়ানক
জীবনদীপের শিখা নিবু নিবু,
সলতে তারি মোটা,
চরকা থেকে তৈরী করা সুতো।

এই 'গুড়ের ভাঁড়' কবিতাটি মুখ্যতঃ রাজনৈতিক চিন্তার, কংগ্রেসী শাসনের প্রতি কটাক্ষ করে লেখা। শুধু কংগ্রেসী শাসনের প্রতি কবির যে বীতরাগ—তা নয়, কংগ্রেসীদের দরজায় কৃপাপ্রার্থী উচ্ছিষ্টলোভী প্রাণীদের প্রতিও কবির গভীর বিতৃষ্ণা প্রকাশিত হয়েছে।

চার নম্বরের কবিতাটিতে কিছু অসংলগ্ন চিত্র আছে, কিন্তু তথাকথিত স্বাধীনতার পর সাধারণ নরনারীর বেদনাবিহ্বল জীবনের কথাও আছে, তবে তা ইঙ্গিতে আভাসিত। সাধারণ মানুষের ভাগ্য যে বিড়ম্বনাময়—সে কথা কবি একবারও বিস্মৃত হন নি। তিনি বলেছেন—

দুর্বাঘাসের সবুজ অমরতাই ফুল হয়েছে প্রাণের জিজ্ঞাসা,
তাতে কি মিষ্টি মাটির গন্ধ।
মূকের বুকের বুলেটের ছেঁদাতে যে ভাষা উচ্ছল গল গল রক্তে,
কত তাজা তার বর্ণনা পাকা ধানের হলুদ শীষের সাথে
উঠতি সূর্যের লাল রোদের ভালবাসা।

একথা সত্য যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আসল কবিতাগুলি রাজনীতির ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে রচিত হয়নি। তাঁর মানসধর্মই মানুষের দুঃখ বেদনাকে তির্যক দৃষ্টিতে দেখে তা প্রকাশ্যে হাজির করা। এ কাজ গল্পকারের পক্ষে যতটা সহজসাধ্য, কবির পক্ষে ততটা অনায়াসসাধ্য নয়ঃ তবু সূক্ষ্মতা এবং তীক্ষ্ণতার মাধ্যমে মানিকবাবু কবিতায় এই মানসিকতা ব্যক্ত করেছেন। দু-একটি কবিতায় তিনি আশ্চর্যজনকভাবে সংক্ষিপ্ততার মাধ্যমে অনেকখানি বক্তব্য প্রকাশ করেছেন—এ কাজ নিঃসন্দেহে গদ্যশিল্পী অপেক্ষা কবির পক্ষেই বেশী সম্ভব। 'চা' শীর্ষক দু'পৃষ্ঠাব্যাপী কবিতাটির প্রথম এবং শেষ পঙ্‌ক্তি হচ্ছে—'লণ্ডনকে ঘুষ দিয়ে আমরা চা পান করি'। সামান্য এই এক লাইনের মধ্যে চা-কোম্পানীর বিদেশী মালিকানা, আমাদের শ্রমের ফসলে তাদের শ্রী ও ঋদ্ধি, আমাদের দেশের উৎপাদনে তাদের অন্যায় ও অকারণ ভোগ-দখলের লুব্ধতা—এবং এসব স্বীকার করে নিয়ে বিদেশী মালিককে শ্রম ও অর্থ দান করে চা খেতে আমরা যে কতদূর ব্যগ্র—তা ইঙ্গিতময়তার মাধ্যমে কবি সহজেই ব্যঙ্গ করে বলতে পেরেছেন—লণ্ডনকে ঘুষ দিয়ে আমরা চা পান করি।

আগেই বলেছি—আবারও বলি রাজনীতি সম্পর্কিত উচ্চগ্রামের

ঘোষণাদীপ্ত কবিতা লিখতে বসেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু পোষ্টার-সাহিত্য লেখেন নি, কবিতাই রচনা করেছেন,

'বুড়ো সন্ত্রাসবাদী' কবিতাটি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়ঃ

আন্দামানের বনে তুমি ঘুমোওনি একরাশি বছর।
তোমার হৃদয়খনির পাথুরে দেশপ্রেমের সোনাকে
তোমারি চিন্তায় পুড়িয়ে খাঁটি করেছে মার্কস, লেনিন
আর স্ট্যালিন।
চাঁটগাঁ থেকে তোমায় তাড়িয়ে দিয়েছে চাঁটগাঁর মালিক?

আগ্নেয়গিরির পুরানো খনি চাঁটগাঁ,
...পাহাড়ের বিস্ফোরণে ধরা পড়েছিল,
সোনায় ঠাসা সে খনি, ইস্পাতের মতো তীব্র সোনা।
চাঁটগাঁ থেকে তোমায় তাড়িয়ে দিয়েছে চাঁটগাঁর মালিক?

এমন কি, মানিকবাবুর 'সুকান্ত ভট্টাচার্য' কবিতাটিতেও স্পষ্ট কথার চড়া সুর রয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও কবিতার ঘাটতি হয় নি। কবি বলেছেন—

আমরা রোদ এনে দেব ছেলেটার গায়ে,
আমরা চাঁদা তুলে মারব সব কীট।
কবি ছাড়া আমাদের জয় বৃথা।
বুলেটের রক্তিম পঞ্চমে কে চিরবে
ঘাতকের মিথ্যা আকাশ?
কে গাইবে জয়গান?
বসন্তে কোকিল কেসে কেসে রক্ত তুলবে
সে কিসের বসন্ত!

কত সহজেই তিনি রাজনীতিকে কাব্যের আঙ্গিনায় এনে ফেলছে

পারতেন, এবং বক্তব্যকে কবিতার আঙ্গিকে, ছন্দ ও অলঙ্কারে সাজিয়ে হাজির করতেন। 'শিরোনামহীন কবিতা' পর্যায়ের এগারো নম্বর কবিতাটি এই বক্তব্যের সাক্ষী। কবি সেখানে বিপ্লবের চাষ করার আহ্বান জানিয়েছেন। ধান পাট ভুট্টার চাষ করা হয়েছে, ললিতার ঠোঁটের পেলবতা বা গর্ভসঞ্চারের চাষও কম হয় নি, বিশ্বাসঘাতক পুরুষের জীবনচর্চার চাষও হয়েছে। কবি ডাক দিচ্ছেন—

> সাপিনীর বিষদাঁত,
> মাটিকে কামড়াক,
> হরণে বলাৎকারে আত্মহত্যার মতো তুমি তো ব্যর্থ, সমাপ্ত!
> এবার চাষ করো,
> গজাও!
> গজাও বিদ্রোহ,
> রাশি রাশি,
> সবাই বাঁচুক—বিদ্রোহে।

যেহেতু বিষয়বস্তু কঠোর, তাই কবির ভাষাও স্নিগ্ধ কোমলতা এবং রোমান্টিক পেলবতা থেকে একটু দূরে সরে গেছে, বরং রূঢ়ই বলা যায়। বহুক্ষেত্রে ইঙ্গিত ও ব্যঞ্জনায় বললে যা কাব্যময় হতো, কবি নির্মম গদ্যের ছকে তা ব্যক্ত করায় ভাষার দিকে সুষমার কিছু ঘাটতি পড়েছে। তবে কবি যেখানে ফলশ্রুতি হিসাবে জ্বালা সৃষ্টি করতে চেয়েছেন, সেখানে তিনি সার্থক হয়েছেন। 'প্রথম কবিতার কাহিনী' কবিতাটি ধৈর্য নিয়ে পড়লেই আমরা তা বুঝতে পারবো। কবিতার পেলব কুসুম মোলায়েম পোশাকের প্রতি কবির তীব্র অনীহা এবং কঠোর ব্যঙ্গ ধ্বনিত হয়েছে। এই কবিতাটি কবির আত্ম-কাহিনীর কিছু কথা নিয়ে রচিত বলা চলে, কাব্যধর্মের বিন্যাসসৌন্দর্য অপেক্ষা কবির মানসিকতা বুঝতে এই কবিতার বিশ্লেষণ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঠকের পক্ষে অনিবার্যভাবেই আবশ্যিক। মানিকবাবুর মনোধর্মে কাব্য রয়েছে, তিনি মূলতঃ কবি, তবু তিনি কাব্যের সাম্রাজ্যে সহজ

বিহার করেন নি, এখানে এই কবিতায় তারই অকপট ইতিহাস বিবৃত বলে মনে হয়। তাঁর মনে যে রাজনীতির চেতনা তাঁকে ভেতরে ভেতরে বিপ্লবী ও সমাজতন্ত্রী করে তুলছিল—সে খবরও এই কবিতায় ছড়িয়ে আছে।

আমার জগতে কাল মানুষের জন্মক্ষণ থেকে
তিলে তিলে করেছে সঞ্চয়
মহা সম্ভাবনাময় যে মহাবিপ্লব,
আমি তারই আত্মীয়তা চাই।
তার পিতা, তার হোতা, তার সার্থকতাদাতা,
একমাত্র আমি।
আমি! আমি! আমি!
আমি তারে বাঁচাব আঁতুড়ে,
আমি চিকিৎসক।

এই গ্রন্থে আরো দু-একটি এমন কবিতা আছে—যেখানে মানিক-বাবুর মানসিকতার একটা স্পষ্ট চিত্র উন্মোচিত হয়েছে। টুকরো কবিতায় তাঁর আত্মজীবনী রচনার রূপ নিয়ে মর্মবেদনা প্রকাশের ব্যাপারও ঘটেছে মনে হয়। তিনি একটি কবিতায় লিখছেন—

মদ যে খায় সে মাতাল বটেই তো!
মদ কেন সে খায়?
বলি ওহে মাতাল-সমালোচক,
মানুষ হয়ে মদ কেন সে খায়?
মানুষ যদি মানুষ হয়ে বাঁচার উপায় পায়,
অমানুষের মরার মতো মদ সে কভু খায়!
বাঁচার মধ্যে অবশ্যই আছে বিপর্যয়,
আত্মা গিয়ে বাজীর মতো বিস্ফোরণের খেলা,
খেলতে রাজী অবশ্য কে আর হয়?

তুমি মাতাল নও;
তুমি চাও যে আর সকলে মাতাল হয়ে থাক!
তোমার পেশা মাতাল করা দুঃখীদের,
রুগ্নদের
তুমি কাব্যে টাকার জোরে ক্ষুধার বিনিময়ে,
পিয়াসী মদ যৌন মেয়ে পাও!

ওপরের উদ্ধৃত অংশ হলো 'শিরোনামহীন কবিতা' পর্যায়ের আট নম্বর কবিতার অংশ বিশেষ। হৃতবিবেক বঞ্চিতসর্বস্ব মানুষের হাহাকারের এমন সোচ্চার ধ্বনি বাংলা কাব্যে খুব কমই উচ্চারিত হয়েছে, এখানে শুধু যে সমাজ সচেতনতার প্রাজ্ঞ উক্তি আছে—তাই নয়, কবির অন্তর্জীবনের এক অসহায় করুণ হাহাকারের কাতরতাও গুমরে উঠেছে।

রাজনৈতিক পর্যায়ের কবিতাগুলিতে কবি রূপকার্থ এমন সুকৌশলে ব্যবহার করেছেন—যাতে কাব্যে প্রকাশিত জ্বালা অত্যুগ্র হয়ে বাজে। 'বাংলা ভাঙ্গার কবিতা'য় তিনি বলেছেন—'বাঙ্গালীরা মরেছে মরণ মরবে, কিন্তু ভাইরে, আর মরা যায় না'—একথা জ্বালা ধরিয়ে দেয়, তবু সেই জ্বালা সত্ত্বেও কাব্যরাসিকেরা কবিতা আহরণ করতে বিমুখ হন না,—যখন ঐ কবিতায় পড়া যায়—

হাঁড়ি ফাটলে যে ভাত পুড়ে ছাই হবে উনানের আগুনে,
শ্রমার্ত ক্ষুধার্ত আমরা খাব কি?
কি খাবে আমাদের হাড়গিলে বৌগুলি, ন্যাংটো নচ্ছার
ছেলেমেয়ে?

পঁয়ত্রিশ লক্ষ মরলাম,
মরলাম শুধু ওই নেতাদের লাটেদের খেয়ালে,
আরও কি দু'চার কোটি মরব,
দামী পেনের, এটলির হৃদয়ের মমতায় শোকভরা লেখনীর,
নেহরুর নখের আঁচড়ে জিন্নার গরিব মুসলমানের প্রতি দরদে,

দাঙ্গা, কারফিউ, ব্যর্থ ও মিথ্যায় ?
নেতাদের নেতারা বাংলা ভাগ করতে চায়।
বাংলা বাঙালীর।

অন্য একটি কবিতায় সচেতন ধুরন্ধর সমাজ সরল নিরীহ মানুষকে কি করে প্রতারণা করছে—কবি সুন্দর একটি কেনাবেচার ছক কেটে বলেছেন—ক্রেতারা সব চতুর। অার একটি কবিতাতেও কবি সূর্য যেমন করে জলাশয় থেকে জলকে বাষ্প করে উর্ধ্বায়িত করে, সেই ইঙ্গিত দিয়ে দরিদ্র শোষণের কৌশলী রূপটি উন্মুক্ত করেছেন—

এ কাঙাল মন, ভাঙা হৃদয়
ভরে গেছে
ভরে টইটম্বুর হয়েছে ঘন প্রচণ্ড ঘোর বরষায়
মহাপ্লাবনের সম্ভাবনায়
ডোবা পুকুর নদী মহাসাগর একাকার
হল বুঝি
হবে নিশ্চয় হবে
ভরসায়।
সাগর শুষেছে যেই সূর্য
রেহাই দেয়নি পচা ডোবাকে।
আকাশে সঞ্চিতপুঞ্জ মেঘেও আছে
ডোবাটির উষ্ণ বাষ্প
জীবন একান্নবর্তী সব ক্ষুধিতের।

তবে 'নূতন ঘৃণার প্রথম কবিতা'য় কবির ভাষা আরো তীব্র, কঠোর ও উদগ্র জ্বালাময়ী হয়ে উঠেছে। এই একটি কবিতাতেই কবি কাব্যে সুকুমার শিল্পের প্রতি তাঁর কি ধারণা, তাঁর জীবন-বোধ, সমাজ-ব্যবস্থা প্রভৃতি সম্পর্কে নিজস্ব উপলব্ধি নৈসর্গিক জগতের কার্যকারণ সম্পৃক্ত ঘটনাবলীর সঙ্গে মিলিয়ে প্রকাশ করেছেন।

হে সূর্য, উত্তাপে শান্তি পাও ?
আমারও পাঁজরে কোটি বজ্রের সন্তোষ,
আমি ক্ষোভে জ্বলি,
আমারও অত্যুগ্র শান্তি অনন্ত ঘৃণায়—
আমার জনতা, ঘৃণা চায়।
আমার জনতা,
আজো জন্মে উলঙ্গিনী ক্ষুধার জঠরে
না-খেয়ে মরে না,
জমে না ঠাণ্ডায়,
গলে না উল্লাসে শভ জারজের উচ্ছিষ্ট স্নেহের তাপে
উচ্চকিত রাজপথে রিলিফখানার ডাণ্ডবিনে।
সর্বহারা ক্ষুধাতুর প্রাণ,
বিশ্বজয়ী আশা নিয়ে ঘৃণা করে যায়।

কবি কেন ঘৃণা চান, এই সমাজব্যবস্থার প্রতি, এই বঞ্চনা ও প্রতারণার প্রতি, কেন তাঁর ঘৃণা—তা নিয়েই এই কবিতা। ঘৃণার তীব্রতা থেকে যে জ্বালা, তাই অগ্নি হয়ে বিপ্লবের রোশনাই জ্বালবে।

তবু উর্ধ্বে মুষ্টিবদ্ধ হাত,
ঘর নেই জমি নেই পেটে নেই ভাত,
ঘৃণায় ঘটায় অগ্ন্যুৎপাত,
উষ্ণ রক্তপাত।
তাই,
আরও ঘৃণা চাই।

অহিংসার বিপক্ষেও কবির বলীয়ান ঘোষণা :

ঘৃণারে করেছে ঘৃণ্য যারা পরভুক,
যারা চায় পেটের ক্ষুধায়
নত হোক নম্র হোক সবে,
শ্রান্ত ক্লান্ত রোগজীর্ণ হোক,

হতাশায় ভীরুতায় কর্মরত হাত
পঙ্গু হয়ে ভিক্ষা চেয়ে প্রসারিত হোক,
এক মুঠো দাও প্রভু,
কোটি কোটি মুঠির দেবতা !
অহিংসার এ কুৎসিত মারাত্মক প্রেম
দেহহীন দেহীর কল্পনা,
ইহলোক ছাড়া পরলোক,
বিনা প্রতিবাদে
মরে যেতে জীবনের মৃত্যু পণ করা।

আমি মানুষের কবি, পৃথিবী আমার,
আমি ঘৃণা করি।

তাঁর 'দিনের কবিতা'য় কবির মনোধর্ম রূঢ় বাস্তবতার তটে ধাক্কা খেয়েছে, তিনি জীবনের ক্ষুধা বর্ণনার প্রসঙ্গে পিঙ্গল সাহারা, একগাছি শুকনো ঘাস প্রভৃতি রূপকল্পের ব্যবহার করেছেন,—এখানে এই 'নূতন ঘৃণার প্রথম কবিতা'য় কবির সেই মনোধর্ম পরিণতি লাভ করেছে।

মানিকবাবুর গল্পেও যেমন, কবিতাতেও তেমনি দেখি যে তিনি সহজেই গভীরতায় পৌঁছতে পারেন, রাজনীতি বোধের কবিতায় তাঁর স্বচ্ছন্দবিহার, কিন্তু প্রেমের কবিতাতেও তিনি নিজের বিশ্বাস এবং উপলব্ধিকে গভীর প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করেছেন অতি সহজেই। প্রেম যে শুধু যৌন-ক্ষুন্নিবৃত্তির ব্যাপার নয়, সুগভীর হৃদয়বৃত্তি ও বেদনা বোধ থেকেই তার জন্ম, সে কথা সহজেই বলতে পারেন—

শোন বন্ধু মর্মভেদী বাণী—
নাহি জানি হৃদয়ের কোন প্রান্তে নির্বাসিতা প্রেমিকারা থাকে
জানিবার করেছি কৌশল, সংকেতে ইঙ্গিতে জেনে নিয়ে
বুকে যার স্তনের পীড়ন

হৃদয়ের কোন প্রান্তে আমি তারে করেছি গ্রহণ।

প্রথমে পেয়েছি শুধু ক্ষুব্ধ নীরবতা,
তারপর জয়ক্লান্ত ভিক্ষুণীর ক্ষমা,
অবজ্ঞায় উদার কোমল
তবু অভিমানহীন, বিবর্জিত শহুরে গ্রাম্যতা,
তারপর অসহায় তামাশার সুরে
সলজ্জ ঘোষণা—
প্রান্ত-ক্রান্ত নয় বন্ধু হৃদয়ের সবখানি তার
ভিখারিণী সত্য বটে তবু তো রাণীর অধিকার।

প্রেম যে কি গভীর, কি আত্মতন্ময়, সুখের, যথার্থ প্রেমের গভীরতা ও ব্যাপ্তির কাছে অতলান্ত সাগরের বিস্তৃতি এবং গভীরতাও তুচ্ছ হয়ে যায়।

তখন সে কাঁদে বন্ধু আমারেও কাঁদাবার ছলে,
আমারে বুঝায় বন্ধু নর-নারী একত্রে কাঁদিলে
কোনোমতে দু'জনার দু'টি ফোঁটা অশ্রু যদি
একসাথে হয় ধূলিসাৎ
সমুদ্রও রিক্ত তার কাছে
বিস্তৃতির গর্ব ছাড়া।

অথচ মানুষের হৃদয়ে এই নিষ্কলুষ সাত্ত্বিক সত্য প্রেমের ঘাটতি আজ বড় বেশী করে দেখা যাচ্ছে। কবিও নিজের হৃদয়ে খোঁজ করে বুঝতে পারেন না কোথায় 'নির্বাসিতা প্রেমিকারা থাকে'।

'রাতের কবিতা'টি আয়তনের দিক থেকে ছোট্ট পরিসরের কিন্তু দার্শনিক চিন্তায় সমৃদ্ধ। মানুষের মুক্তি সাধারণতঃ মৃত্যুতে, কিন্তু সে জৈবিক মৃত্যু, অথচ প্রেম কোনো সঙ্কীর্ণতার গণ্ডীতে না বেঁধে মহামুক্তি দান করে।

কবি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যপ্রকরণ সম্পর্কে দু-একটি কথা বলা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। প্রাথমিক পর্যায়ের কবিতায় তিনি ছন্দ ও মিলের স্বীকৃতি দিয়ে কবিতা লিখেছেন, কাব্যভাষাতেও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য তেমন উজ্জ্বল নয়। কিন্তু পরিণত বয়সের কবিতায় তিনি ঋজু বলিষ্ঠ এবং স্পষ্টবাদিতার স্বকীয়তা অর্জন করেছেন। তিনি গদ্য কবিতার ভঙ্গীতেই ছন্দবিন্যাস করেছেন, প্রাচীনতার প্রতি তাঁর অনীহা এবং তাঁর বক্তব্যকে আরো সহজে পৌঁছে দেবার জন্যেই তিনি কাব্য সৃজনে এই মাধ্যম ব্যবহার করে থাকতে পারেন। যদিও কবিতা উপলব্ধির বিষয় এবং পাঠকের পক্ষে তা সাধনা সাপেক্ষ, তবু তাঁর কবিতার উষ্ণতা পাঠকের নিরুত্তাপ নিস্পৃহতার পাহাড়কে গলিয়ে দিক—এমন বাসনা যে তাঁর না ছিল তা নয়; তাঁব কাব্য লক্ষ্যভেদ করতে সমর্থ হবে কিনা—সে বিষয়ে তাঁর সংশয়ান্বিত কুণ্ঠা হয়তো ছিল।

গদ্য কবিতার প্রকরণে লিখলেও তিনি রবীন্দ্র প্রদর্শিত সড়কে বিহরণ করেন নি। বহু ব্যঞ্জনা-মধুর শব্দ তিনি নিজেই তৈরী করেছেন. কিম্বা নতুনভাবে ব্যবহার করার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন; যেমন—টইটম্বুর, ব্যস্ত হাটে শ্লথ পথে ছায়াশান্ত ঘাটে, হালে বাজা জলকাটা সুর, যৌন-চিকন, আলুনি-সংগ্রাম, কুয়াশার ছল, জলঠোসা ব্রণের মতো, শব্দ-মদ প্রভৃতি। রূপকল্প সৃষ্টিতেও তিনি যথার্থ কবিকর্মের পরিচয় উপস্থাপিত করেছেন—'কারো ঈশ্বরের অন্ধকার অন্ধচোখের মতো আকাশ'; 'শীতে মরা উপবাসী বাঁকা চাঁদখানি' কিম্বা, 'গৈরিক বৈরাগ্যে শিশু বল্মীক কবরে / জপে কান্না উইধরা সুরে / কৈশোরের ঘর ভরা প্রেমের পুরাণে' অথবা 'দয়ার শোষণে শুভ্র পাটের মুকুট' প্রভৃতি।

যেহেতু কবি প্রচলিত বোধ ও বিশ্বাসের দাসত্ব করেন নি, তিনি কাব্যভাষাতেও তাই বিদ্রোহী মনোভাবের পরিচয় রেখেছেন। বহুক্ষেত্রে কবি কিছু অকাব্যিক শব্দও ব্যবহার করেছেন, অবশ্য সে

সব শব্দ স্বাভাবিকভাবেই এসেছে, এবং আড়ষ্টতা-দোষ বা মাধুর্য-হানি ঘটায় নি। তিনি কত সহজেই "প্রাস্ত-ফ্রাস্ত, বিস্কুট-ফিস্কুট, কৃত্রিম বাঁধানো দাঁতে যুদ্ধের খিঁচুনি, মাইরি বলছি কালীর দিব্যি, অর্জুনের সিফিলিস উর্বশীর রুজি" প্রভৃতি ব্যবহার করেছেন। কেন যে এমন অকাব্যিক শব্দের ব্যবহার করেছেন তার কৈফিয়ৎ হিসেবে বোধহয় আমরা তাঁর উপস্থাপিত কবিতার পঙ্‌ক্তিগুলি বিবেচনা করতে পারি।

আমি কবি, শুঁড়ি নই।
শব্দ-মদ তৃষ্ণা নিয়ে এ লেখা প'ড়োনা।
জীবনের সব তৃষ্ণা
সব ঋণ শুধে
সৃষ্টির পেয়েছি অধিকার
দখল করেছি ভবিষ্যৎ!

অথচ,

শব্দ-মদ বেচা শুঁড়িগুলো
কাব্যলক্ষ্মীর দেহ চিরদিন কচি রেখে দিল
শুঁড়িগুলো সব মরে যাক,
কাব্যলক্ষ্মীর দেহে যৌবনের জোয়ার ঘনাক

মানিকবাবুর কবিতায় রাজনীতির প্রভাব বেশী, সমাজ-সজ্ঞানতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর সর্বত্র,—তথাপি কবি হিসেবে তাঁর কৃতিত্ব যে তিনি কোথাও বক্তব্যসর্বস্ব প্রচারবিদ হন নি, ঋজু বলিষ্ঠ উদাত্তকণ্ঠ হয়েও কবিত্বে দীক্ষিত হয়েছেন তিনি। তাই মানিকবাবুর আগে কবি পদটিকে বিশেষণ হিসেবে ব্যবহার করা চলে।

দেবীপদ ভট্টাচার্য

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা কলেজে ঢুকেই পড়ি। কিন্তু ১৯৪২ সালের আগে তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছে, আমরা এম. এ. ক্লাসের ছাত্র। মানিকবাবু তখন ন্যাশনাল ওয়্যার ফ্রন্টের আপিসে কাজ করেন। জাপানী আক্রমণ তখন শুরু হয়ে গেছে, এবং তার আগে হিটলারের বাহিনী সোভিয়েট রুশ আক্রমণ করে। বাঙালী শিল্পী সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের একটি বড়ো অংশ "ফ্যাসি-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ" নামে একটি প্রতিষ্ঠান পূর্বেই গঠন করেছিলেন। যতদূর মনে পড়ছে কবি বিষ্ণু দে ছিলেন তার সম্পাদক। মানিকবাবুও এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। তখন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ও এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। সে সময় আমাদের এক বন্ধু ছিলেন কবি আবুল হোসেন। চতুরঙ্গ, কবিতা প্রভৃতি পত্রিকায় লিখতেন। তিনি প্রস্তাব করলেন যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র পরিষদ থেকে নজরুল সম্পর্কে একটি সভা করা হোক। সেই সভায় স্বর্গত বিনয়কুমার সরকার সভাপতিত্ব করেন। এবং, বক্তাদের মধ্যে ছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। আমি যখন তাঁর কাছে প্রস্তাব নিয়ে যাই তখন তাঁর চেহারা দেখে যুগপৎ বিস্মিত এবং ভীত হই। কালো কঠিন মুখ, এবং বহু-রেখাযুক্ত, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং একটু অস্বাভাবিক চাহনি, সব মিলিয়ে একটু অদ্ভুত ধরনের মানুষ বলে মনে হয়েছিল। আমার বি. এ. ক্লাসের সহপাঠী শচীন চ্যাটার্জী তাঁর ভাগ্নে। সেই সূত্রে তিনি আমাকে 'তুমি' বললেন, যদিও প্রথম আলাপেই সেটা একটু আশ্চর্য রকমের লেগেছিল। অবশ্য তিনি খুব আপ্যায়ণ করলেন, এবং সভায় এলেন, আমারই সঙ্গে ট্রামে

করে। তখন নজরুল অসুস্থ, ধীরে ধীরে তাঁর সুস্থ চেতনা-শক্তি স্মৃতি-শক্তি লুপ্ত হতে আরম্ভ করেছে। অন্নদাশংকর লিখেছিলেন নজরুল সম্পর্কে, "মৈনাক সৈনিক হয় না, সৈনিক মৈনাক হয়।" মানিকবাবু সভায় এসে কিন্তু ভালো করে কিছুই বলতে পারলেন না, দীর্ঘ ছ'ফুট দেহ নিয়ে অনেকটা স্বগত ভাষণের মতো কিছু বললেন। পরে আমাকে বলেন, "আমি সভায় বলতে পারি না।" যাই হোক, তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ রইল, এবং আমি দেখলাম মানিকবাবু ফ্রয়েড ছেড়ে ক্রমশ মার্ক্সীয় চিন্তাধারার দিকে ঝুঁকেছেন। তিনি এ সময়ে প্রচুর পড়তেন, ব্যক্তিগতভাবে আলোচনা করতেন, এবং সে সময়ে অবাক হয়ে দেখেছি, তিনি কতো দ্রুত দুরূহ বইগুলি পড়ে ফেলছেন। তিনি একদিন বললেন, "দেখো, এখন বুঝতে পারি ফ্রয়েডের চিন্তা কতো অসম্পূর্ণ। ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাকে না জানলে কিছুই ভালো করে জানা হয় না।" এসব কথা পরে তিনি ভালো করে গুছিয়ে "লেখকের কথা" নামক পুস্তিকায় প্রকাশ করেছেন। "ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্টে" বেশিদিন চাকরি মানিকবাবু করেন নি। চাকরি তাঁর ধাতে ছিল না। তাঁর অসম্ভব আত্ম-মর্যাদাবোধ ছিল, কোনো দান গ্রহণ করেন নি। ১৯৪৫ সালে কলকাতায় "প্রগতি লেখক ও শিল্পী সম্মেলন" হয়। মানিকবাবু তখন এর সম্পাদক। তিনি এই প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। ক্রমে তিনি ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য হন। ইতিমধ্যে কলকাতায় দাঙ্গা, দেশ-ভাগ, স্বাধীনতাপ্রাপ্তি, উদ্বাস্তু আগমন প্রভৃতি ঘটনাগুলো ঘটতে থাকে। আমি তখন কলকাতায় ছিলাম না। মানিকবাবুর সঙ্গে যোগাযোগও ছিল না। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারীতে আমি প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিই। তখন আবার আমার মানিকবাবুর সঙ্গে দেখাশুনো হয়। তিনি তখন বরাহনগরে বাসা করে আছেন। তাঁর লেখায় তখন সম্পূর্ণ নতুন ধারা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। অর্থাৎ প্রথম দিককার লেখায় যেমন ছিল ফ্রয়েডের প্রভাব, শেষের দিকের লেখায় এল সংগ্রামী চেতনা। তাঁর

"সোনার চেয়ে দামী", "জীবনের জটিলতা" বা "ছোট বকুলপুরের যাত্রী"র মতো গল্প একালে তিনি লিখেছেন।

মানিকবাবুর অর্থভাগ্য কোনোদিনই ছিল না। পারিবারিক দায় শেষের দিকে বেড়েছিল। তাঁর বৃদ্ধ পিতা শেষ জীবনে ছেলেদের মধ্যে সবচেয়ে দরিদ্র মানিকবাবুর কাছেই থাকতেন। প্রকাশকরা তাঁকে ভালোবাসতেন, কিন্তু তাঁদের কাছ থেকেও তিনি সুবিচার পান নি। শেষজীবনে দারিদ্র্য, অসুস্থতা, পারিবারিক দুর্যোগ, সব মিলে তিনি একেবারেই ভেঙে পড়লেন, তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হল। তিনি বণ্ড সই করে জোর করে হাসপাতাল থেকে চলে এলেন। তার কিছুদিন পরেই তাঁর মৃত্যু হল। মৃত্যুর খবর পেয়ে অতুলচন্দ্র গুপ্ত ক্ষোভে বলেছিলেন, "মানিক suicide করেছে।" এবং এখানেই বলা ভালো, গোপনে মানিকবাবুর পরিবারকে যাঁরা অর্থ সাহায্য করতেন, তাঁদের মধ্যে অতুলবাবু অগ্রগণ্য। মানিকবাবু অনেকটা নিজেই নিজেকে নষ্ট করেছিলেন, অনেকটা মধুসূদন দত্তের মতো। বোধহয় অসাধারণ প্রতিভার ধর্মই এই। মৃত্যুর কিছুকাল আগে হঠাৎ একদিন তিনি আমার বাসায় আসেন। 'যুগান্তর' পত্রিকায় পূজা-সংখ্যা গল্প দিতে যাচ্ছিলেন। তাঁকে দেখে আমার খুব কষ্ট হল। শীর্ণদেহ, নিকেলের চশ্‌মা, মলিন বেশ-বাস, ঘর্মাক্ত চেহারা, সব মিলিয়ে সেদিন খুব বেদনা বোধ করেছিলাম। আমার মা তাঁকে কিছু খেতে দিলেন। তিনি খুব তৃপ্তি করে খেলেন। হঠাৎ বললেন, এইটিই তাঁর ধরণ ছিল, "দেখো, দুটি ডাল-ভাতের সংস্থান না রেখে বাঙলা দেশে কেউ যেন সাহিত্য করতে না যায়।" কথায় কথায় বললেন, "All India Radio" থেকে একটি চাকরির প্রস্তাব এসেছিল। সম্ভবত তাঁর কোনো গুণগ্রাহী তাঁর দারিদ্র্যের কথা শুনে এই প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সেই চাকরির দুটি সর্ত ছিল। যে সর্ত তাঁর কাছে তাঁর আত্মমর্যাদার বিরোধী। তিনি সেজন্য ঐ চাকরী পান নি। দেখলাম মানিকবাবুর তার জন্যে কোনো ক্ষোভ নেই। এই আত্মমর্যাদায় তিনি চিরদিন

অটল ছিলেন। যেমন ছিলেন মধুসূদন। তারপর ১৯৫৬ সালে এক বিকেলে প্রেসিডেন্সী কলেজের গেটে মানিকবাবুর মৃতদেহ নিয়ে গাড়ি এসে থামল। মানিকবাবু প্রেসিডেন্সী কলেজে বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন। আমি ছাত্রদের পক্ষ থেকে মালা দিলাম, শ্মশানে গেলাম. তারপর মানিকবাবু হারিয়ে গেলেন। সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রত্যয়ে বলিষ্ঠ, আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত, দারিদ্র্যে অবিচল, এবং সাধারণ ব্যবহারে প্রীতি-প্রবণ আমি বাংলা দেশের কোনো সাহিত্যিককে দেখিনি।

অনুলিখন : অনিন্দ্য রায়

রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত

কয়েকটি নায়ক ঃ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস

ঔপন্যাসিকের জীবনভাষ্য প্রতিফলিত হয় ঘটনা নির্বাচনে, পরিণামী সংবেদনায় এবং প্রসঙ্গত কাহিনী বিবৃতির ফাঁকে ফাঁকে উচ্চারিত মন্তব্যে। লেখকের মানসপ্রবণতা এইভাবেই উপন্যাসমধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নায়ক নায়িকার চরিত্রবিশ্লেষণে অনুস্যূত হয়ে পড়ে। ঔপন্যাসিকের প্রত্যক্ষভাষণে না থাকলেও তাই উপন্যাসের শিল্পরূপ থেকে লেখকের জীবনসমালোচনা ও সারস্বত-প্রত্যয় উপলব্ধি করা যায়। চন্দ্রশেখরের প্রারম্ভিক উক্তি "বাল্যপ্রণয়ে অভিসম্পাত আছে" অথবা উপসংহার, "তবে যাও, প্রতাপ, অনন্তধামে। যাও, যেখানে ইন্দ্রিয়জয়ে কষ্ট নাই, রূপে মোহ নাই, প্রণয়ে পাপ নাই, সেখানে যাও"—বঙ্কিমচন্দ্রের নৈতিক আদর্শ ব্যক্ত করে। শরৎচন্দ্রের বহু উপন্যাসের অংশও অনুরূপভাবে উৎকলিত হতে পারে, দেবদাসের উপসংহারটিও এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

যদি জীবনজিজ্ঞাসায় নতুন কোনো দিগন্ত লেখকের চোখে পড়ে, যেখানে দাঁড়িয়ে মনে হয়, পুর্বের পথ চলায় ফাঁকি না থাকলেও ফাঁক ছিল, জীবন ও জগতকে চেনার দৃষ্টি ছিল না স্বচ্ছ, তাহলে লেখকের জীবনধারণায় পরিবর্তন ঘটা স্বাভাবিক। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শিল্পীমানসেও ঘটবে গোত্রান্তর। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব পর্যায়ের রোমান্টিক উপন্যাসের নরনারী, সামাজিক উপন্যাসের নায়ক নায়িকা এবং শেষ ত্রয়ীর হিন্দু ঐতিহ্যমণ্ডিত চরিত্র লেখকমানস বিবর্তনেরই পরিচয় দেয়।

বর্তমান প্রসঙ্গে আলোচ্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃতীয় পর্যায়ের চারটি উপন্যাস ঃ 'হলুদ নদী সবুজ বন', 'ইতিকথার পরের কথা',

'মাঝির ছেলে', 'শান্তিলতা'। তখন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মার্কসবাদে দীক্ষিত। ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের মোহ ত্যাগ করে তিনি পূর্ণজীবনের সন্ধানে শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্তের জীবনসংগ্রামে শরিক হয়েছেন। "কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা" অর্জন করা দুরূহ। তবু মানিকবাবু সেই দুরূহের সাধনায় আমৃত্যু নিরলস ব্যাপৃত ছিলেন।

উপন্যাসের ভাষা, দৃশ্যবৎ বর্ণনা, মৌলিক উপমারীতি—এইসব দিকে খুঁটিনাটি বিচ্ছিন্ন করে দেখানো কঠিন নয় যে মার্কসবাদের সংস্পর্শে এসে মানিকবাবুর শিল্পীসত্তা নির্জিত হয়েছে। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় সংহতি ক্ষুণ্ণ হয়েছে অনেক ছোট-বড় চরিত্রের মেলায়, সমাজপ্রেক্ষিতের ওপর বেশি জোর দিতে গিয়ে মনের জগৎ হারিয়ে গেছে অতি-সরলীকরণে। পদ্মানদীর মাঝিদের যে উদ্দাম জীবনবেগ অথবা শশী-কুসুম যতি-কুমুদের জৈব অনুভূতি একজন শক্তিমান কথাশিল্পীর ব্যঞ্জনাসঞ্চারী কলমের পরিচয় দেয়, তার বিশিষ্টতা যেন আর নেই। সত্যিই কি নেই? এ-প্রশ্নের উত্তরে শেষ পর্যায়ের গল্প-প্রসঙ্গে আলোচনা স্মরণ করা যেতে পারে। "পুরনো জীবন ত্যাগের পরেও থাকবে পুরনো পরিচ্ছদের মোহ? সাঙ্কেতিক ভাষা, তির্যক মন্তব্য, উপসংহারে বিদ্যুদ্দীপ্তি তো তৃতীয় পর্বের বাহন হতে পারে না। নেতিবাচনের উপমা উৎপেক্ষা সংলাপ যতই বলিষ্ঠ হোক, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোত্রান্তর স্বীকার করলে এই পর্বে তা বরং ন্যায়ত প্রত্যাশিত নয়। নতুন সমাজচেতনা প্রতিষ্ঠার পূর্বে তার সার্থক ভাষা আসে না।" তৃতীয় পর্যায়ের উপন্যাসেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নতুন রচনাশৈলীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি। কিন্তু তিনি যে এত-দিনের সংস্কারের মোহ থেকে প্রায় রাহুমুক্ত হয়েছিলেন, এ সত্যটিই তাঁর পূর্ণজীবনসন্ধিৎসার সাক্ষী।

তাই তৃতীয় পর্বে নতুন ধরনের কিছু নায়ক চরিত্র পাই। 'ইতিকথার পরের কথা'র কৈলাস, 'হলুদ নদী সবুজ বন'-এর ঈশ্বর-এর পথে নিঃসন্দেহে বাঙলা উপন্যাসে নতুন নায়কের পদধ্বনি শোনা গেছে।

সুখেন্দুও [শাস্তিলতা] মধ্যবিত্ত থেকে শ্রমিকস্তরে পরিবর্তিত নায়ক, নাগা. নকুলের সমস্তরে এসে দাঁড়িয়েছেন 'ভদ্রলোক মাঝি' যাদববাবু [মাঝির ছেলে]।

চরিত্র চিত্রণে নতুন মূল্যবোধ, নতুন বক্তব্য পরিস্ফুট হলেই শিল্পীর গোত্রান্তর সাফল্য অর্জন করে। প্রথমে একটু ছকঘেঁষা পুঁথিগত ধারণা দিয়েই গড়তে চেয়েছেন নতুন চরিত্র। চরিত্রগুলি পরিকল্পনার নেপথ্যে যে শিল্পী-বিধাতার মন সক্রিয়, সেই "মনের কারখানা ঘরে" তখন যে সামাজিক রাজনৈতিক প্রশ্ন সমাধানের প্রত্যাশী, তাদের ঘটেছে চরিত্রায়নে। কিন্তু তারা যেন চলাফেরা কথাবার্তার সময় পেছন ফিরে লেখকের উপস্থিতি এবং অভিপ্রায় বুঝে নিতে চেয়েছে। তাই দেখি 'নাগপাশ'-এর আখ্যানভাগ অত্যন্ত শিথিল। অধ্যায় থেকে অধ্যায়ান্তরে অগ্রগতি অনিবার্য বা সাবলীল নয়, বহু ঘটনা ও চরিত্র যেন লেখকের কয়েকটি ধারণাসূত্রে ক্ষীণভাবে সংলগ্ন। স্বাভাবিক গতি পদে পদে ব্যাহত। নরেন, ছবিরানী, নন্দন, সন্ধ্যা, মহেন্দ্র, গৌরী. দীননাথ, মাধব, মানসী কয়েকটি বিচ্ছিন্ন নরনারী, আপতিক ঐক্যসূত্রে মিলিত। মধ্যবিত্ত যুবক নরেন্দ্র তার মনের শ্রেণীচ্যুতি ঘটানোর জন্যেই যেন গ্রামের প্রতিবেশী দীননাথের ছেলে মণ্টুর সঙ্গে বস্তিতে বাস করল। মাধব অসাধারণ জ্ঞানী অধ্যাপক, তিনি মৌলিক চিন্তার অধিকারী। নরেন তাঁর অনুরাগী। সে মাধববাবুর কাছে মোটা মোটা বই চেয়ে নিয়ে পড়ে। কিন্তু পাঠকের কাছে মোটেই পরিস্ফুট হয় না কি বিষয়ে তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করে, তাঁর মৌলিক চিন্তার লক্ষ্য কি এবং কেন নরেন মাধববাবুর এত অনুরাগী।

কিন্তু তবু নরেন জিজ্ঞাসু মধ্যবিত্ত যুবক, যার অনেক মধ্যবিত্ত-সুলভ মোহ নেই এবং যার শ্রমে শ্রদ্ধা আছে। ছবিরানী সংগ্রামশীল কামিনী মেয়ে, একালীন নায়িকা। 'হলুদ নদী সবুজ বন' উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পেয়ে গেছেন নতুন মানুষদের মর্মের সংবাদ।

সেখানে শ্রেণীসংঘাত আছে, আরো আছে : "শ্রেণীতে শ্রেণীতে ভাগ হয়ে হয়েও একত্র সংগঠিত সমগ্র সমাজের কথা।"

॥ ২ ॥

'হলুদ নদী সবুজ বন' সুন্দরবনের গল্প। সেখানে বহু মানুষ, পুরুষ ও নারী, হিন্দু ও মুসলমান জীবিকার সূত্রে জীবনযাপনের দায়ে মিলেছে। বিদেশী টিম্বার কোম্পানীর কর্তৃপক্ষস্থানীয় জনসন, রবার্টসন, সাদারল্যাণ্ড এবং কারখানার ইঙ্গভাবাপন্ন দেশী কর্ণধার প্রভাস ; তাদের অন্তঃপুরে আছেন স্ত্রী, বোন, শ্যালিকা। এইভাবেই মিনার্ভা, আইভি, বনানী, মিসেস বাগচীকে নিয়ে একটি অভিজাত নারীচক্র গড়ে উঠেছে। তাঁরা ক্লাবে, পিকনিকেও উপস্থিত। অন্যদিকে আছে কৃষক, মাঝি, ঘরামি, মজুর, শিকারী প্রভৃতি ধরিত্রীর সন্তান—নিরঞ্জন, ভূতনাথ, আজিজ, মণ্টু, ঘনরাম, শান সায়েব এবং ঈশ্বর। এই ঈশ্বরই মানিক-কথাশিল্পের জগতে অন্যতম নতুন মানুষ। সে কুবের, ধনঞ্জয়, পীতাম্বর, যাদব থেকে স্বতন্ত্র। গল্পের ঘটনাকাল তিরিশের পরবর্তী সময় ; স্থান অত্যন্ত বিঘ্নসঙ্কুল : "হলুদ কাদায় ঘোলা নোনা জলের নদী। হাঙ্গর কুমীর আর নানাজাতীয় মাছে ভরা। ডাঙার বন বাঘ ভালুক হায়েনা শেয়াল থেকে নিরীহ হরিণ এবং নানাজাতীয় সরীসৃপ জোঁক বিছা আর পোকামাকড়ে ভরা। সংখ্যার হিসেবে স্বজনতান্ত্রিক মশারাই অতুলনীয়—হিংসার হিসাবেও বটে। নদীর হাঙ্গর কুমীর আর বনের বাঘ ভালুক সাপেরা বছরে যত মানুষের প্রাণ নেয়, মশারা দলে দলে হুল ফুটিয়ে তার চেয়ে কতগুণ বেশি মানুষকে যে আখেরে ঘায়েল করে।" ঈশ্বর বাগদী চাষার ছেলে, কিন্তু এখন জমি নেই, বাবার পুরনো-কেনা গাদা বন্দুক দিয়ে সে শিকার করে। ঈশ্বর অব্যর্থ শিকারী। উপন্যাসের যখন যবনিকা উন্মোচন হলো, তখন একটি বাঘ লক্ষ্মণের গরু এবং আরো অনেকের প্রাণ নিয়েছে। সেই বাঘ শিকারে

উৎসাহী হলেন বর্ণসঙ্কর প্রভাস এবং খাঁটি সাহেব রবার্টসন। সাথী রইল দেশী শিকারী ঈশ্বর।

প্রভাস ও রবার্টসনের গুলি ব্যর্থ হলে ঈশ্বরের বন্দুকেই বাঘ ধরাশায়ী হলো। বাঘ নয়, বাঘিনী। খবর রাষ্ট্র হতে বাঘ-মারার বাহাদুরি প্রভাস ও রবার্টসন দুজনেই নিতে চায়। সংবাদপত্রের প্রতিনিধি জানতে চান, কার গুলিতে বাঘ মরেছে। মৃত বাঘের পাশে তার ছবিও প্রকাশিত হবে। বাহাদুরি থেকে বচসা, বচসা থেকে হাতাহাতি। প্রভাস ও রবার্টসন দুজনেই সুরাপানে তখন অপ্রকৃতিস্থ। অসাধু পথ নেয় ঈশ্বর। তার বিবেকে বাধে, অনুশোচনা হয়, তবু সে মিথ্যা সনদে সই করে। কারণ তার স্ত্রী গৌরী অন্তঃসত্ত্বা, অসুস্থ এবং তার বাঁচার সম্ভাবনা ক্ষীণ। প্রভাস ও রবার্টসন দুই পক্ষের টাকা নিয়ে দুজনকেই লিখে দেয়, বাঘ তার গুলিতে মরেছে। ছলনার আশ্রয়ে টাকা উপার্জন করে গৌরীকে হাসপাতালে দিয়ে সে যাত্রা মৃত্যুকে ঠেকাল। 'তিন পুরুষের চাষা' ঈশ্বর শেষ রক্ষা করতে পারে নি, ভুলের মাশুল দিয়েছে কঠিনতম। চাকরি থেকে ছাঁটাই হয়েছে, রবার্টসনের প্রতিশোধ। ঘর পুড়েছে প্রভাসের রোষাগ্নিতে। গোয়াল ঘরে আশ্রয় নিতে হলো সদ্যপ্রসূতি গৌরীকে। প্রহারও কম হয় নি ভাড়াটে গুণ্ডাদের হাতে।

ছাঁটাই ব্যাপারে প্রতিবেশী মণ্টা, আজিজ, নন্দ অবাক হয়েছিল খুবই। ঈশ্বর এজন্যে ধর্মঘট করতে চায় নি। স্পষ্টই বলেছে: "আমার ছাঁটাইয়ের মধ্যে অন্য ব্যাপার আছে।" গ্রাম্য মানুষ, সংসারকর্তব্যের দায়ে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে, বিবেকদংশনে জর্জরিত হয়েছে এবং নির্মম কঠোর শাস্তি মাথা পেতে নিয়েছে। তারপর প্রকৃতির দুর্যোগ। সেবার প্রবল বন্যায় হলুদ নদী উত্তাল হয়ে সবুজবন এলাকার বহু ক্ষেত ভাসিয়ে নিয়ে গেল। লেখকের কথায়: "অনাবৃষ্টিতে মরে গেল বেশির ভাগ ফসল। যারা পারলো তারা আবার চাষ করলো, যারা পারলো না তারা কেবল কপাল চাপড়ালো। তারপর

অতিবৃষ্টির বন্যায় সে ফসলও গেল পচে। ঈশ্বর কোন কারখানায় কাজ পায় নি।" অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। কিন্তু ঈশ্বরের বর্তমান বিপর্যয়ের পটভূমির সঙ্গে পাঠকের পরিচয় হয়েছে। তার কারখানার কাজ নেই এবং সারা পল্লী দুর্ভিক্ষের করাল ছায়ায় কবলিত। হয়ত সেজন্যেই আর কোনো শাস্তি পায় নি ঈশ্বর।

প্রতিবেশী ঘনরাম, আজিজ, মণ্টা, নকুল গাড়ি বোঝাই করে বাঁশ খড় নিয়ে এসে ঈশ্বরের ঘর ছেয়ে দেয়। সকলের আলোচনায় ঠিক হয়, ঈশ্বর "বজ্জাতি করে নি, বোকামিই করেছে। হাড়ে মজ্জায়, চোদ্দ পুরুষের চাষা তো!" কিন্তু এ কী গুণ্ডা আইন, গরীবের ঘর পুড়িয়ে দেবে। আজ ঈশ্বরের গৃহদাহ, কাল আজিজ, মণ্টারও হতে পারে। তাই ঈশ্বরকে ঐ অপরাধে বাদ দিলে চলবে না। সবারই প্রতিরোধ চাই। ঈশ্বর প্রথমে বিমূঢ় হয়, পরে সবার জন্য তামাকের যোগাড়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

অনেকে সমব্যথী হলে অতিবড় দুঃখেও সান্ত্বনা, স্বস্তি থাকে। তাই শান সায়েব সেদিন ভাইপো রোস্তমের কাছে ঈশ্বরের অবস্থা শুনে প্রচুর সিন্নী পাঠিয়ে দিয়েছে, কেবল পীরের প্রসাদ বলে নয়। শান সায়েব হলুদ নদীর খেয়াঘাট জমা নিয়েছে। সেই খেয়াঘাট তদারকি এবং পয়সা আদায়ের কাজ পেল ঈশ্বর। কাঁচা পয়সা প্রচুর, অথচ সে কোনোদিন বেইমানি করে নি। এইভাবে সুখে চলে যেতে পারত। কিন্তু ব্যবসায়ীরা খেয়াঘাটে ষ্টীমার চালাবেন। সুতরাং শান সায়েবের চাকরি ছেড়ে ঈশ্বরকে নিতে হলো প্রহরীর কাজ। প্রভাসের বাড়ির সদররক্ষী হবে ঈশ্বর। কারণ এ অঞ্চলে ঈশ্বরের মতো অব্যর্থসন্ধানী নেই এবং ইতোমধ্যে প্রভাস ও রবার্টসনের অন্তঃসংঘাত চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে। শিকারী কিংবা চাষীর পক্ষে এই অকর্মণ্যের কাজ অপমান-জনক। তাই ঈশ্বর আক্ষেপ করেছে। কিন্তু জীবনের দায় জীবিকার দাবিতে আক্ষেপই চূড়ান্ত নয়।

প্রভাসের জন্মদিনের উৎসবে পানোন্মত্ততা মত্রাতিরিক্ত হলে বনানী

সর্বনাশ আশঙ্কা করে ঈশ্বরকে ছুটি দিয়ে দেয়। বহুদিন পরে ঈশ্বর শান্তিতে নিজের ঘরে ঘুমোয়। কিন্তু দরিদ্রের সবই প্রতিকূল। বেড়ার দেওয়ালে সিঁদ কেটে তার শিশুপুত্রকে নিয়ে গেল শেয়ালে। বন্দুক সত্ত্বেও ঈশ্বর কত অসহায়।

আবার ভাড়াটে শিকারী হিসেবে ডাক পড়ল ঈশ্বরের। নতুন একটা বড়-মিঞা উৎপাত স্নুরু করেছে। মানুষখেকো বাঘ। পুত্রশোক তুচ্ছ করে প্রভাসের সঙ্গী হলো ঈশ্বর। বাঘ মরল ঈশ্বরের গুলিতে। সেই বন্দুক হাতে নিয়ে প্রভাস নিজেই শিকারীর গৌরব পেলেন। ঈশ্বরের মনে "আরেকটা কার্তুজ, খবর করে প্রভাসের মর্মস্থানে গুলি করতেও ইচ্ছা হয়।" বন্দুক, কার্তুজ ফেরৎ দিয়ে ঈশ্বর ভাবেঃ "কী এমন কম জোরের লাথিটা সে খেলো?" চাকর মেঘনাদ পেয়েছে পদাঘাত, শিকারী ঈশ্বর পেয়েছে অপমান।

শিকারের স্মরণোৎসবে প্রচুর লোক খাওয়ানো হলো। লেখক জানিয়েছেন, উৎসবের সবটুকু অমিশ্র আনন্দ নয়। এই ভোজনপর্বে গুণধর বাগচীর গোপন গুদামে সঞ্চিত সাতশ মণ গম আর সাতাশী মণ আটা পচে যাচ্ছিল, তার আংশিক সদ্গতি হলো।

মর্জির দাম, মানুষের দাম নেই। তাই প্রভাসের মর্জিতে মেঘনাদ এবং ঈশ্বরের কাজ গেল। কিন্তু সে যেন দাবার বোড়ে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও কখনো রবার্টসনের, কখনো প্রভাসের চালনায় চলে। প্রভাসের দারোয়ান-পদের দ্বিগুণ বেতনে রবার্টসন তাকে কারখানার প্রহরী নিযুক্ত করে। ফ্যাক্টরীতে ধর্মঘটের সম্ভাবনা। ছোটখাট সংঘর্ষও অসম্ভব নয়। আজিজ, মণ্টা, নকুলের কথায় সব পরিস্কার বোঝা গেল। তাই কাজ পেয়েও ঈশ্বর চিন্তিতঃ "এ চাকরী কতদিন?" অন্যরা রসিকতা করেঃ "তোমার মত শিকারীর বন্দুকে মরাও সৌভাগ্য।" কারণ সবাই জানে, ঈশ্বর অমানুষ নয়; ঈশ্বর জানে, সে আবার বেকার হবে।

॥ ৩ ॥

ইতোমধ্যে বড়লোকের খেয়ালে একদিন বনভোজন হলো। সেখানে মিসেস বাগচী, আইভি, বনানী ইত্যাদি পরস্পর আভিজাত্য ও ফ্যাশনের প্রতিযোগিতায় মত্ত, পুরুষেরা প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির গুণগানে পঞ্চমুখ। ঈশ্বরের ব্যাখ্যায় একমাত্র বনানীর আগ্রহ তার সহজ স্বরূপের পরিচয়।

'হলুদ নদী সবুজ বন'-এর প্রধান দুর্বলতা লখার মার চরিত্র। সে কথকতা করে। পৌরাণিক কথকতা। পরে রোস্তমের রচনায় সে 'হলুদ নদী সবুজ বন' অঞ্চলের নতুন পরিবর্তন, নতুন চেতনার কথা ব্যাখ্যা করে। পৌরাণিক রূপকে একালের কাহিনী। এক যে ছিল অরণ্যকন্যা, রাজকন্যারই মতো, তার রূপ ঐশ্বর্য ছিল। তাতে মুগ্ধ হয়ে এলো কৃষক, মজুর। দুজনের ভালোবাসায় অরণ্যকন্যা দ্বিধাগ্রস্ত। রূপক ভেদ করে চাষী মজুরের সংগ্রাম, সুখ দুঃখের কাহিনী ব্যক্ত হয়।

ঈশ্বরের স্ত্রী গৌরীর সমব্যথী এবং ঈশ্বরের অনুরাগিণীরূপে উপন্যাসে তার ভূমিকা প্রয়োজনীয়, কিন্তু উপন্যাসের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ থেকে লখার মার সুবিস্তৃত কাহিনী যেন শিথিলসংলগ্ন মনে হয়। ঈশ্বর ও লখার মার মধ্যে পরস্পরের প্রতি দুর্বলতাটুকু অস্বাস্থ্যকর নয়। কিন্তু প্রেমালাপের জন্য নুরুল-আজিজ, রোস্তম-ফুলজান এবং লখার মা ও ঈশ্বরের দলবেঁধে একত্র বনবিহার অপরিহার্য ছিল না।

সুন্দরবনের বর্ষা যেমন সর্বনাশা, তেমনি সেখানে ভয়ঙ্কর ম্যালেরিয়া। বোনের বিয়েতে গৌরী গেল বাপের বাড়ি। তখন ঈশ্বর অসুস্থ। তারপর অসুখের বৃদ্ধি। ম্যালেরিয়া জ্বর। দুদিনেই ফিরে এলো গৌরী। এদিকে তখন বর্ষার জল নদী ফাঁপিয়ে ডাঙায় উঠেছে। অনেক ভাঙনে মরেছে। নন্দেরচাঁদের বৌ পথ চলতে চলতে হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে, তিনবার হাত কপালে ঠেকায়। তারপরেই হলুদ স্রোতে নিশ্চিহ্ন। জ্বরে বেহুঁস ঈশ্বরকে গৌরী আর পিসী কোনোমতে

চৌকির ওপর তুলে ধরে। কিন্তু কতক্ষণ পারা যায়, মৃত্যু আসন্ন। ঘরের চালা পড়ে গেছে। তবু মানুষ বাঁচে। তাই শান সায়েবের নৌকা নিয়ে আসে রোস্তম, আসে বনানীর পাঠানো নৌকা। উপসংহারটি সংকেতভাষী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়েরই উপযুক্ত : "কোথা নিয়ে যাবে?

যেমন উঁচু জমি আছে, যেখানে ঘরবাড়ী খাড়া আছে।...পায়ের নিচের মাটি তো সরে যায় নি। আয় সবাই মিলে ধরাধরি করে মানুষটাকে (ঈশ্বরকে) নৌকায় নামিয়ে আনি। মানুষের আশ্রয় মিলবেই, বন্যা হোক, আর ভূমিকম্প হোক।"

॥ ৪ ॥

ষোড়শ পরিচ্ছেদে মানিকবাবু বিবৃতি দিয়েছেন :

"নানা স্তরের নানা জাতের এতগুলি মানুষকে নিয়ে বন নদী গ্রাম এবং গ্রামকেন্দ্রিক স্বয়ংস্ফূর্ত শিল্পকেন্দ্র নিয়ে আমাদের এই সচলায়তনের কাহিনী ফাঁদা হয়েছিল। এতদূর এগিয়ে দেখা যাচ্ছে, ব্যাপার বড় গুরুতর।

মানুষকে বাদ দেবার প্রশ্নই অবশ্য ওঠে না। সব গল্পই মানুষের কাহিনী, পুরাণে দেবতারা যতই জাঁকিয়ে বসে থাকুন। মানুষ ছাড়া দেবতারও গতি নেই। কিন্তু একটা অঞ্চল? একটা বিশেষ এলাকা? হলুদ নদী সবুজ বন, গ্রাম আর একটা শিল্পকেন্দ্রকে বাদ দিলে সঙ্গে সঙ্গে এতগুলি মানুষ একেবারে বাতিল নিশ্চিহ্ন অর্থহীন হয়ে যায়।"

বলাবাহুল্য, উপন্যাসের অঙ্গে এ-বিবৃতি বহিরারোপিত, ভূমিকা বা পরিশিষ্টরূপে তা যোজিত হতে পারত। তবু এই বিবৃতি থেকেই উপন্যাসের উদ্দেশ্য প্রস্ফুট হয়েছে। লেখক হলুদ নদীর ধারে সবুজবনে যারা চাষ করে, মাছ ধরে এবং মজুর খেটে জীবননির্বাহ করে, তাদের কাহিনী বলতে বসেছেন। মানুষগুলিকে সুখ, দুঃখ, বেদনা, স্বপ্নে জীবন্তরূপে ফোটাতে হলে পরিবেশকেও প্রাধান্য দিতে হয়।

পদ্মানদীর মাঝিদের চরিত্র প্রস্ফুটনে পদ্মার প্রভাব সবচেয়ে বেশি। লেখক সেদিকে যথেষ্ট নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। 'হলুদ নদী সবুজ বন'-এও নদী ও বনের সঙ্গে মানুষগুলির জীবন শৈশব থেকে জড়িয়ে গেছে। এখানেই এদের পরিশ্রম, আনন্দ, দুঃখ অপঘাত মৃত্যু—এই নিয়ে জীবনসংগ্রাম। অভিপ্রায় ছিল চরিত্রপ্রাধান্য রক্ষার, কিন্তু রচনার মধ্যপথে দেখা গেল, চরিত্রগুলির স্বাভাবিক গতিবিধির জন্যই আঞ্চলিক পরিবেশের প্রাধান্য চাই। তাই ষোড়শ অধ্যায়ের পরে কল্পিত হয়েছে নুরুলের শৌখীন বনবিহার। লেখক সুঁদরি, পশর, অর্জুন, গরাণ প্রভৃতির পরিচয় দিয়েছেন। শুলোর বাধা আরণ্যক ঈশ্বরের কাছে বাধাই নয়।

আর-একবার উপন্যাস সম্পর্কে লেখকের কৈফিয়ৎ আছে : "একবার লিখছি ঈশ্বর গৌরী আজিজ শান সায়েব ফুলজান মন্টা সাধুদের কাহিনী, আবার আসছি প্রভাস বনানী ইভা রবার্টসনদের কথায়।...একেই কি বলে প্যারালাল মানে সমান্তরাল কাহিনী! বুদ্ধি খাটিয়ে চালাকি করে উচ্চ-মধ্য এবং নিম্ন অর্থাৎ চাষীমজুরদের হাজির করে ছককাটা গল্প রচনা করা?

এতকাল সাহিত্যচর্চা করে তাহলে আমার কাণ্ডজ্ঞান নিশ্চয়ই লোপ পেয়েছে বলতে হবে। শ্রেণীবিভক্ত জীবন কোন দেশে কস্মিনকালে প্যারালাল ছিল না, এখনও নেই, সোনার পাথর বাটির মতই সেটা অসম্ভব ব্যাপার!" (চতুর্দশ অধ্যায়)। প্যারালাল কাহিনী আছে কিনা এবং উচ্চ-মধ্য ও নিম্ন—তিন শ্রেণীর নরনারীর জীবনালেখ্য অঙ্কনে 'হলুদ নদী সবুজ বন'-এর সাহিত্যমূল্য খর্ব হয়েছে কি না—বিচারের দায় পাঠকের, সমালোচকের। লেখক যে কাহিনীবিন্যাসের সময় কত সচেতন থাকেন, এই কৈফিয়তে সেটুকু বোঝা যায়। 'সমুদ্রের স্বাদ', 'তেইশ বছর আগে ও পরে', 'শহরবাসের ইতিকথা' প্রভৃতি গ্রন্থে লেখকের গ্রন্থ-পরিচায়ক ভূমিকা আছে। তিনি উপন্যাসে ভূমিকার বিরোধী ছিলেন, অথচ লিখেছেন। উপন্যাসের বক্তব্য চরিত্রমাধ্যমে উপস্থিত করেও লেখক স্বস্তি পান নি ; গ্রন্থপাঠের প্রস্তুতিরূপে ভূমিকায়

পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। 'হলুদ নদী সবুজ বন'-এ ভূমিকা নেই, কিন্তু উপন্যাসের দুটি অধ্যায়ে লেখকের বক্তব্য প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। সাধুসন্তদের জীবনী বা আত্মস্মৃতি রচনার ধাত তাঁর ছিল না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বাঙলা কথাশিল্পে নিয়ত নিরীক্ষার শিল্পী। এই প্রাসঙ্গিক বিবৃতিগুলিতেই তাঁর শিল্পীমানসের ক্রমপরিবর্তমানতার সামান্য ইঙ্গিত হয়ে গেল। 'হলুদ নদী সবুজ বন'-এ উচ্চকোটির প্রভাস. রবার্টসন ; মধ্যবিত্ত সুখেন্দু এবং শ্রমিক ঈশ্বর, আজিজ. মণ্টার জীবনে পার্থক্য প্রচুর, কিন্তু একটাই জীবন, কেউ কারও থেকে অসম্পৃক্ত নয়। এই উপলব্ধি নিঃসন্দেহে গোত্রান্তরিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাগ্রসর চেতনার পরিচায়ক। "ঈশ্বর আজিজরা থাকে একস্তরে প্রভাস রবার্ট-সনেরা আরেক স্তরে। তাই বলে জীবন কি তাদের সম্পর্কহীন? পরস্পরকে বাদ দিয়ে তাদের কারো জীবনযাত্রা সম্ভব? সম্পর্ক কি শুধু প্রেমে হয়! সংঘাত সম্পর্ক নয়?" যেন লেখকের স্বগতচিন্তা উপন্যাসে বিধৃত হয়ে পড়েছে। প্রশ্নাকার বাক্যগুলির মধ্যেই প্রশ্নের উত্তর নিহিত আছে। প্রেম-প্রীতি সত্য, সংঘাত সত্য, তবু জীবনের ধারা অখণ্ড।

॥ ৫ ॥

নতুন নায়ক ঈশ্বর ভূমিহীন কৃষাণ, বর্তমানে মজুর। মজুর নায়ক মধ্যবিত্ত নায়কের মতো একক, স্বতন্ত্র নয়। তাই নগেন্দ্রনাথ বা মহিমের মতো স্ব-প্রধান মনোলোক বিশ্লেষণের নীতি এখানে মানিকবাবু গ্রহণ করেন নি। আজিজ, মণ্টু ইত্যাদিকে নিয়েই শ্রমিকদের সংহত সমাজ। একের দুঃখে অপরের সহযোগিতা, পরস্পরকে ভুল না বোঝা অগ্রসর শ্রমিকচেতনার পরিচায়ক। এই উপন্যাসে মানিকবাবু তাকেই রূপায়িত করেছেন। সেজন্যেই প্রশ্ন জাগে, এতগুলি পরিণতবুদ্ধি শ্রমিক থাকা সত্ত্বেও কারখানার অসন্তোষ শেষপর্যন্ত কেন ধূমায়িত

বিক্ষোভের স্তরে রয়ে গেল? ঈশ্বর কারখানা গেটের প্রহরী মাত্র থাকায় উপন্যাসে নতুন নায়কের আবির্ভাব স্বীকৃতি মাত্র পেল, কিন্তু পরিণতি খণ্ডিত হলো। অথচ ধর্মঘটের পটভূমিতে উচ্চকোটির সঙ্গে নিম্নকোটির 'সংঘাত' ভালো ফুটত, ঈশ্বরের বাহুবল কেবল পশু-শিকারে এবং মনোবল নির্ভীকতায় মাত্র প্রতিফলিত না হয়ে আরো বাস্তবভাবে প্রকাশিত হতে পারত। ঈশ্বরের সারল্য, বন্য বলিষ্ঠতা, সহজাত নীতি, বিবেকবোধ যতটা আছে; ততটা নেই সংগ্রামের পরিচয়। তবু ঈশ্বর কুবের, ধনঞ্জয় নয়; মনোভাবে, চিন্তায় সে অনেক আধুনিক। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে কর্মী ঈশ্বর ভাবুক হয়ে পড়েছে: "মা ছাড়া জীব বা জীবন সম্ভব নয়। কিন্তু আরেকটা দিকও তো আছে। ভ্রূণহত্যা হচ্ছে না সংসারে? সন্তানকে মরণের মুখে তুলে দিয়েও ফূর্তি খুঁজে বেড়াচ্ছে না অনেক মা? অন্ধ মায়ার বিকারে অনেক সন্তানকে মেরে ফেলছে না? (আজকাল একটু ভাবতে শুরু করেছে বলেই কি এসব ভাবনা তার মগজে সহ্য হয়!)" মাতৃত্ব সম্পর্কে দরিদ্র ও অভিজাত নারীর দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভিন্ন। লেখকের শ্রেণীচেতনা যেন নায়কচরিত্রে আরোপিত হয়েছে, আখ্যানধারার অনিবার্য ঘটনাপরম্পরায় এই চেতনা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠে নি।

॥ ৬ ॥

'ইতিকথার পরের কথা' 'পুতুল নাচের ইতিকথা'র সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত, 'শহরবাসের ইতিকথা'র পরবর্তী কাহিনী বললে অত্যুক্তি হয় না; কিন্তু আসলে স্বতন্ত্র কাহিনী। ক্ষীয়মান বারতলার জমিদার পরিবারের একমাত্র সন্তান শুভময়। সে উচ্চশিক্ষিত, স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রভাবে ভারতে স্বাধীন শিল্প নির্মাণের স্বপ্নে তন্ময়। গ্রামের 'নবশিল্প মন্দির' তারই সাক্ষ্য। কিন্তু বৃহত্তম দেশের অর্থনৈতিক জীবন যখন কোটিপতিদের কবলে রাহুগ্রস্ত, তখন ছোট একটি লণ্ঠনের কারখানা

কতটুকু আলোকিত করতে পারে। বিষণ্ণ হতাশ শুভময় অন্তর বৃহৎ কল্পনার পূরণ করতেই সমুদ্রযাত্রা করল। বিদেশের দুরূহ বিজ্ঞানের পরীক্ষায় প্রভূত সাফল্য অর্জন করে সে দেশে ফিরে এলো। বোম্বাইয়ের বিরাট কাপড়ের কলগুলি দেখে শুভর মনে হয়েছিলঃ "এদেশে কাপড়ের মিল গড়ার জন্যই তো চরকার আন্দোলন।" শুভময় গতানুগতিক ধারার জমিদারনন্দন নয়। পারিবারিক আভিজাত্যের প্রচ্ছদপট ফেলে দিয়েও সে স্বগ্রাম, স্বদেশ, প্রতিবেশীর কথা চিন্তা করতে পারে। 'ধাত্রীদেবতা'র শিবনাথের সঙ্গে 'ইতিকথার পরের কথা'র শুভময়ের পার্থক্য আছে। শিবনাথের বাবা জমিদারগোষ্ঠীর কলুষমুক্ত ছিলেন—সর্বোপরি লক্ষণীয়, অজ্ঞান বয়সেই শিবনাথ পিতৃহীন হয়েছিল। তাই তার চরিত্রে স্নেহময়ী শৈলজা ও জ্যোতির্ময়ীর প্রভাবই বর্তমান, পিতৃপ্রভাব নেই। শুভময়ের পিতা জগদীশের ঐশ্বর্যরবি অস্তোন্মুখ; তবু প্রজাপীড়ন, মিথ্যা মামলা, পুলিশের সহযোগ সবকিছুতেই তাঁর প্রতাপ অনুভব করা যায়। শিশু শুভময়ের প্রতি পিতৃস্নেহের প্রকাশই কি কম দুঃখজনক হয়েছিল। ভোলা বাগ্দীর আঙুল কাটা যায়, নায়েব কালীচরণের প্রহারে জর্জরিত কৈলাস অচৈতন্য হয়ে পড়ে।

এহেন শুভময় যৌবনে পিতৃ-পিতামহের অনুগামী হয় নি। শিবনাথ নাগরিক সভ্যতার সঙ্গে সামঞ্জস্য করতে না পেরে ময়ূরাক্ষীতীরে কৃষিক্ষেত্র বানিয়ে আত্মনির্বাসন বরণ করেছে; শুভময় বহুভ্রান্তি, প্রতিকূলতা, বিরোধকে জয় করে নতুন শিল্পোন্নয়নে অংশীদার হতে চেয়েছে। কিন্তু 'ইতিকথার পরের কথা'র সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চরিত্র শুভময় নয়, কৈলাস দত্ত, শ্যামাসঙ্গীত গায়ক ত্রিভুবন দত্তের পুত্র। কৈলাস কলকাতায় শ্রমিকের কাজ করে, ছুটির দিনে বারতলা যায়। শ্রমিক কৃষক পৃথক নয়, গ্রামের কৃষাণ বোঝে না শহরের শ্রমিকের সংগ্রাম, শ্রমিকও জানে না কৃষকের সমস্যা। কৈলাস প্রাক্তন কৃষক, বর্তমানে শ্রমিক; এবং কৃষক ও শ্রমিকের মধ্যে যোগসূত্র।

যুদ্ধফেরৎ খোঁড়া গজেনের মেয়ে লক্ষ্মীর সঙ্গে কৈলাসের যোগাযোগ দীর্ঘকালের, কিন্তু একের সঙ্গে অন্যের কি গভীর অচ্ছেদ্য সম্পর্ক, তা সহজে বোঝা যায় না। নানা সুখ-দুঃখের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সেই সম্পর্ক উপলব্ধি করতে হয়। ইতোমধ্যে অন্যগ্রামে লক্ষ্মীর বিবাহ হওয়ায় তাদের সম্পর্কে বিচ্ছেদ ঘটে। সাংসারিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে লক্ষ্মীছাড়া মানুষটাকে গৃহমুখী করার বাসনা নিয়েই দূর সম্পর্কীয় বোনের সঙ্গে লক্ষ্মী কৈলাসের বিবাহ দেয়। তারপর লক্ষ্মী ফিরে আসে বাপের বাড়ি, কৈলাসের স্ত্রী দশদিন পর সাপের কামড়ে মারা যায়।

'হলুদ নদী সবুজ বন'-এর ঈশ্বর ও লখার মার প্রেম এবং কৈলাস-লক্ষ্মীর প্রেম তুলনীয়, অথচ সর্বথাতুল্য নয়। দুটিই অবৈধ প্রণয়ের নিদর্শন, দুটি ক্ষেত্রেই প্রণয়ের ভিত্তি গভীর সহমর্মিতা। লক্ষ্মী ও লখার মা "দুজনেই ঘা-খাওয়া পোড়-খাওয়া ঘাগী মানুষ সংসারের।" বাইরের জৌলুসে এই প্রণয় আলোকিত নয়। ঈশ্বরকে ভালোবেসেই লখার মা গৌরীর শোকমোচনে ব্রতী হয়, গৌরীকে সন্দেহ-বিষবাষ্প থেকে দূরে রাখবে বলেই দীর্ঘদিন সে ঈশ্বরের কুটিরের পথ মাড়ায় নি। আবার বন্যা-বৃষ্টির দুর্দিনে আসন্ন মরণের হাত থেকে সেই ঈশ্বরকে বাঁচাতে অগ্রণী হয়েছিল। 'ইতিকথার পরের কথা'য় পরিস্থিতি ভিন্নতর। কৈলাস দায়মুক্ত, লক্ষ্মীরও স্বামীগৃহের স্মৃতি মধুর নয়। কৈলাস বাদাবনের শ্রমিকের চেয়ে অনেক পরিণত রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন, লক্ষ্মীও কথকতা করা মেয়ে নয়। নির্যাতিত প্রবীন দেশকর্মী জীবনবাবু বহুদিন পর গ্রামে ফিরে অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ায় সকলে লোচনের বাড়িতে জড়ো হয়ে যখন তার সেবা শুশ্রূষা করল, তখন লক্ষ্মীও ছিল। গভীর রাতে সে বাড়ি ফেরে। সুতরাং কৃষকের ঘরের মেয়ে হলেও লক্ষ্মী যথেষ্ট সপ্রতিভ মেয়ে। যুদ্ধের পর বলেই এমন সপ্রতিভতা সম্ভব। পুলিশের ব্যাটনের দাগ তার কপালে, আজো মাঝে মাঝে অসহ্য যন্ত্রণা হয়। "যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ সৈন্য পুলিশ দাঙ্গা-হাঙ্গামা ধানের লড়াই একেবারে ওলটপালট করে দিয়ে গেছে চেতনা।...প্রচণ্ড

ঘটনার আধুনিক ট্র্যাক্টর চষে দিয়ে গেছে অনুভূতির ক্ষেত, এখনো দিয়ে চলেছে।"

কৈলাস-লক্ষ্মীর ব্যক্তিগত জীবনে ব্যর্থতার অভিশাপ, অথচ তারা নৈরাশ্যপীড়িত নয়, জীবনসংগ্রামে ক্লান্ত নয়। শুভময়ের ক্ষুদ্র শিল্পগঠনের উদ্যোগ যখন রূপায়িত হলো বাসন তৈরির কারখানায়, তখন লক্ষ্মী হলো তার সহায়িকা। চাকুরিপ্রার্থী হয়ে সে আসে নি, শুভময়ই উপযাচক হয়ে তার পরামর্শ চেয়েছে। কৃষকবধূদের মধ্যে আধুনিক সংগ্রামের বার্তা ছড়িয়ে দেয় লক্ষ্মী। কৈলাসও কৃষকসমাজের যথেষ্ট গণ্যমান্য। তার অভিমত, পরামর্শ নন্দ ডাক্তারের কথার চেয়েও চাষীদের কাছে বেশি মূল্যবান। শুভময় সম্পর্কে সে প্রথমে সন্দিগ্ধ ছিল। কারণ শুভেচ্ছা বাইরের জিনিস, আর দৈনন্দিন জীবনে ছোট-বড় নানা ব্যাপারে পিতৃনিন্দা শোনা বড় কঠিন। পিতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো আরো কঠিন। কিন্তু শুভময় পরীক্ষায় অনেকটা উত্তীর্ণ হয়েছে, যার ফল গৃহত্যাগ। জগদীশ তাকে ত্যাজ্যপুত্র করেন। শুভময়ও উদ্‌ভ্রান্তের মতো কিছুকাল কলকাতা ঘুরে আবার গ্রামে আশ্রয় নিল। গৃহে নয়, কৃষক-কারিগরদের মধ্যে। যে কোনো বাড়িতেই তখন তার ঠিকানা। শুভময়ের প্রণয়িনী মায়া প্রাণের তাগিদে সর্ব অভিমান ত্যাগ করে তাকে নিতে এসেছে কৃষকপল্লী থেকে। লেখক ইঙ্গিত দিয়েছেন, কৃষক আন্দোলনের সহমর্মী হয়েও শুভময়-মায়ার প্রেমে ভাঙন ধরে নি। প্রকৃত প্রেম মহত্তর। সেখানে লক্ষ্মী, মায়া, বনানী, আইভি ভিন্ন নয়।

শুভময় সামন্ত মনোভাব ধীরে ধীরে ত্যাগ করেছে, কৈলাস নিম্নবিত্ত থেকে কৃষক-মজুরে পরিণত হয়েছে। অর্থনৈতিক দায়ে, রাজনৈতিক চেতনার আলোকে ধনতন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী আঘাতে মানুষের মনের শ্রেণীচ্যুতি ঘটছে। 'ইতিকথার পরের কথা'র শুভময়; নন্দ কৈলাস তার সাক্ষী। এখানেও মানিকবাবু দেখিয়েছেন, রিক্ত দরিদ্র মানুষগুলি জেনেছে সংহতির শক্তি কী অমোঘ। ঘনরাম, গজেন,

সনাতন, লোচন, কৈলাস, নন্দ সকলে মিলে অন্যায়ের প্রতিবাদ করে।

'ইতিকথার পরের কথা' দ্বিধারা কাহিনী। শুভময়, মায়া, ভূদেব ইত্যাদিকে নিয়ে একটি ধারা ; বিলাতী খেতাবধারী ডাক্তার ভূদেবের একমাত্র কন্যা মায়ার সঙ্গে শুভময়ের প্রণয় কাহিনী বহু উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে একটি পরিণতি লাভ করেছে। অন্যধারা হলো বারতলার গ্রামীণ মানুষদের জীবন-গাথা ; সেই ধারায় নন্দ ডাক্তারের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য, কিন্তু সবচেয়ে আকর্ষণীয় চরিত্র কৈলাস ও লক্ষ্মী। 'হলুদ নদী সবুজ বন'-এর মতোই এখানেও আছে প্যারাললিজ্‌ম, এখানেও যেন লেখকের বক্তব্য : "পরস্পবকে বাদ দিয়ে তাদের কারো জীবনযাত্রা সম্ভব? সম্পর্ক কি শুধু প্রেমে হয়! সংঘাত সম্পর্ক নয়?" এ উপন্যাসেও পাই "শ্রেণীতে শ্রেণীতে ভাগ হয়ে হয়েও একত্র সংগঠিত সমাজের কথা।" তাই কৈলাস, লক্ষ্মী, লোচন, ঘনরাম প্রভৃতি প্রথমে শুভকে সন্দেহ করলেও তার সদিচ্ছাকে, তার প্রগতিশীল মনোভাবকে চিনে নিতে দেরি হয় নি। জগদীশ, জীবনবাবু টাইপ মাত্র ; শুভময়ের মতো যুবক একালে দুর্লভ নয় ; নন্দ, কৈলাস প্রভৃতির জোট তো আধুনিক কৃষক আন্দোলনেরই আলেখ্য। মানিকবাবু আমাদের পরিচিত অভিজ্ঞতাকেই উপন্যাসে গ্রথিত করেছেন। প্রতিবেদকের কাজ শিল্পী নিয়েছেন। তাই প্রতিবেদন অল্প নেই, কিন্তু শিল্পও ক্ষুন্ন হয় নি। বিশেষত কৈলাস-লক্ষ্মীর মানসিক অবস্থা এবং শুভময়ের অন্তর্দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণে মানিকবাবুর নৈপুণ্য যথেষ্ট শক্তিমত্তার পরিচায়ক।

কৈলাস-লক্ষ্মীর মিলনে যখন কোনো বাধা নেই, তখনও লক্ষ্মী ভাবে : "কদিন তারা মেতে থাকতে পারবে ওভাবে পরস্পরকে নিয়ে? কতদিন স্থায়ী হবে তাদের দুর্দান্ত উন্মাদনা? কদিন তাদের শুধু পরস্পরকে নিয়ে মেতে থাকার সুখ?" দুটি পোড়খাওয়া নর-নারীর জীবনে প্রেম এলো, কিন্তু তার প্রকাশ ব্যাহত। লক্ষ্মী ও

কৈলাসের আন্তরিক জৈবআবেগ সত্ত্বেও পরস্পরের প্রতি বিবেচনা, সংযম এবং সমব্যথী সকলের জন্য সংগ্রামস্পৃহা তাদের প্রেমকে মহনীয় করেছে। "কৈলাস তার মনুষ্যত্বে বিশ্বাস ফিরিয়ে এনেছে।" সেজন্যেই লক্ষ্মী কৈলাসের সর্বতোভাবে কল্যাণ চায়।[১] সে তুলনায় মায়ার প্রেমের ভাষা একটু অশ্লীলই মনে হয়ঃ "খিদে পেয়েছে খাবার রেডি, তুমি উপোস করছ কেন সেটা বরং বুঝিয়ে বল। আমিও খিদে নিয়ে উপোস করে চলেছি মনে রেখো কিন্তু।" রূপকের একটা আবরণ আছে বটে, কিন্তু সেখানেও খাদ্য-খাদকের সম্বন্ধ!

॥ ৭ ॥

অতি সাবধানী লেখকের কলম থেকে উপরি-লিখিত বই দুটিতে একই ধরনের ত্রুটি নিঃসন্দেহে তাঁর প্রতিভার পক্ষে গৌরবজনক নয়। মানিকবাবু অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে লিখতেন। বলা বাহুল্য, বিশ্লেষপ্রাণ কথাশিল্পে বাগর্থ অপৃথগ্‌ যত্ন নির্বত্য হয়ে থাকে না; তার জন্য সুস্থির অনুশীলন চাই। তবেই মনে হবে যেন বাক্য ও ঈপ্সিত অর্থ এক প্রযত্নে সিদ্ধ হয়েছে। কিন্তু মানিকবাবু সে অবকাশ পান নি। তাই মানিকবাবু প্রচণ্ড শক্তিধর প্রতিভা, কিন্তু পূর্ণতার বৃত্তে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন নি। তুলনীয় কাজী নজরুল ইসলাম। তিনিও অত্যন্ত ক্ষিপ্রহস্ত, উচ্চকণ্ঠ কবি। তাঁর কবিতা হাতে নিয়ে ওয়ার্ড্‌স্বার্থের সংজ্ঞাকে সর্বথা প্রযোজ্য মনে হয় না। আবেগের নির্জন স্মৃতিচর্বণাই কবিতার উৎস ("Poetry takes its origin from emotion recollected in tranquility") হলে নজরুল ইসলাম কবি নন। আগ্নেয়গিরিকে বলা যায় না, তুমি স্থির হও, স্নিগ্ধ

১. লেখকের ব্যাখ্যা: 'কৈলাস আর লক্ষ্মীর মাঝখানে দুস্তর বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, মানুষের মনের যুগ যুগান্তরের সংস্কার আর কুসংস্কারের স্তূপ, জনতাকে না ডিঙিয়ে তাদের মিলনের উপায় নেই।' এই ব্যাখ্যা গ্রন্থমধ্যে অপরিহার্য ছিল না।

হও, কান্ত হও। নজরুলের কবিতা যেমন ক্রোধ, ক্ষোভ, ঘৃণার অগ্নিস্রাবী বাণীরূপ ; মানিকবাবুর কথাশিল্পও সাধারণ মানুষের স্বপক্ষে বক্তব্যের তীব্রতা নিয়ে উপস্থিত। সেই বক্তব্য সর্বদা শান্ত, কান্ত হলে প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে ব্যবধান হ্রস্ব হয়ে আসে। তবু কয়েকটি ত্রুটি উপন্যাসের প্রকরণকেই দুর্বল করেছে, সুতরাং বক্তব্যের গভীরসঞ্চারী প্রভাব সেখানে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। 'হলুদ নদী সবুজ বন'-এ ঈশ্বরের বারংবার অরণ্যচারণা (উপলক্ষ যতই ভিন্ন হোক) আসলে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি, তাই শেষপর্যন্ত চরিত্র তার প্রাণবেগ হারিয়ে ফেলেছে। 'ইতিকথার পরের কথা'য় কোনো কোনো জায়গা অবান্তর ব্যাখ্যায় ভারাক্রান্ত। শুভময়কে লোকজীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দেবার জন্য রুদ্ধদ্বার ডাক্তারখানায় তাকে রেখে বাইরের দাওয়ায় নন্দর কৃষক-বৈঠক চালানোর ব্যবস্থা কিঞ্চিৎ হাস্যকর। গ্রামীণ মানুষের গৃহস্থালীর সমস্যা জানার আগ্রহে লক্ষ্মীর ভূমিকাকে লেখক অহেতুক একটু বেশি মূল্য দিয়েছেন।

'শান্তিলতা' একটি চরিত্রের আশ্রয়ে লেখকের মানস-রূপান্তরের সাক্ষ্য। এখানে লেখকের কল্পনার ভিত্তি একটি উদ্বাস্তু মেয়ে, নাম শান্তিলতা। বৃদ্ধ পিতা চন্দ্রনাথকে নিয়ে সে কলকাতায় এসে বাসা বাঁধল শহরতলীর এক বস্তীতে। চন্দ্রনাথ তখন কাজকর্মে অপারগ, তারপরে আছে বিবাহযোগ্যা মেয়েকে পাত্রস্থ করার দুশ্চিন্তা। তাই সাময়িক উন্মত্ততা তাঁকে আক্রমণ করল। অবস্থামতো চিকিৎসা হলো, কিন্তু চন্দ্রনাথ হার্টফেল করে মারা গেলেন। এই উপন্যাসটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস নয়, টুকরো টুকরো বাক্যে লেখা উপন্যাসের খসড়া। এর বর্ণনা-বিবৃতি এত কাটা কাটা যে সাবলীলতা ব্যাহত হয়। উপন্যাস-কাহিনীর পরিপূর্ণ কাঠামো অনুধাবন করতে গেলে পাঠককে প্রতিটি বাক্যের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। "শান্তিলতার রঙ খুব কাল। গড়ন-পিটন আশ্চর্যরকম। খাঁটি ভীল সাঁওতাল মেয়েদের পর্যন্ত যেন হার মানায়।"

চন্দ্রনাথ প্রায়ই চিন্তিত থাকেন। আকাশ-পাতাল চিন্তা। দেশ-বিভাগের পর সুখ-শান্তি-ভালোবাসা, মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্য সম্বন্ধে ধারণাগুলি সব যেন তাঁর গোলমাল হয়ে যায়। একদিনের ঘটনা। দু-তিন রাত্রির পর চন্দ্রনাথ ফিরে এলেন। উস্কোখুস্কো চুলে, কাদামাখা পায়ে। মেয়েকে বলেন, "মাঝে মাঝে মনটা কেমন বিশ্রী হয়ে যায় জানিস, সংসারে কাউকে ভালো লাগে না। চেনা মানুষগুলোকে তো আরও না। তোকেও না।" চন্দ্রনাথের সাময়িক উন্মত্ততা মানসিক ভারসাম্যহীনতার ফল। এখানে কোনো উদ্ভট মনস্তাত্ত্বিকতা মানিকবাবুর লক্ষ্য নয়, দৃঢ় বাস্তব ভিত্তির পরেই তার প্রতিষ্ঠা। চন্দ্রনাথের আত্মভাষণে তার পরিচয় আছে: "হিসেবে সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে শান্তি, কোথাও থই পাচ্ছি না। এতদিন ধরে যা শিখেছি যা বুঝেছি এই সহরের সঙ্গে দেখি তার কিছুই খাপ খায় না। একদিন সব কথা তোকে বলব। তোকে ছাড়া আর কাকেই বা বলব?" কিন্তু জীবনের অভিজ্ঞতার সারবস্তু তিনি আর শান্তিলতাকে বলে যাবার অবকাশ পান নি।

উপন্যাসে তথা শান্তিলতার জীবনে মোড় ফিরল সুখেন্দুর আবির্ভাবে। সুখেন্দুও উদ্বাস্তু, ভাগ্য অন্বেষণে শহরতলীতে একটা সাইকেল মেরামতের দোকান করেছে। পথিমধ্যে চন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় তাকে তিনি নিয়ে এলেন তাঁদের বস্তীতে। "খাঁকি সার্টের সব কটা বোতাম খোলা, আস্তিন দুটো গুটিয়ে কনুয়ের ওপরে তোলা, পায়জামার কিনার দুটো হাঁটুর ওপর উঠে এসেছে, পিছনে উলটানো চুলের ছোট ছোট দুটি গুছি ভুরুর ওপর এসে পড়েছে।" সে চন্দ্রনাথকে সৌভাগ্যের লোভ দেখিয়ে নিজের অজ্ঞাতেই তাঁকে কুপথে নিয়ে গেল। চন্দ্রনাথ মাঝরাতে মাতাল হয়ে ফিরলেন।

এহেন চন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর শান্তিলতা সংসারে একা রইল না। বিমল তাকে একটি স্কুলে কাজ করে দিল। বিমলকে নিয়ে আর এক উপকাহিনী। ইঙ্গিতে আভাসে বোঝা যায়, বিমল মার্কসবাদে

বিশ্বাসী, সে রাত জেগে এঙ্গেলসের 'পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' পড়ে, বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'-এর ছিয়াত্তরের মন্বন্তর অংশ তাকে উদ্দীপিত করে। এই বিমলের সাহায্যেই শান্তি বাবার চিকিৎসা চলিয়েছে, জেনেছে মানুষ কেন দরিদ্র হয়। বিমলের সাহায্যে ইস্কুলে শিক্ষকতা পেয়ে শান্তি বস্তী ছেড়ে চলে এসেছে জীবন মাইতির বাড়ি। সেখানে প্রধান শিক্ষিকা মনোলতার সঙ্গিনী হলো শান্তিলতা। যেমন শান্তিলতার জীবনের ছক বদলাল তেমন সুখেন্দুও বদলেছে। যে সুখেন্দু ছিল শান্তির চোখের বিষ, যার দেওয়া দুধের বোতল রাগ করে মাটিতে ফেলে দিয়েছে, তার প্রতি আর শান্তি নির্মম নয়। মনোলতা ও শান্তির কথোপকথনে তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

"—সুখেন্দুকে ভোগাচ্ছিস কেন? তাকে স্পষ্ট করে কিছু বলছিস না কেন?

—আমার কথাতো আমি বলে দিয়েছি। কারবার তুলে দিতে হবে।···ও লোক-ঠকানো কারবার, ওতে বুদ্ধি পচে যায়।

—তুলে দিয়ে খাবে কি?

—কারিগর মানুষ, কারিগর ছিল, আবার কারিগর হতে হবে। ···মদ ছাড়বে বলে সকলের সামনে প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

—তোর কথা যদি ও মেনে নেয়?

—তার কথাও আমি মেনে নেব।"

সুখেন্দুর জানা হিসেবে এ-মেয়েকে মাপা যায় না। মেয়ে বলতে সুখেন্দু এতকাল সোজা হিসেবে তার মাকেই বুঝে এসেছে। নীরব, নম্র, বাধ্য। তাই ক্ষোভে, অসন্তোষে যে-মেয়ে অভাবগ্রস্ত হয়েও দুধের বোতল টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে, তার প্রতি একটা কৌতূহল জাগ্রত হয়েছে! "তার মনে হয় শান্তিলতার রুখে দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা যেন অননুকরণীয়।"

সুখেন্দু কেমন করে নতুন হিসেব মিলিয়ে শান্তিলতার মনে স্থান করে নিল সেই কাহিনীটুকু ঔপন্যাসিক মনস্তত্ত্বের দিক থেকে

প্রয়োজনীয়। কিন্তু উপন্যাসের বর্তমান আকারে সেই অংশটি একেবারে উহ্য। হয়তো মনোবিকাশের স্বাভাবিক স্তরগুলি জাত-ঔপন্যাসিকের পুনর্লিখনে প্রস্ফুটিত করবার পরিকল্পনা ছিল। পূর্বেই বলেছি—'শান্তিলতা'র লিখিত রূপ উপন্যাসাকার নয়, উপন্যাসের খসড়া মাত্র।

সুখেন্দু ও শান্তিলতার বিবাহরাত্রি বর্ণনা ঔপন্যাসিকের মানস-রূপান্তরের পরিচায়ক। মানিকবাবুর কমবেশি ষাটখানি গল্প-উপন্যাসের মধ্যে মধুর মিলনদৃশ্য বিরল। 'শান্তিলতা' উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। লেখক এখানে নরনারীর দাম্পত্যপ্রেমকে তীক্ষ্ণ, তির্যক সমালোচনার শরে ছিন্নভিন্ন করেন নি। বস্তীর নিচু জানলা দিয়েও যেমন আকাশের রোদ আসে; তেমনই দুঃখী, জীবনসংগ্রামে ক্ষয়িত মানুষের জীবনেও মিলনের ফুল ফোটে।

ফুলশয্যার সংক্ষিপ্ত বর্ণনাটি সহজ ও সুন্দর। তার পরেই ঘটনার পট-পরিবর্তন। দীর্ঘকালের ব্যবধান অকথিত। শান্তি-সুখেন্দুর আঘাত-সংঘাতময় জীবনে ঘটনাপরিবর্তন হয়েছে আকস্মিক ভাবে ('প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান'-এ চপলা-মৃদুলা বিবাহও ঘটনাচক্রে এবং আকস্মিকভাবে সম্পন্ন হয়েছে)। কেবল তাৎপর্যময় মুহূর্তগুলিরই সংক্ষিপ্ত আলেখ্য লেখক লিপিবদ্ধ করেছিলেন পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসে ব্যবহারের জন্য।

আর একটি দৃশ্য। শ্রমিক বস্তী বারো ঘর এক উঠোনের সংসার। রাসমণি, লক্ষ্মী, চাঁদি, শান্তি প্রভৃতি সংলগ্ন খুপরির বাসিন্দা। এক ঘর থেকে ওর উঠোন, ওর উঠোন থেকে তার ঘর চোখে পড়ে। সুখেন্দু রাগের বশে শান্তিকে 'আথালি পাথালি' মেরেছে। দড়ি দিয়ে শক্ত করে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বেঁধেছে। ইচ্ছে করলেই যে কেউ খুলে দিতে পারে, সুখেন্দু বাড়ি নেই। কিন্তু তাতে অত্যাচার বরং বাড়বে, কমবে না। রাগী মানুষ সুখেন্দু। ব্যঙ্গের সুরে হয়তো জানিয়ে দেবে: "শান্তিকে তারা যখন আদর করে নিয়ে গেছে, শান্তি তাদের কাছেই থাকুক।"

তবুও তারা নির্মম হতে পারে নি। শান্তির তৃষ্ণায় সারদা

এ্যালুমিনিয়ামের গেলাস ভরে জল এনেছে, রাসমণি তার মুখে দানাদার গুঁজে দিয়েছে। ধীরে ধীরে রাত্রি গভীর হয়, যে যার ঘরে শুয়ে পড়ে। সুখেন্দু তখনও আসে নি। একটু পরেই তার কারণ জানা গেল। তখন কারখানার ভাড়াটে গুণ্ডাদের হাতে প্রচণ্ড মার খেয়ে সুখেন্দু অচৈতন্য। "গুণ্ডা হিসাবে রাজারই সামিল" রাজাবাবু সেই বস্তীতে সবারই পরিচিত। কারখানার মালিকের পক্ষ হয়ে শ্রমিক-বিক্ষোভ দমন করাই তার কাজ। "সুখেন্দুকে ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে বিছানায় আছড়ে ফেলে রেখে তারা বেরিয়ে আসে।" রাত গভীর হলেও বস্তীর উৎকর্ণ মানুষ ধীরে ধীরে জানলায়, গলিতে, উঠোনে সমবেত হলো। "কোনো দুঃখের নাটকে সবাই যেন নীরব দর্শক।" শান্তি দাঁত দিয়ে কামড়ে কাটল দড়ির বাঁধন, আলো জ্বেলে দেখল "সুখেন্দুর চোখ টকটকে লাল।" সুখেন্দু দেখল, শান্তিলতার মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে। শান্তির ডাকে সকলে কাছে এলো, কিন্তু টিটকারি দিল না। সেবা-শুশ্রূষায় সারা বস্তী একটি একান্নবর্তী পরিবারের মতো নীরবে চঞ্চল হয়ে ওঠে। ডাক্তার আসতেও দেরি হয় না। অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর সুখেন্দুর কণ্ঠে সংক্ষিপ্ত আত্মবিচারণা—"আর তোকে মারব না শান্তি, আর তোকে বাঁধব না।"

কারখানায় একটা গণ্ডগোল বেধেছিল। বড় সাহেবের ফুলবাগান কে মুড়িয়ে খেয়েছে। ছোটসাহেবের কাছে কৈফিয়ৎ চাইলে তিনি বলেছিলেন : "ফুলগাছ কে মুড়িয়ে দিয়েছে জানি না সার। আমার ডিউটি মেশিনারি কেউ না ড্যামেজ করে দেখা, প্রডাকশন আরও অন্ততঃ হাফ পার্সেন্ট বাড়াবার জন্য ফ্যাক্টরী আইন মান্য করে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।" কথা সম্পূর্ণ হবার আগেই বড়সাহেব এক চড় দিলেন ছোট সাহেবকে। তারপর কারখানায় গোলযোগ, চুরি ঘোষণা, পাগলা ঘণ্টি এবং ছুটির পরে দেড় ঘণ্টা বাধ্যতামূলক ওভারটাইম। তার প্রতিবাদ করেছিল সুখেন্দু। তারই ফলে সুস্থ মানুষ অসুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরল।

মানিকবাবু কতকগুলি তাৎপর্যবহ কিন্তু বিচ্ছিন্ন কাহিনী একত্র গেঁথেছেন। নিছক গল্পরস পরিবেশনের জন্য গল্পের মূল্য তিনি কোনো দিন স্বীকার করেন নি। উদ্বাস্তু চন্দ্রনাথ, শ্রমিক সুখেন্দু, ছোটসাহেব কুমার রায়—সকলেই ধনতন্ত্রের অলাতচক্রে বাঁধা। নিজের অসহায় বিক্ষোভ সুখেন্দু প্রকাশ করে শান্তির ওপরে; কুমার রায়ের প্রতিহিংসা শ্রমিক-প্রহারে প্রকাশিত। বড়সাহেবের কাছে ছোটসাহেব এবং ছোটসাহেবের কাছে সুখেন্দু এক। কুমার রায়ের নাম ও পদবী পর্যন্ত বড়সাহেবের খেয়ালখুশিতে বদলে যায়।

॥ ৮ ॥

শান্তিলতা আর গ্রামবাংলার মেয়ে নয়, সুখেন্দুরও চোখে নেই গ্রাম্য যুবকের স্বপ্ন; একজন ইস্ট এ্যাণ্ড ইঞ্জিনিয়ারীং ওয়ার্কসের টার্নার সুখেন্দু দাস, আর একজন তার স্ত্রী। ইয়াকুব আলি কেবল একটি নতুন নাম নয়, এই উপন্যাসে নতুন রক্তের সংযোজন। স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ভারতবর্ষে এখন মধ্যবিত্তের দ্বৈধ দশা—এক অংশ সদ্যোত্থিত ধনিক-শ্রেণীর পক্ষপুটাশ্রয়ে আভিজাত্যের উচ্চতর সোপানের অভিমুখী। অন্য অংশে যারা নিম্ন মধ্যবিত্ত, নির্বিত্ত শ্রমিকসমাজের সঙ্গেই তার আত্মীয়তা। ইয়াকুব আলির সঙ্গে সুখেন্দুর মিতালি সেই নবগঠিত মধ্যবিত্ত-শ্রমিকসমাজের পরিচায়ক। মানিকবাবু শেষ পর্বের উপন্যাসে ও গল্পে মধ্যবিত্তের এই নবপরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন।

কুমার রায়, মা নলিনী ও নিখিলকে নিয়ে মধ্যবিত্তের ওপরে ওঠার কাহিনী। কোম্পানীর পক্ষ থেকে কুমার রায় বিলেত যাবে। একটি এরোপ্লেনের অগ্নিদাহ দেখে নলিনী আপত্তি তুললেন। সেই অগ্নিদাহ দেখেছে সুখেন্দু। শম্ভু মাঝির গোটা চালাঘর পুড়ে ছারখার হয়ে গেল। তার দুঃখের কথা নিয়ে ভেবেছে সুখেন্দু। নিজের কথাও অনেক তোলপাড় করেছে মনে মনে। সাথী ইয়াকুবের কথায় সে আত্মবিশ্বাস

লাভ করে। "টার্নার সুখেন্দু। জড় ধাতুখণ্ডকে ঘষে মেজে গড়ে পেটে—নিরবয়ব পিণ্ড রূপ পায়, আকার পায়। সুখেন্দুর মস্তিষ্কের নির্দেশে আর হাতের তাড়নায় বস্তু হয়ে ওঠে, যন্ত্র হয়ে ওঠে গতির প্রতীক, আর সৃষ্টির সহায় হয়ে ওঠে।" সুতরাং সেও অল্প নয়, তুচ্ছ নয়। এই দৃষ্টিতে শান্তিলতাকেও সে নতুন চোখে দেখেছে। এতদিনে শান্তিলতার মনের মূল্য দিতে চেয়েছে। "আজ শান্তিলতার মনের অগাধ ভালোবাসা, অসীম ধৈর্য আর অতল শান্তির উৎসে স্নান করে দিনে দিনে নতুন হয়ে উঠছে সুখেন্দু।"

অনেক ভুল বোঝাবুঝির পরে সুখেন্দু-শান্তিলতার এই প্রকৃত মিলন। তাই পরদিন সন্ধ্যায় যেন সুখেন্দুর কাছে নতুন রূপে উদ্ভাসিত হবার জন্যই শান্তি পরেছে ফুলশয্যার নীলাম্বরীখানা, সযত্নে চুল বেঁধেছে, খোঁপায় দিয়েছে মালা। পুষ্পর মা পরিয়ে দিয়েছে সিঁথিতে সিঁদুর, কপালে কুম্‌কুম্ টিপ। ঠিক এই মুহূর্তে কাহিনীর গতিপরিবর্তন! গর্ব করে শান্তিলতা বলেছিল: "আমার নাম শান্তি"। কিন্তু শান্তি সে কোনোদিন পায় নি। আর একটি মাহেন্দ্রলগ্ন যখন প্রত্যাসন্ন, তখনই উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে সুখেন্দুর সহকর্মী সহদেব। রাজাবাবুর দলের গুণ্ডামিতে শ্রমিকরা আহত হয়েছে, সুখেন্দুর মাথা ফেটে গেছে। সে হাসপাতালে। শান্তিলতা সহদেবের সঙ্গে হাসপাতালে গেল। এখানেই উপন্যাসের আপাত যবানিকা। বলা বাহুল্য, কাহিনী এখানে পূর্ণায়ত নয়, শান্তিলতার আরো বিবর্তন সম্ভাবিত ছিল।

'মাঝির ছেলে' একটু স্বতন্ত্র শ্রেণীর রচনা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যিক দ্বিজত্ব এই গ্রন্থের চরিত্র পরিকল্পনায় সুস্পষ্ট। প্রথম পর্বের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'পদ্মানদীর মাঝি'-র স্থান, অঞ্চল, পাত্রপাত্রী প্রভৃতি উপাদানের নব রূপান্তর। যেন নিজের হাতে গড়া কাদা-মাটির মূর্তি ভেঙে শিল্পী সেই উপাদানে আর একবার মূর্তি রচনা করলেন। উপাদান এক, শিল্পমূর্তি ভিন্ন। হারু মাঝির ভাইপো নাগা এর নায়ক। আটখামার স্টীমারঘাটে চব্বিশ ঘণ্টায় তিনবার প্রাণ-স্পন্দন জাগে।

সকালে, দুপুরে আর সন্ধ্যার পর। তিনবারই জাহাজ আসে। এই উপন্যাসে করমতলার যাদববাবু আছেন, একজন সম্পন্ন গৃহস্থ। মাধববাবু তাঁর ভাই, কলকাতায় থাকেন। তিনি দেশে আসছেন বলেই যাদববাবুর নৌকো এসেছে আটখামার ঘাটে। চাঁদ মাঝি দৈবজ্ঞের বাড়ি অসুস্থ হয়ে পড়ায় সে নৌকোয় সাময়িকভাবে নাগা মাঝির কাজে বহাল হলো। মানিকবাবুর সাহিত্যে কৈশোরচিত্র বিরল। 'পদ্মানদীর মাঝি'তে কৈশোরের ছবি ফোটে নি। কিন্তু নাগা চরিত্রটি আকর্ষণীয়। তার কিশোরসুলভ দুর্ধর্ষপনা, অভিমান, ভোজনাসক্তি, অল্পে তৃপ্তি লেখক খুব সুন্দর ব্যক্ত করেছেন। ঘটনা যেমন এসেছে গল্পের অনিবার্য নিয়মে, চরিত্রের সক্রিয়তাও তেমনি ঘটনাকে গতিমণ্ডিত করেছে। অতিরিক্ত সংকেতপ্রবণতা মানিকবাবুর বহু উপন্যাসে চরিত্রগুলিকে অনেকসময় আদর্শপুত্তলি করেছে। 'মাঝির ছেলে' সেই ত্রুটি থেকে মুক্ত।

এক আনার কলহে খুড়ো হারু মাঝির নৌকো ছেড়ে নাগা যাদববাবুর নৌকোয় কাজ নিল। খাওয়াপরার ব্যবস্থা ভালো, আবার বেতনও আছে! ওবাড়ির ছেলেমেয়ে খোকা, কণিকা, মিনতির সঙ্গেও বেশ আলাপ হয়েছে। সে আছে ভালো, কিন্তু তার মতো প্রকৃতির মানুষ শান্তি, স্বস্তির বাঁধা ছকে চলতে পারে না। নাগা অনেকটা তোরাপের উপাদানে গঠিত। অত্যন্ত বলিষ্ঠ, একান্ত সরল, গ্রাম্য, অল্পে অভিমান হয় এবং গোঁয়ার।

বাগানের আম চুরি যায় শুনে সে প্রতিকারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সারারাত বনে ঝোপে বসে থেকে সে চোরের দল ধরে ফেলেছে। কিন্তু তাদের শাস্তির সময় সে-ই বেঁকে দাঁড়ায়। কারণ সে কথার মানুষ। প্রথমে তাঁর কণ্ঠস্বরে ছিল "মিনতি", কিন্তু ছ্যাঁকা দেওয়া শাস্তির কথায় তার বিনয়ের ভাবটা "হঠাৎ যেন উপে গেল"।

"—বড় যে দরদ দেখিয়ে নাগা ?

—দরদ না কর্তা, কইয়া আনছি আর কেউ মারব না।"

তারপরেই গোয়ালে আগুন লাগার ঘটনা। চোর ধরা এবং শাস্তি দেখার উল্লাসে পরেশ তাড়াতাড়ি গোয়ালঘরে খুস্তি পুড়িয়েছিল। শাস্তি হলো না দেখে মনোভঙ্গের বেদনায় সে আগুন নেভাতে ভুলে গেল। নাগাই প্রথম পোড়া জিনিসের গন্ধ শুঁকে বিপর্যয় টের পেল। আর সকলে যখন হতভম্ব, তখন নাগাই একমাত্র প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। বিপদভঞ্জনে সে সেনাপতির মতো, সকলেই তার নির্দেশে খড়ের পুরনো চালাটি ভেঙে ফেলেছে। এই-প্রসঙ্গে যাদববাবুর চরিত্রও সুন্দর ফুটেছে। সকলের সামনে নাগার হাতে নিজের আংটি খুলে পরিয়ে দিয়েছেন যাদববাবু। "শো গিয়া।···ঘুম যদি ভাঙ্গায় তর আমাকে কইস্।" আংটি বা ঘুমের চেয়ে তখন নাগার বড় দরকার খাওয়া। "দুগাল মুড়ি খাইয়া যাই কর্তা।" পরেশ ভয়ে অগ্নিদাহের কারণ গোপন করেছে। তবু আশঙ্কা, পাছে নাগা বলে দেয়। "পরেশের ইচ্ছে হয় গলা টিপে ঘুমন্ত ছোঁড়াটাকে মেরে ফেলে আংটিটা নিয়ে পালিয়ে যায়।" ক্ষণকালীন আগুনের আলোয় মানিকবাবু দুটি কিশোরপ্রাণের অকপট বাসনা, বন্য সরলতার ছবি উজ্জ্বল রঙে এঁকেছেন।

মাঝির ছেলে চাঁদ, হারু, নকুল, নাগা এই উপন্যাসের প্রাণবীজ ধারণ করে আছে। তবু যাদববাবু এই মাঝিদের জীবনসূত্রেগ্রথিত কেন্দ্রীয় পুরুষ। আটখামার ঘাটে গিয়ে যাদববাবু পরেশের দু-টাকা জরিমানা করলেন। "তুই একটা আস্ত বাঁদর পরেশ।···এতকাল যে আছিস আমার কাছে, বিনা দোষে শাস্তি দিতে আমায় তুই কবে দেখছস্ রে হারামজাদা? আমার হুকুমে শিক তাতানের লাইগা আগুন ধরাইছিলি দুপুর রাইতে, ঘুমের চোখে আগুন নিভাইতে ভুইলা গেছিলি তো গেছিলি। অমন ভুল মাইনসে করে। যখন জিগাইলাম মিছা কইলি ক্যান?" আবার পরেশের সঙ্গে নাগার কলহ বাধে। পরেশের ধারণা নাগাই সত্য প্রকাশ করেছে। বারবার "গোইন্দা বজ্জাৎ" বলায় নাগা পরেশকে এত কিল চড় লাগিয়েছে যে "এক

মিনিটের মধ্যেই পরেশ চোখে সরষের ফুল দেখতে আরম্ভ করে।" ছোট ছোট কয়েকটি ঘটনা, অথচ বাংলা দেশের মাটির কত ঘনিষ্ঠ পরিচয়। পরেশ, নাগা, কণিকা, রূপা চারটি কিশোর চরিত্র। নানা স্তরের, কিন্তু সকলেই সংসার-অনভিজ্ঞ, মান-অভিমানের রাজ্যে সমকক্ষ।

যাদববাবুর লঞ্চ কেনা থেকেই উপন্যাসে বিশিষ্ট দিকপরিবর্তন। সমুদ্রের সাধ, ভাগ্যান্বেষণের স্বপ্ন তাঁকে দিশেহারা করেছিল। তাই সমস্ত গহনা এবং অনেক সম্পত্তি বন্ধক রেখে 'জলকন্যা' কেনার সময় বুঝতে পারেন নি, সখের লঞ্চে ব্যবসা জমে না। কিন্তু বন্ধ্যামাটির বুক চিরেও যদি ফসল ফলে, অফুরন্ত প্রাণবন্তের ভাগ্য সদয় হবে না কেন। ভিমনা যেন সেই আকাঙ্ক্ষার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মূর্তি। হোসেন মিয়ার মতো রাজাগিরির স্বপ্ন নেই তার, সে বহু দুঃখে পোড়-খাওয়া মানুষ। তীক্ষ্ণ ভিমনার স্বজ্ঞা; স্বল্পবাক বলেই হয়তো সে চরিত্র অনুধাবনে নির্ভুল। তার প্রভুভক্তি আরব্য গল্পের দৈত্যের মতো। তবে হোসেন ও ভিমনা দুজনেই নির্ভীক পুরুষকারের প্রতীক। নাগার গ্রামীণ, সরল শিশুমন প্রথমে ভিমনাকে গ্রহণ করতে পারে নি। ভিমনাও নাগাকে লঞ্চে নিতে রাজি নয়। সমুদ্র তো স্বপ্ন নয়, পদে পদে বিপদ, ঝড়, শত্রু, বিপর্যয়! নাগা, নকুল, পরেশের মতো মাঝির কাছে যাদববাবুই অভিভাবক। কিন্তু জলে অভিযানের কাজে যেন ভিমনাই প্রকৃত কর্তা। অবশ্য ভিমনা কোনো কিছু জোর করে না! তাহলে নকুলের ছেলে বলে পঞ্চু অনায়াসে 'জলকন্যা'-য় স্থান পেত না। যে আকস্মিক বিপর্যয়ে উপন্যাসের ছেদ, তা-ও অন্যরকম হতো।

যাদববাবুর চরিত্রটি বড় মধুর। তিনি যে যথেষ্ট ব্যক্তিত্বশালী নন এটাই তাঁর ত্রুটি। তবু ক্রোধ, ভালোবাসা, বিবেচনা, বিবেক সবকিছু মিলিয়ে অবিস্মরণীয়। সত্যিই যাদববাবু 'ভদ্রলোক মাঝি', করমতলার তালুকদার নেহাৎ বাইরের পরিচয়। হোসেন মিয়া কুবের-কপিলাকে চায় ময়নাদ্বীপে জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য। তার কোনো

মানবিক অনুভূতি নেই। যাদববাবু সকলকে খুশি দেখতে চান। কিন্তু এমন মানুষ জলযাত্রায় অচল। বিশেষত চোরাইমাল বহন করাই যেখানে কারবার। নিতাই সাহার নীতি, ব্যবসায় বুদ্ধি, নীতির চেয়ে ভিমনার কাছে 'জলকন্যা'র জলে ভাসাই ভালো। কিন্তু যাদববাবু এতে তৃপ্ত নন। তিনি চোর ডাকাতকে ঘৃণা করেন, অথচ তাদের সংসর্গেই নিজের সৌভাগ্য রচনার প্রয়াস—এহেন দ্বিধাগ্রস্ত লোকদের জন্য সংসারে কোনো স্থান নির্দিষ্ট নেই।

কিন্তু কোনো ঔপন্যাসিক জটিলতা তথা গভীরতা, কোনো গূঢ় মনস্তত্ত্বের উদ্‌ঘাটন বা কোনো বিশিষ্ট সমাজচেতনার পরিচয় 'মাঝির ছেলে'-তে নেই। কেতুপুরের জেলে কৃষকদের জীবনে [পদ্মা নদীর মাঝি] প্রকৃতির ভূমিকা কত অপরিহার্য একটি ঝড়েই তার সাংকেতিক পরিচয় উদ্ভাসিত। সে তুলনায় 'মাঝির ছেলে' উপন্যাসে মাঝির ছেলেদের বা তাদের কর্তা যাদববাবুর জীবনসংগ্রাম নেই, সংগ্রাম এড়িয়ে তারা সুরঙ্গপথে সৌভাগ্য খুঁজেছে। সেই অনুসন্ধানও মাঝির ছেলেদের নয়; যাদববাবু, ভিমনা, নাগার ব্যক্তিগত অনুসন্ধান। এখানেই উপন্যাসটির মৌল ত্রুটি এবং এ-ত্রুটি মানিকবাবুর মতো শিল্পীর হাত থেকে অপ্রত্যাশিত। যখন সমাজসমস্যার অতিরেকী উল্লেখে তিনি সাহিত্যে উদ্দেশ্যপ্রাণতাকে স্পষ্ট করে তুলছিলেন, তখনই এ-উপন্যাসের বর্তমান রূপ কি করে সম্ভব হলো? তাই মনে হয়, প্রকৃত প্রস্তাবে উপন্যাসটির উপসংহার অলিখিত। 'মাঝির ছেলে' 'শান্তিলতা', 'মাটি-ঘেঁষা মানুষ'-এর মতোই খণ্ডিত সৃষ্টি।

প্রথাসিদ্ধ নায়ক নায়িকাদের অন্তর্ধান ঘটেছিল 'কল্লোল' 'কালি-কলম' ইত্যাদির লেখকদের রচনায়। শৈলজানন্দ কয়লাকুঠীর অঞ্চলে কুলিদের মধ্যে পেয়েছিলেন বিষামৃতময় জীবনের স্বাদ; প্রেমেন্দ্র মিত্র দেখেছিলেন সমাজের 'পাঁক', "বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে বন্দী মোর ভগবান কাঁদে"; অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত গিয়েছিলেন হাড়ি-মুচি-ডোম বায়েনদের সমাজে; তারাশঙ্কর আদিম জীবনীশক্তির প্রাচুর্য দেখেছিলেন বাগ্দী-

কাহার-বেদেদের জীবনে। তখন থেকেই অ-নায়ক নায়ক এবং অ-নায়িকা নায়িকারা বাংলা গল্পের আসরে প্রাধান্য পেয়ে আসছেন। তবু মানিকবাবুর তৃতীয় পর্বের (১৯৪৭ থেকে ১৯৫৬) নায়কেরা বিশেষ অর্থে 'নতুন'। ঐতিহাসিক পোলার্ড মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও শহুরে সভ্যতার প্রগতিশীল ভূমিকা সম্পর্কে লিখেছেন : "Without these two there would have been little to distinguish between modern from medieval history.... When you had no middle class, you had no Renaissance and no Reformation." কিন্তু একথাও ঠিক যে সমগ্র বিশ্বেই এখন মধ্যবিত্তের অগ্রগতি ব্যাহত, এখন মজুরশ্রেণীর অভ্যুত্থানের যুগ। কার্ল মার্কসের কথায় : "The lower strate of the middle class—the small tradespeople, shopkeepers and retired tradesmen generally, the handicraftsmen and peasants —all these sink gradually into the proletariat." মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃতীয় পর্বের নায়কদের মধ্যে মধ্যবিত্তের সেই শ্রমিকশ্রেণীতে রূপান্তরের কাহিনী লিখিত হয়েছে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও কী নির্মম পারিপার্শ্বিকের চাপে মধ্যবিত্তরা পুরনো ভিত্তি দ্রুত হারাচ্ছে, তার আংশিক চিত্র অন্ততঃ উদ্‌ঘাটিত করেছে এই সব নরনারী।

সরল দে

কিশোর সাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছোটদের জন্যে কিছু লিখে বড়োদের বড়ো কিছু শিখিয়েছেন। সে-শেখা ছোটদের সাহিত্য নিয়েই।

ছোটবেলার যেমন দুটি ধাপ—শৈশব আর কৈশোর, ছোটদের সাহিত্যেরও তেমনি স্পষ্ট দুটি ভাগ—শিশু-সাহিত্য ও কিশোর-সাহিত্য। কিন্তু এ-দুটিকে আমরা একাকার করে ভাবতে অভ্যস্ত বলেই, অন্ততঃ কিশোরসাহিত্য নিয়ে আমাদের বিভ্রান্তির অন্ত নেই। সব কিছুর প্রাক-প্রস্তুতি শুরু কৈশোরেই, এমন কি সাহিত্যপাঠেরও। কিশোরসাহিত্য সেই প্রস্তুতিপর্বেরই সাহিত্য। কিন্তু সে-সাহিত্যে মানুষ ও মানুষের জীবনের বাস্তব রূপায়ণ কি সম্ভব? নিশ্চয়ই সম্ভব। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কিশোর সাহিত্যে তা শুধু সম্ভব করেই তোলেন নি, যথার্থ কিশোরসাহিত্য যে কী হতে পারে তাও দেখিয়েছেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অত্যন্ত মূল্যবান একটি পরিচ্ছেদ। সমাজ-বাস্তবতার আদর্শে তা বিশেষভাবেই চিহ্নিত। কিশোর পাঠকদের জন্যে লিখতে বসেও সে আদর্শ থেকে তিনি একতিলও বিচ্যুত হননি। 'অসহযোগ' গল্পের কিশোর নায়ক তাই মুনাফালোভী বাবার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলতে পারে—'তোমার আড়তে হাজার হাজার মণ চাল রয়েছে। সবাই ছি-ছি করছে বাবা! আমার ঘেন্না করছে তোমার ছেলে বলে!' গল্পটির পটভূমি পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ। চালের আড়তদার হর্ষনাথ তাঁর অবাধ্য ছেলেকে মানুষ হওয়ার জন্য ভগ্নীপতি সূর্যপদর কাছে পাঠালেন। সেই ছেলে একদিন সত্যিই মানুষ হয়ে ফিরে এলো। কিন্তু তাকে মানবতাবোধে

উদ্দীপ্ত হতে দেখে হর্ষনাথ বিচলিত হলেন। তাঁর মনে হলো—'কি কুক্ষণেই ছেলেকে মানুষ হতে পাঠিয়েছিলেন!' গল্পটি শেষ হয়েছে ভারী নাটকীয়ভাবে, কিন্তু এতটুকু অবাস্তব মনে হয় না। বাপের গুদাম খুলে সমস্ত চাল নিরন্ন মানুষদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছে মানুষ-হওয়া ছেলে। এ গল্প কিশোর পাঠককে মনুষ্যত্ববোধের আদর্শে অনুপ্রাণিত করবে।

বড়োদের বড়ো লেখকেরা অনেকেই ছোটদের জন্যে অল্প-বিস্তর লিখেছেন। কিন্তু যে-মৌলিকতার গুণে তাঁরা স্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত, ছোটদের লেখায় তার স্বাক্ষর নেই বললেই চলে। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যখন ছোটদের জন্যে লিখেছেন, তখনও তাঁর নিজস্ব ভাষা-ভংগী নিয়েই লিখেছেন; বিজ্ঞানীর দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের জীবন ও মনকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে 'সনাতনী' গল্পের উল্লেখ করা যেতে পারে। ন্যায়-অন্যায়বোধের তাড়নায় অস্থির একটি সহজ সরল মানুষ, নগেনবাবুর গৃহভৃত্য সনাতন। তাকে কেন্দ্র করেই চমৎকার রসোত্তীর্ণ গল্প। সনাতন এক আশ্চর্য টাইপ চরিত্র। কিন্তু এতটুকু অবাস্তব নয়। সনাতনকে নিয়ে উদ্ভট হাস্য-রসের গল্প হতে পারতো, কিন্তু সত্য-সন্ধানী লেখক তা হতে দেননি। সনাতনের সততা ও মনিবের মধ্যবিত্তসুলভ দুর্বলতার এই কাহিনী সকলকেই অভিভূত করবে। মানুষের মনের মধ্যে যে টানাপোড়েন, যে দ্বন্দ্ব, অতি নিপুণভাবে তা এই গল্পে ফুটে উঠেছে। এ ধরণের আরও দুটি গল্প—'কাণ্ডকারখানা' ও 'মহাদেও-এর যাত্রা শুরু'। একটি ফুলগাছ চুরি নিয়ে লেখা 'কাণ্ডকারখানা'। কারখানার মালিক জনসনের শ্রেণীচরিত্র এই গল্পে দেখানো হয়েছে। সর্বহারা শ্রমিক গোকুল। আইনের সূক্ষ্ম মারপ্যাঁচ সে বোঝেনা। হারানো ফুলগাছ সাহেবকে ফিরিয়ে দিয়ে সে পুরস্কারের প্রত্যাশা করেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে জেলে যেতে হলো। 'মহাদেও-এর যাত্রা শুরু' গল্পে দেখানো হয়েছে—নীচুতলার নিঃস্ব প্রবঞ্চিত মহাদেওরা কীভাবে

সচেতন হয়ে উঠছে ; তাদের ফাঁকি দিয়ে বড়লোক হওয়ার প্ল্যান্ আর তেমন খাটছেনা।

ছোটদের জন্যে ভূতের গল্প অনেক লেখা হয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু একটিও ভূতের গল্প লেখেন নি। তিনি লিখেছেন ভয় ও ভয় পাওয়া নিয়ে মানুষেরই গল্প। ভূত নেই, কিন্তু ভূতের ভয় আছে মানুষের মনে। ভয়ের পরিবেশে ভয় পাওয়া অস্বাভাবিক নয়। অজ্ঞতা ও কুসংস্কার ভয় বাড়িয়ে তোলে, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা ভয় দূর করে। 'তৈলচিত্রের ভূত', 'অলৌকিক লৌকিকতা' 'তিনটি সাহসী ভীরুর গল্প'—সব-ই ভয়কে জয় করার চিত্তাকর্ষক কাহিনী। 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পটির শুরু হয়েছে অশরীরীর আতংক দিয়ে, শেষ হয়েছে বিজ্ঞানভিত্তিক উপসংহারে। 'অলৌকিক লৌকিকতা' গল্পটিও অলৌকিকতা দিয়ে শুরু হয়ে মানবিক অনুভূতির মধ্যে শেষ হয়েছে। তিন বুড়ির ট্র্যাজেডি চোখে জল আনে। 'তিনটি সাহসী ভীরুর গল্পে' মানুষের মনে ভয় ও সাহসের সহাবস্থান দেখানো হয়েছে। তিন বন্ধু। তিনজনেই সাহসী, আবার তিনজনেই ভীরু। অদ্ভুত কমপ্লেক্স্। এক-এক জনের এক-এক রকমের ভয় সেই কমপ্লেক্স্ সৃষ্টি করেছে।

ছোটদের জন্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আর একটি অনবদ্য গল্প 'সূর্যবাবুর ভিটামিন সমস্যা'। হাসির গল্পের মতো মনে হলেও আসলে মনোবিকারের গল্প। সূর্যবাবুর ভিটামিন-বাতিক। বাতিক থেকে শেষে বিকার। ছোটরা এ গল্প পড়ে শিখবে, কোনকিছুরই বাড়াবাড়ি ভালো নয়। 'চণ্ডীচরণের গান' নামে গল্পটিতেও আছে এই খেয়াল ও বিকারের কথা। চণ্ডীচরণ গান ভালোবাসে। গানের গলা না থাকলেও গান-গান করেই সে পাগল হয়ে গেল। গল্পটি পড়ে হাসতে গিয়েও হাসা যায় না, চোখে জল আসে।

কয়েকটি গল্পে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বাল্য-কৈশোরের স্মৃতিকথা বলেছেন। 'বড়ো হওয়া দায়' ও 'আমার কান্না' এই

পর্যায়ে পড়ে। এ দুটি গল্পে যে দুরন্ত ও দুঃসাহসী ছেলেটির কথা আছে, তার সাহস, কর্তব্যনিষ্ঠা ও অসাধারণ ধৈর্যের পরিচয়ে ছোটরা মুগ্ধ হবে। 'অলৌকিক লৌকিকতা'-ও তাঁর স্মৃতিকথামূলক রচনা।

আগেই বলেছি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা খুব ছোটদের জন্যে নয়। কিন্তু 'দাড়ির গল্প' এমন একটি মজার গল্প, যা পড়ে ছোট-বড়ো সবাই আনন্দ পাবে। ঠাকুর্দা নাতি-নাতনিদের নিয়ে গল্পের আসর জমিয়েছেন। এক প্রকাণ্ড দৈত্য। রাজকন্যা সেই দৈত্যের দাড়ির জঙ্গলে হারিয়ে গেল। রাজপুত্র আর মন্ত্রীপুত্র মেঘ-কাটা কাঁচি চালিয়ে দাড়ি কেটে নিয়ে তেপান্তরের মাঠে পালালো। রাজকন্যাকেও তারা উদ্ধার করে নিয়ে গেল। গল্প শেষ করে ঠাকুর্দা বললেন, তাঁর দাড়ির মধ্যেও লুকিয়ে আছে হাসিমপুরের রাজকন্যা। ব্যস্, আর রক্ষে আছে? পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙতেই সবাই অবাক—কে বা কারা রাত্রে ঠাকুর্দার অতি সাধের দাড়ি কেটে নিয়ে গেছে!

মানুষের অন্যমনস্কতা যে কি বিপত্তি ঘটায়, 'কোথায় গেল' গল্পে সে কথাই বলা হয়েছে। 'শৈশব স্মৃতি যাচাই করার গল্প' জীবনের অসঙ্গতি নিয়ে। শৈশবের অভ্যাস শৈশবেই মানায়, বয়সকালে তা নিতান্তই বিশ্রী ও বেমানান। পরস্পরের বন্ধুত্ব, মান-অভিমান ও ঝগড়ার গল্প 'এলো' আর 'জব্দ করার প্রতিযোগীতা'।

এদেশের কিশোর পাঠকদের দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তারা খুব বেশী করে পায়নি। তাঁর অকালমৃত্যুতে কিশোর সাহিত্যেরও অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। জীবিত থাকলে তিনি যে আরও অনেক গল্প উপন্যাস কিশোরদের হাতে তুলে দিতেন, তাতে সন্দেহ নেই। একটি মাত্র কিশোর উপন্যাস তিনি সম্পূর্ণ করে গেছেন। আর দুটি উপন্যাস লেখায় হাত দিয়েছিলেন, কিন্তু শেষ করে যেতে পারেননি। 'মাঝির ছেলে' তাঁর লেখা একমাত্র কিশোর উপন্যাস ও সর্বশেষ উপন্যাস।

'মাঝির ছেলে' পদ্মানদীর মাঝির লেখকের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। নদী-নালার দেশ পূব বাংলায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলেবেলা কেটেছে। নদীর বুকে মাঝি-মাল্লার জীবন তিনি খুব কাছে থেকেই দেখেছিলেন। 'মাঝির ছেলে' উপন্যাসে তিনি সেই জীবন, সেই প্রকৃতিকে রূপ দিয়েছেন। এ ধরনের উপন্যাস কিশোর সাহিত্যে খুব কমই লেখা হয়েছে। উপন্যাস বলতে যা বোঝায়, কিশোরদের জন্যে তা যেন লেখাই হয়নি। কিশোর উপন্যাসের লেবেল এঁটে যা চালান হয়েছে তার বারো আনাই রহস্য-রোমাঞ্চের অসম্ভব অবাস্তব কাহিনী; রক্ত-মাংসের মানুষ, মানুষের হাসি-কান্নার জীবন তাতে নেই।

মাগা মাঝির ছেলে। তাকে কেন্দ্র করেই উপন্যাসটি লেখা হয়েছে। কিশোরদের জন্যে লেখা হলেও, এ উপন্যাসে লেখক হৃদয়ানুভূতির এমন অনেক কথাই অনায়াসে বলেছেন, কিশোর পাঠকদের যা নাকি বলা যায় না বলেই আমাদের ধারণা ছিল। কিশোর-মানসিকতার স্বরূপটি স্পষ্ট ও সম্পূর্ণ হলে, সে ধারণা ভুল বলেই মনে হবে।

'মাটির কাছে কিশোর কবি' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসমাপ্ত উপন্যাস। তাঁর মৃত্যুর পর প্রবীণ শিশুসাহিত্যিক খগেন্দ্রনাথ মিত্র এই উপন্যাস সমাপ্ত করেছেন। এ-কাজে তিনিই যোগ্য ব্যক্তি। এবং সে অধিকার তাঁর আছে। কারণ, এককালে বেশ কিছু সার্থক কিশোর উপন্যাস তাঁর কলমেই বেরিয়েছিল। সে উপন্যাস-গুলিতে তিনিও গ্রাম-বাংলার মাটি ও মানুষকে রূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন।

'মাটির কাছে কিশোর কবি'র কবি-কিশোরের চরিত্রটি সুকান্তকেই মনে করিয়ে দেয়। এই উপন্যাস সম্বন্ধে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই বলেছেন—'সুকান্ত সম্ভব না-হলে, আরও অনেক কিশোর কবি সম্ভব না-হলে, তোমাদের জন্যে আমার এই উপন্যাস লেখাও সম্ভব হতো না।'

উপন্যাসের নায়ক কিশোর নামে একটি বালক। তারই জীবন-সংগ্রামের, দুঃখ-জয়ের কাহিনী লেখা হয়েছে এতে। কিশোরের অদ্ভুত তেজ, জিদ আর শাণিত বুদ্ধি। প্রচণ্ড ভাবাবেগে সে যেন 'বাষ্পের বেগে ষ্টীমারের মত চলে'। কিন্তু গরীব-দুঃখী মানুষগুলোর জন্যে তার ছোট্ট বুকে আবেগের ঝড় ওঠে। একটি বোন পেয়ে কিশোর জীবনে সব প্রথম কবিতাটি লিখেছিল। তারপরে লিখলো পাঁচীর মৃত্যুতে। কিশোর লিখলো :

তোমারে করেছে হত্যা মানুষ খুনীরা।
দারিদ্র্যের দাবানল জ্বেলে রাখে যারা।

ঘটনাচক্রে কিশোরদের সংসারে দুঃখ ঘনিয়ে আসে। কিশোরকে জীবন-সংগ্রামের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। তবু সে ভেঙ্গে পড়ে না। তার মনে হয়—'কোথায় যেন ভাঙন ধরেছে।'

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সাম্যবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। ভাঙ্গা-গড়ার মধ্যে দিয়ে যে নতুন সমাজ-ব্যবস্থার জন্ম হবে—তারই ঘোষণা ছিল তাঁর সাহিত্যে। সে ঘোষণা তাঁর কিশোর সাহিত্যেও অনুচ্চারিত থাকেনি। 'মাটির কাছে কিশোর কবি' উপন্যাসের ঘটনা-সংঘাত ও চরিত্র সৃষ্টি সেই ঘোষণারই অনুকূলে।

বাংলায় শিশুসাহিত্যের যে ট্র্যাডিশন, কিশোর সাহিত্যে তা সম্ভব হয়নি। কিশোর সাহিত্য কথাটার চল্ একালেই হয়েছে। একটা চেষ্টা চলছে কিশোরদের জন্যে ভালো কিছু লেখবার। বিচ্ছিন্নভাবে হলেও, কিছু-না-কিছু হচ্ছে বৈকি। কিন্তু কিশোর সাহিত্যে হাত দেবার আগে, একালের কিশোরদের লেখককে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিশোর সাহিত্য থেকে কিছু শিখতেই হবে এবং তা নিশ্চয়ই বড়ো কিছু।

অমিতাভ বসু

বৌ

বাংলাসাহিত্যে একটা স্বকীয় পরিমণ্ডল, বলতে পারি একটা স্বরাজ্য সৃষ্টিতে যদি কোনো অল্পসংখ্যক সাহিত্যিকও কৃতকার্য হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁদের মধ্যে অন্যতম অগ্রণী হচ্ছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। মানিকবাবুর সাহিত্যের যে দিকটা আমাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে সেটা হচ্ছে তাঁর রচনার পরিমিতি বোধ। কি উপন্যাস, কি গল্প,—কোন ক্ষেত্রেই তিনি সাহিত্যসৃষ্টির সংযম এতটুকু আহত হতে দেননি। অথচ এত বড় অসংযমি উপাদানে তাঁর আগে খুব কম সাহিত্যিকই কলম ধরেছেন। মানুষের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে ছিল তাঁর যেন এক সহজাত ক্ষমতা। আর এখানেই তিনি ছিলেন প্রচণ্ড আত্মসচেতন। আব আত্মসচেতন ছিলেন বলেই তাঁর সাহিত্য বিশ্লেষণধর্মী হতে পেরেছে। তাই তাঁর গল্প, উপন্যাসের এক মাত্র বিষয় যেন বাঁচা, মানুষের বাঁচা, বেঁচে থাকার মানে খোঁজা, ঠিক মতো বাঁচবার প্রক্রিয়া আয়ত্ব করা। সেকারণেই দেখতে পাই জাগতিক অসামঞ্জস্যের ওপর তাঁর প্রচণ্ড ঘৃণা, বিক্ষোভ, আর চাপা অসন্তোষ। অথচ আবার জীবনের ওপর মৃত্যুর বিক্ষিপ্ত, অসতর্ক পদক্ষেপ তাঁকে এক বিশেষ সচেতনতার পর্যায়ে উন্নীত করেছে। আর এই উপলব্ধি তখনই সম্ভব যখন জীবনের প্রতি অনুষঙ্গ সাহিত্যিকের চেতনাকে অনেকখানি প্রভাবিত করে। তার মানে কোন কিছুর প্রতি অনীহা, তাতে সত্য নিশ্চয়ই থাকে ; কিন্তু তাহলেও সেটা অবশ্যই আকাঙ্ক্ষীত নয়। তাই মানিক-সাহিত্যে উচ্চ-নীচ সকল স্তরের মানব চরিত্রের প্রতি পক্ষপাতহীন একটা সুন্দর মনের আমরা সন্ধান পাই। সেই জন্যেই তিনি হয়ত ভগবানের ওপর সুখ-দুঃখের দায় চালিয়ে কখনও নির্লিপ্ত হতে পারেননি—যেটা দেশী-বিদেশী অনেক সাহিত্যিক পেরেছেন।

অবশ্য আজ আমি মানিক-সাহিত্যের এই সমস্ত গম্ভীর বা তত্ত্ব আশ্রিত দিকের আলোচনায় যাচ্ছি না ; বা যেতে পারছি না—কারণ আজ আমার আলোচনা মূলতঃ তাঁর 'বৌ' পর্যায়ের ছোট গল্পগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে হচ্ছে।

এই গল্পগুলির মধ্যে আমাদের সমাজের বিভিন্ন স্তরের কয়েকজন মানুষের সহধর্মিণীর হৃদয়-মনের সন্ধান আমরা পাই—দোকানীর বৌ, কেরানীর বৌ, সাহিত্যিকের বৌ, বিপত্নীকের বৌ, তেজী বৌ, কুষ্ঠ রোগীর বৌ, পূজারীর বৌ ও রাজার বৌ।*

প্রথম গল্প দোকানীর বৌ। দোকানী শম্ভু। তার বৌ সরলা। দোকনীর বৌ বলেই হয়ত সরলা খুব চতুর এবং বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন। তার প্রথম প্রমাণই আমরা পাই যখন দেখি—'মল বাজাইয়া হাঁটে সরলা, ঝমর ঝমর। চুপি চুপি নিঃশব্দে হাঁটিবার দরকার হইলেও মল সরলা খুলিয়া ফেলে না, উপরের দিকে ঠেলিয়া তুলিয়া শক্ত করিয়া পায়ের মাংসপেশীতে আটকাইয়া দেয়, মল আর বাজে না।' কী অপূর্ব বর্ণনা! সামান্য কটি কথায় গোটা সরলা চরিত্রটি যেন উপস্থিত। সল্প কৌশলে যে নারী অনেক কিছু অয়ত্নে আনতে পারে তার ইঙ্গিত সরলা সম্পর্কে লেখক এখানে প্রথমেই আশ্চর্য সুন্দরভাবে রেখেছেন—যার পরিণতিতে আমরা দেখি, সরলা স্বামীর সব অর্থ সরিয়ে ফেলে আসন্ন বিপর্যয়ের হাত থেকে স্বামীকে বাঁচিয়ে বলছে—'খাও। না খেলে কি টাকা ফিরে পাবে? বাবা টাকা যদি না-ই দেয়,—দেবে ঠিক, যদির কথা বলছি—আমি গয়না বেচে তোমার টাকা দেব।'—আর স্ত্রীলোক যদি তার গহনা বেচে কখনও স্বামীকে সাহায্য করতে চায়, তখন তার আন্তরিকতা এবং সততা দুই স্বামীর কাছে বড় হয়ে ওঠে—ব্যাবসাদার স্বামীর কাছে তো বটেই। কি আশ্চর্য

*আমি যে সংস্করণের বইটি নিয়ে আলোচনা করছি, তাতে এই আটটি গল্পই স্থানলাভ করেছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বৌ' গল্পগ্রন্থের পূর্ববর্তী সংস্করণে গল্পসংখ্যা আরো বেশী ছিল।

লেখন-চাতুরি। স্বামীকে একক স্বাধীন ব্যবসাদার করে সে নিজেকে স্বামী সোহাগী করে তুলল, নিজের বাবার কাছে সম্মান বাঁচাল নিজেদের—ভাই বা আত্মীয়দের পরামর্শ থেকে সব সময়ের জন্যে শম্ভুকে দূরে সরিয়ে সরলা একেবারে যেন নিশ্চিন্ত—যথার্থ ব্যবসাদারের বাস্তব জ্ঞানে অভিজ্ঞ একটা বৌ—এই সরলা। গল্পটির সুরু এবং সারা—দুই চমৎকার। মাঝখানে লেখকের আরো বহু সূক্ষ্ম কারুকার্য এই গল্পের শৈলী রচনায় রয়েছে যা সত্যই বিচিত্র সুন্দর।

দ্বিতীয় গল্প কেরানীর বৌ। কেরানী রাসবিহারী। সরসী তার বৌ। কিন্তু সরসী গ্রামের সাধারণ মেয়ে। হয়ত সে কেরানীর বৌও হতে পারতো না। তা কি কেবল দু'পোচ ফর্সা রঙের জন্যে। প্রথম পোচে কেরানীর বৌ হয়েছে। দ্বিতীয় পোচের জন্যে? কিন্তু সুন্দর বলেছেন লেখক 'রাসবিহারীর মাহিনা যে এখন একশোর কাছে এবং একদিন দুশোর কাছে পৌঁছানোর সম্ভাবনা আছে, সে শুধু সরসীর ওই রঙটুকুর কল্যাণে'। অথচ সরসী কিন্তু গায়ের রঙের চাইতে দেহের গড়ন সম্পর্কে বেশি সচেতন ছিল। তাই হয়ত সে একটু নতুন ঢঙে কাপড় পড়ত। আর এসময়ই সুবলদার ছোবল থেকে তাকে বাঁচতে হল হাতকামড়ে দিয়ে পালিয়ে। এর পর থেকেই সরসীর অন্য জীবন। বন্দী জীবন। বন্দী জীবন। সেই ছেলেবেলার প্রথম আঘাত—যে আঘাতের জন্যে সে আদৌ প্রস্তুত ছিল না, তার কোন দোষ ছিলনা—সেই ঘটনাই তাকে স্তব্ধ করে দিল। তার মুক্তির সব আনন্দ ছিনিয়ে নিল। অথচ তখন থেকেই হয়ত সে মনে মনে সময় গুনে চলেছিল—কবে আসবে সেই দিন, যেদিন আবার মুক্তি পাবে। স্বাধীনতার স্বাদ পাবে। আর সেই বহু অপেক্ষার শেষে সে সেই মুহূর্তটি যেন খুঁজে পেল স্বামীর সঙ্গে আলাদা বাড়ীতে উঠে এসে একা দুপুরের ছাদে উঠে। আজ তার ইচ্ছে হলো সে যেন ভেসে যায়, উড়ে যায়—এত অফুরন্ত স্বাধীনতা আছে, এত মুক্তি আছে, এত পৃথিবীতে আছে উল্লাস! কিন্তু এর সব কিছু থেকে কেন সে বঞ্চিত ছিল এতদিন ধরে, কোন্ অপরাধে? 'স্বামীর

সাহায্য ছাড়া, সমাজের চাবুকের সাহায্য ছাড়া কোন মতেই সে খাঁটি থাকিতে পারিত না, নিজেকে এমনি একটা কদর্য জীব বলিয়া চিনিয়াছিল, তাই সে নিজেকে এমন ভয়ানক মার মারিয়াছে, এ কথাটাও কি কারো একবার মনে হইবে না'।—এতদিনের শুকনো বুকে আজ আবার তার তৃষ্ণার বান এলো। এই অন্যায়, মিথ্যে থেকে তো তাকে নিজেকেই বেরিয়ে আসতে হবে। এবং সব মুক্তির সাধ সে গণ্ডুষে পান করে ছাদ থেকে সোজা নেমে এসে—'কুঁজোটা তুলিয়া ধরিয়া সে গলায় জল ঢালিতে লাগিল। খানিক পেটে গেল, বাকীটাতে তার বুকের কাপড় ভিজিয়া গেল'—কি অপূর্ব উপমা। আত্মবিশ্বাস ফিরে পাওয়ার এক পরম তৃপ্তিতে সরসীকে যেন লেখক ভরিয়ে দিলেন। কুঁজোর জল উপছে বুকে পড়ার মধ্যে তার স্থূল জ্বালা জুড়াল; আর যেটুকু জল তার কণ্ঠনালি বেয়ে বুকে নেমে গেল তা শীতল করলো তার মনের দহন। এককথায় গল্পটির শেষ বড় চমৎকার।

'বৌ'য়ের তৃতীয় গল্প সাহিত্যিকের বৌ।

এই গল্পে লেখক সেই চিরাচরিত ব্যাপারটাকেই একটু নতুন আঙ্গিকে উপস্থিত করেছেন—কল্পনা বা অনুমানের সঙ্গে বাস্তবের সব সময়ই কিছুটা ফারাক যে থেকে যায়, সেই কথা। মানিকবাবু বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন। তাই তাঁর এই গল্পের বিশ্লেষণে একথাও বলা চলে—থিওরি এবং প্রাকটিস সব সময় এক নাও হতে পারে। সাহিত্যিক মাত্রেই রোমান্টিক হবে, তারা কত সুন্দর প্রেমের কথা ভাবতে পারে, তাই বলে তাঁদের জীবনেও যে তাঁরা তেমনি রোমান্টিক বা গল্পের নায়ক বা নায়িকার মত প্রেম নিবেদনে পটু হবেন এর কোন অর্থ খুঁজে পাওয়া সহজ নয়। তাই দেখি, গল্পের মধ্যে যে লেখক সূর্যকান্তকে অমলা খুঁজে পেয়েছিল, বাস্তব জীবনে অর্থাৎ বিবাহিত জীবনে মাঝে মাঝেই সেই সূর্যকান্তকে আশা করে সে আহত হচ্ছে। অবশ্য এ কেবল তার কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের বিরোধীতাতেই নয়; কেবল কল্পনাতেও সে মাঝে মাঝে বিব্রত। সূর্যকান্ত পূর্বে কাউকে

হয়ত ভালোবেসেছে, নয়ত সে এমন সব ভালোবাসার কথা কি করে লেখে। অথবা সে যদি ভালোবেসে দুঃখ পাবে এই ভয় করে কাউকে ভালোবেসে না থাকে—সকলের মত মেয়ে দেখে বিয়ে করায় সম্মত ছিল, তা হলেও সে কাপুরুষ। আবার হয়ত সমস্ত ব্যাপারটাই কল্পনার মধ্যেও সে খুঁজে পেতে পারে। তবুও অমলার গর্ব সে ডাক্তার, মোক্তার, উকিল, বা ব্যবসাদারের বৌ নয়, সে কার বৌ? 'দেশশুদ্ধ লোক যার নাম জানে, দেশশুদ্ধ লোক যার লেখা পড়িয়া হাসে কাঁদে'। এই লোক তার স্বামী। কিন্তু অমলা তখন বোঝেনি এমন স্বামীকে নিয়ে গর্ব করতে হলে মনকে আরো কত বলিষ্ঠ করতে হয়। নয়ত সে হিস্টিরিয়ার শিকার হবে কেন? 'জীবনে নভেলী আবহাওয়া থাকে না জানিত বলিয়াই নিজের জীবনকে একটু নভেলী করার জন্য অমলার অদম্য পিপাসা জাগিয়াছিল'। কিন্তু একথা মেনে নেওয়ার মত মানসিক জোর অমলার নিশ্চয়ই ছিল না। নভেল পড়া মনের মতই এ কথাগুলো তার নভেলি মেজাজে বলা। নযত গল্পের পরিণতি, অমলা হিস্টিরিয়ার শিকার হল এই সত্যে দাঁড়ায় না। অবশ্য এই গল্প পড়ে একটা প্রশ্ন মনে জাগে, মানিকবাবু অমলার মানসিকতা বিশ্লেষণের ক্ষমতা যতটা দেখিয়েছেন ততটা ক্ষমতা অমলার থাকার কথা নয়। কারণ তার শিক্ষা (ফোর্থ ক্লাশের বিদ্যা, আর চারখানা নভেল পড়ে লোক এমন বিশ্লেষণাত্মক মানসিক পরিণতিতে আসতে পারে না) যা ছিল, বা তার যা বয়স, তাতে অতটা মানসিক পরিণতি থাকা উচিৎ নয়। আর একথা তিনি কোন এক জায়গায় স্বীকার করে বলেছেন—'তার মত সাধারণ অল্প শিক্ষিতা ঘরের কোণায় বাড়িয়া ওঠা মেয়ে যা কিছু বুঝিতে, অনুভব করিতে ও উপভোগ করিতে পারে তারই ফেনা' আর একথা যদি লেখক জানতেন তা হলে অমলার সলিলকিতে অতসব ভাবপ্রবণ বা বিদগ্ধের মত কথাবার্তা চিন্তার ক্ষমতাটুকু তাকে না দিলেই বোধ হয় ভালো হতো।—'তাছাড়া, বইএর যদি প্রভাব থাকে বাস্তবতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক-বঞ্চিত কল্পনা প্রবণ

মনে, বই যারা লেখে তাদের কি প্রভাব নাই ?' অথবা 'প্রত্যেক দিন উত্তেজনার মদ খাইয়া নেশায় জ্ঞান হারানো' ইত্যাদি। তাহলে কি সাহিত্যিকের বৌ বলে সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাভাবিক দুর্বলতায় কল্পনার আলপনায় অমলাকে সাহিত্যিকের কাছাকাছি মানসিকতার প্রতিমা করতে চেয়েছেন ? তাহলেও তো গল্পের পরিণতি আমরা মেনে নিতে পরিনা। আমরা বলবো—তবু এই গল্পের শেষকথা কল্পনা এবং বাস্তব—এই দুয়ের মাঝখানে পড়ে অমলা চরিত্র শেষ পর্যন্ত পর্যদুস্তই হয়েছে।

এর পরের গল্প বিপত্নীকের বৌ। গল্পটি সহজ এবং সুন্দর। প্রতিমা বিয়ের আগে রমেশকে দেখে ভেবেছে, কোন একজন স্ত্রীলোক এই সুপুরুষটিকে এর আগে পাঁচ বছর ভোগ করেছে। এবং সেটা কত কুৎসিৎ এবং অসহ্য চিত্র সেটাও সে কল্পনা করে নিয়েছিল। কিন্তু বিয়ের পরে এ বাড়ীতে এসে মানসীর ছবি দেখে প্রতিমার সেই পূর্বের ধারণা পালটে গেল এবং তার মনে হল মানসী কত যেন ভালো মানুষ ছিল। 'রমেশের বৌ বলিয়া যেন ভাবাই যায় না'। কিন্তু এই মানসীকে বৌ বলিয়া ভাবা যায়নাটাই বোধ হয় প্রতিমাকে আরো বেশি বিব্রত করলো। মানসীকে যদি সে সত্যিই তার কল্পনার মানসী 'দেদীপ্যমান কামনার মত স্থূলাঙ্গী এক রমণী'-র মত দেখতো, তাহলে হয়ত প্রতিযোগিতায় তার স্থান সে রমেশের মন থেকে মুছে ফেলতে পারতো তার সুকুমার মনবৃত্তি দিয়ে। কিন্তু সেটা যখন মিললনা তখন 'তীব্র উত্তপ্ত ঈর্ষায়' প্রতিমার মনে মানসী একটা স্থায়ী স্থান লাভ করলো। তাই দেবীপক্ষে বিয়ের রাত্রিতে সে একটি ফুলের মালা মানসীর ফটোতে পরিয়ে দিয়েছিল। আর তা দেখে—রমেশ যখন তাকে 'তুমি বড় ভালো প্রতিমা' বলে বহুদিন বাদে প্রথম বলিষ্ঠ বাহু-বন্ধনে এবং প্রেমের আবেগে ওষ্ঠে চুম্বন এঁকে দিল, তখন যেন সেটা প্রতিমার কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে। প্রতিমা বলে—'ছাড়ো ছাড়ো শিগ্‌গির ছাড়ো আমায় '

—কি হল ? রমেশ ভীতভাবে জিজ্ঞাসা করিল।

—দম আটকে গেল আমার। ছাড়ো।

স্বামীকে ঠেলিয়া দিয়া প্রতিমা খাট হইতে নামিয়া গেল।' কিন্তু কেন? তা কি কেবল সেই জ্বালায় যে প্রতিমা আজ মানসীর ফটোতে মালা পরিয়ে দিয়েছে তাই রমেশ খুশী হয়ে প্রতিমাকে বেশি কাছে টানছে, ভালোবাসছে তাকে। তারই কি ভাবান্তরে মানসীর ভাবনার মধ্য দিয়ে লেখক প্রশ্ন রেখেছেন—'এমন মন তার স্বামীর যে এর মধ্যে মানসীকে ভুলিয়া গিয়াছে, তার মনরাজ্যের সেই সর্বময়ী সম্রাজ্ঞীকে'? তার মানে রমেশ মানসীকে ভুলতে পারছে না। সত্যিই মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণে বিপত্নীকের বৌ একটি স্বার্থক গল্প। বলা চলে ঈর্ষার ফটোতে ফুল দিয়ে ভালোবাসার পুরুষকে সে পরিস্কার পরীক্ষা করে নিল।

তেজী বৌ এই সংকলনের আর একটি সাদামাঠা গল্প। তেজী বৌ সুমতি তেজ করে শেষ পর্যন্ত বাপের বাড়ী গেল। কিন্তু সুমতিকে বাপের বাড়ী পাঠাতে লেখককে এক দৈব্যের সাহায্য নিতে হল। সুমতি অন্তসত্বা ছিল। এবং বাড়ী থেকে বেরিয়ে সে যদি পথিমধ্যে অকস্মাৎ সন্তান প্রসব না করতো তাহলে সে কি নিজের তেজে বাপের বাড়ী পৌঁছতে পারতো? হয়ত পারতো না। নয়ত সুমতির প্রসব ঘটানোর কোন প্রয়োজন ছিলনা। তবে সুমতি পথিমধ্যে অকস্মাৎ প্রসব করে বাপের বাড়ীতে যাওয়ার অনুমতি পেল—এই ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে লেখক বড় সুন্দরভাবে বাঙালী ঘরের বৌ-এর স্বামীর ঘর এবং বাপের ঘরের মধ্যে শান্তির সুরটি, যেটি কাম্য সেটি বজায় রেখেছেন। তাছাডা কোন মেয়ে প্রথম মা হয়ে তার মায়ের কাছে যাওয়ার একটা দাবী বা অধিকার আমাদের সমাজে সব সময় সর্বকালে পেয়ে থাকে। আর সেই দাবীর পথ চেয়ে সুমতির নিজের বাপের বাড়ীতে উপস্থিতির ব্যবস্থাটি সুন্দর। তবে গল্পের শেষে মনে একটা প্রশ্ন আসে—তেজী বৌ কি সত্যি তেজী-ই

থাকছে? অবশ্য লেখক এক জায়গায় বলছেন—'এক মাস পরে বাপের বাড়ী গিয়া তিন মাস পরে অনেকটা সুস্থ হইয়া সুমতি স্বামীগৃহে আসিল। আর কোন পরিবর্তন হোক বা না হোক, সুমতির একটা পরিবর্তন অতিস্পষ্টভাবেই ধরা পড়িয়া গেল। দেখা গেল, তার সবটুকু তেজ কর্পূরের মত উবিয়া গিয়াছে।' আমরাও নিশ্চিন্ত হলাম। কারণ কোন বৌ-এরই এমনধারা তেজ কাম্য নয়। স্ত্রীলোকের তেজ বা রাগটা অল্প অল্প মন্দ লাগে না। সেটা ওদের অলঙ্কারের মতও মনে করা চলে। কিন্তু সেটা যদি মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তখন ক্ষতিকর হয়। আমরা তেজী বৌ-এর সেই ক্ষতি থেকে মুক্তির ইঙ্গিত পেয়ে খুশী।

পরের গল্প কুষ্ঠ রোগীর বৌ। ভালো গল্প। তবে এখানে মানুষের পৌরুষ ও কর্মে বিশ্বাসী লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একটু বুঝি দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। নয়ত যতীনের বাপের পাপে তার এই কুষ্ঠ রোগ হল,—এমন ইঙ্গিত তিনি কেন দিলেন? তিনি বলছেন—'তবু সংসারে চিরকাল পুণ্যের জয় এবং পাপের পরাজয় হইয়া থাকে এই কথা প্রমাণ করিবার জন্যই যেন বাপের জমা-করা টাকাগুলি হাতে পাইয়া ভাল করিয়া ভোগ করিতে পারার আগেই মাত্র আটাশ বছর বয়সে যতীনের হাতে কুষ্ঠ রোগের আবির্ভাব ঘটিল'। এই গল্পেই আবার মহাশ্বেতা বলছে—'ঠাকুর দেবতায় আমার বিশ্বাস নেই'।

অবশ্য গল্পের অন্যান্য দিকগুলো সত্যিই চমৎকার। বিশেষত মনস্তত্ত্বের দিকটি। কঠিন কোন ব্যাধি মানুষের মনকে কত সংকীর্ণ করে অথচ এই সংকীর্ণতার কোন বাস্তব কারণ হয়ত থাকে না; কিন্তু ব্যক্তি মানুষটি এই সংকীর্ণতায় আরো বেশি দুর্বল হয়ে, অসুস্থ হয়ে পড়ে কষ্ট পায়—এই কথাটি লেখক এখানে বড় সুন্দরভাবে বলেছেন। এসব লোকের যারা বৌ-এর মত কাছের মানুষ তারা কখনই হয়ত ব্যাধির জন্যে লোকটাকে অবজ্ঞা করে না; বলা যায় ব্যাধি তাদের ভালোবাসায় বাধ সাধতে পারে না। মহাশ্বেতার মত এই সব মেয়েরা

স্বামীকে অনেক প্রশ্ন হয়ত করে, তা কেবল জানতে সেই ব্যাধি কতটা গভীর হচ্ছে, কি একটু হালকা হচ্ছে? সে কতটা কষ্ট পাচ্ছে বা পেতে পারে জানতে। অথচ প্রিয়জনের (বৌ-এর মত) যে অনুভূতি বা মানসিকতা এখানে কাজ করছে, রোগীর মনে কিন্তু তার বিপরীত বা বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া কাজ করে। নয়ত একটি জায়গায় লেখক বলছেন—'মহাশ্বেতা তাহার তিনটা চামড়া তোলা ফাটিয়া যাওয়া আঙ্গুলের দিকে চাহিয়া থাকে। আঙ্গুলগুলি তাহার হাতে লাগিয়া আছে বলিয়া বারেকের জন্যও সে শিহরিয়া ওঠে না। মনে হয় যতীন অনুরোধ করিলে তাহার হাতে কনুই-এর অল্প নীচে টাকার মত চওড়া যে ক্ষতটি ছোট ছোট রক্তাভ গোটায় উর্বর হইয়া আছে মহাশ্বেতা সেখানে চুম্বন করিতে পারে।'

আর এখানেই যতীন কি বলছে—'তুমি আমাকে ঘেন্না করছ শ্বেতা?

—কখন আবার ঘেন্না করলাম।

—তবে অমন করে তাকাও কেন?'

গল্পের শেষটি এক কথায় অপূর্ব। 'সুস্থ স্বামীকে একদিন সে ভালবাসিত, ঘৃণা করিত পথের কুষ্ঠ রোগীদের। স্বামীকে আজ সে তাই ঘৃণা করে, পথের কুষ্ঠরোগাক্রান্তগুলিকে ভালবাসে।'

তাহলে পাত্রকে ঘৃণা করে পাত্রকে ঘিরে যে অবজ্ঞার উপাদান সেই উপাদানকে ভালোবেসে কাছে টেনে মহাশ্বেতা এখানে ভালোবাসার রাজ্যে এক বিপ্লব এনেছে বলা চলে। সে শুধু কুষ্ঠরোগীর বৌ? না, আর কিছু?

এর পরের গল্প পূজারীর বৌ। সন্তানহারা এক মাতৃহৃদয়ের আকুলতা ও আর্তনাদ এই গল্পে উপস্থিত। রাত্রির স্তব্ধতাকে ভেঙে যখন 'প্রতিবেশী রমেশ হাজরার কচি ছেলেটা কাঁদিয়া ওঠে'—তখন উত্তেজনায় কাদম্বিনী দিশেহারা হয়ে পড়ে। স্বামীকে সে বলে—'ওগো খোকা কাঁদছে। শুনছ? ওগো তুমি শুনছ'—স্বামী গুরুপদ

বলে—'রমেশের ছেলে কাঁদছে কান্থ। অমন কোরো না। ভয় কি ?—কাদম্বিনী অনেকক্ষণ তার কথা বিশ্বাস করিতে পারে নাই। বিস্ফারিত চোখে দু'বাড়ীর মাঝখানে প্রাচীরটার পাশে আনারস গাছের ঝোপের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বার বার শিহরিয়া উঠিয়া বলিয়াছিল—ওগো, না, আমার খোকা কাঁদছে। আমি স্পষ্ট শুনছি আমার খোকার গলা—ওই ঝোপের মধ্যে কাঁদছে'।

এখানে 'প্রাচীরটার পাশে আনারস গাছের ঝোপ' এই কথা কটির ব্যবহার অপূর্ব। প্রাচীর এক বিরাট অন্তরায়; এই সংস্কারের প্রাচীরে কাদম্বিনীর মাতৃহৃদয় বার বার আহত; আর আনারস গাছের ঝোপে যে অসংখ্য ছোট ছোট কাঁটার আঘাত ও বেদনা, যা ঐ ফল ভোগ করতে হলে সহ্য করতে হয়—সেরকম এক মানসিকতায় কাদম্বিনীর হৃদয় ক্ষতবিক্ষত। তাই এই নারী শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহী; বিদ্রোহী ঈশ্বরে—তাঁর বিচারে। সে বলছে—'তুমি আমার দুটি ছেলে চুরি করেছ। আমি শুধু তোমার একটি কলসী নিলাম। তোমার ক্ষমা চাই না'—এক কথায় অপূর্ব। এই গ্রন্থের সমস্ত গল্পের মধ্যে এমন এক বলিষ্ঠ গল্পের সমাপ্তি আর দ্বিতীয় নাই। বঞ্চিত মাতৃহৃদয় ঈশ্বরের ভালো মন্দ করবার ক্ষমতাকে ব্যঙ্গের ফুঁৎকার দিয়ে উন্মাদের মত বেরিয়ে গেল। এই উন্মাদিনী সন্তানহারা মা-কে বুঝি ঈশ্বরও ভয় পায়।

এই গ্রন্থের সর্বশেষ গল্প রাজার বৌ। যামিনীর বিয়ের পর স্বামী ভূপতির সঙ্গে দিনগুলো বেশ কাটছিল। 'স্বামীর সঙ্গে যামিনীর যে সম্পর্কটি স্থাপিত হইল তাহা অতুলনীয়। যামিনীকে ভূপতি তাহার সুস্থ মনের নিবিড় কামনা দিয়া জড়াইয়া ধরিল', কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই দুজনকেই আবার 'অতৃপ্তি নামক অসুখের শিকার হতে হল। যামিনীর প্রথম সন্তান যখন জন্ম নিল, তখন থেকে ভূপতিকে অবন্তীপুরের সমস্ত দায়িত্ব নিতে হল। সে রাজা হল।' তাই 'শ্যাম্পেন অথবা নারী নয়'—জমিদারীর তদারকিতে তাকে সব সময় ব্যস্ত থাকতে

হয়। তার মানে রাজ্যের খোঁজ খবর নিতে নিতে ভূপতি বুঝি ভুলে যেত যামিনীর মনের খবরটা কি তা জানতে। এমনি করে ওরা তুজনে ধীরে ধীরে দূরে সরে গেল—যার জন্যে হয়ত কেউ এককভাবে বেশি করে দায়ী নয়। ভূপতি যখন জামিদারী নিয়ে ব্যস্ত, যামিনী তখন কল্পনায় এক ভূপতিকে সৃষ্টি করে নিল। তারপর 'ভেহার লেকে বেড়াইতে গিয়াও এক অনির্বচনীয় মুহূর্তে পরস্পরকে চুম্বনের সময় যেন ধরা পড়ল কাছে থেকেও তারা যেন কত দূরে সরে গেছে। তাই 'এক সঙ্গে তারা যে আজ পরস্পরকে দাবী করিবে তার বাধা অনেক'।

মোটামুটিভাবে বৌ পর্যায়ের গল্পগুলির আলোচনা-শেষে একটা সত্য আমরা উপলব্ধি করতে পারছি যে, মানিকবাবু এখানে চরিত্রগুলির বৈচিত্র্যের মধ্যেদিয়ে আসলে একটি গভীর সত্যই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন যে, প্রতিটি নারীই চায় নিজেকে জয়ী করতে। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে। সরলা চেয়েছে সংসারে একক কর্তৃত্ব, সরসী দাবী করছে নিজের নারীচিত্তের মুক্তি, অমলা চেয়েছে জীবনে আনতে একটু নভেলী হাওয়া, প্রতিমা চেয়েছে মানসীকে মুছে দিয়ে নিজের প্রতিষ্ঠা, মহাশ্বেতা নিজেকে স্বামীসেবায় উৎসর্গ করে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে নিজের মহত্ব ও ঔদার্য, কাদম্বিনী ঈশ্বরকেই দিল ফুঁৎকার, আর যামিনী স্বামীকে তার নাগাল পেতে দিল না। বলাবাহুল্য কিছু অসুস্থ, কিছু উদ্ভট মানসিকতায় এই পর্যায়ের প্রতিটি গল্পই মানিকবাবুর গল্প সৃষ্টির দক্ষতায় স্বার্থকভাবে উত্তীর্ণ।

'পুতুল নাচের ইতিকথা' প্রসঙ্গে

'উপন্যাসের ধারা' প্রবন্ধে মানিক তাঁর 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাস সম্বন্ধে বলেছেন, "লিখতে শুরু করেই আমার উপন্যাস লেখার দিকে ঝোঁক পড়লো। কয়েকটি গল্প লেখার পরেই গ্রাম্য এক ডাক্তারকে নিয়ে আরেকটি গল্প ফাঁদতে বসে কল্পনায় ভিড় করে এল 'পুতুল নাচের ইতিকথা'র উপকরণ এবং কয়েকদিনে একটি গল্প লিখে ফেলার বদলে দীর্ঘদিন ধরে লিখলাম এই দীর্ঘ উপন্যাস—এ ব্যাপারের সঙ্গে সাধ করে বিজ্ঞানের ছাত্র হওয়ার সম্পর্ক অনেকদিন পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত থেকে যায়। মোটামুটি একটা ধারণা নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলাম যে, সাহিত্যিকেরও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা প্রয়োজন, বিশেষ করে বর্তমান যুগে, কারণ তাতে অধ্যাত্মবাদ ও ভাববাদের অনেক চোরা মোহের স্বরূপ চিনে সেগুলি কাটিয়ে ওঠা সহজ হয়।"

অবশ্য মানিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কাহিনী রচনা করলেও প্রথম দিকে ভাববাদ বা অধ্যাত্মবাদের চোরা মোহ সম্পূর্ণ কাটিয়ে ওঠা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। পুতুল নাচের ইতিকথার মধ্যেও তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। অনন্ত তার মেয়ে কুসুমকে নিতে এসে শশীকে বলে, "সব চেয়ে ছোট মেয়ে, বড় দু'বোনের বিয়ের পর ওই ছিল কাছে, বড় আদরে মানুষ হয়েছিল—একটু তাই খেয়ালী হয়েছে প্রকৃতি। সবচেয়ে ভাল ঘর বর দেখে বিয়ে দিলাম, ওর অদেষ্টেই হ'ল কষ্ট। সংসারে মানুষ চায় এক হয় আর, চিরকাল এমনি দেখে আসছি ডাক্তারবাবু। পুতুল বই তো নই আমরা, একজন আড়ালে বসে খেলাচ্ছেন।" উপন্যাসের শেষেও আছে এই অজানা শক্তির কথা। "নদীর মত নিজের খুশিতে গড়া পথে কি মানুষের জীবনের স্রোত বহিতে পারে? মানুষের হাতে কাটা খালে

তার গতি, এক অজানা শক্তির অনিবার্য ইঙ্গিতে। মাধ্যাকর্ষণের মত যা চিরন্তন, অপরিবর্তনীয়।"

আসলে মানিক তখনো নিজের পথ খুঁজে পান নি। তাঁর নিজস্ব 'জীবন-দর্শন' তখনো ঠিক গড়ে ওঠে নি। আরম্ভ হয়েছে "সব সময় জীবনকে দর্শন করার বিরামহীন শ্রম"। এই জীবনকে দেখার দৃষ্টি তাঁর বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি। মানিক যথার্থ উপলব্ধি করেছেন, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিজ্ঞান প্রভাবিত মন উপন্যাস লেখার জন্য অপরিহার্যরূপে প্রয়োজন। পৃথিবীর যে কোন দেশের যে কোন যুগের যে কোন উপন্যাস ধরে বিশ্লেষণ করলে লেখকের এই বৈশিষ্ট্য, বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে এই বিশেষ ধরনের মানসিক সমতা খুঁজে পাওয়া যাবে।" (উপন্যাসের ধারা)

'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসে মানিকের পল্লীজীবনের বিশ্লেষণ হয়েছে নিপুণ এবং বাস্তব। পল্লীজীবনকে কেন্দ্র করে উপন্যাস লিখে খ্যাতি লাভ করেছেন শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ এবং সমসাময়িককালে তারাশঙ্কর। কিন্তু মানিকের দৃষ্টি ও আঙ্গিক স্বতন্ত্র। মানিকের বর্ণনায় পল্লীজীবনের ভাব এবং মাধুর্য প্রধান হয়ে ওঠে নি। দারিদ্র্যলাঞ্ছিত সাধারণ মানুষের বাস্তব জটিল জীবন অপূর্ব শিল্পরূপ লাভ করেছে। তিনি বলেন, "নিত্য নতুন আবিষ্কারে বিজ্ঞান বদলে দিয়ে চলে সমাজ ও জীবনকে, বদলে দিয়ে চলে মানুষের চেতনাকে। এই চেতনায় জাগে সাহিত্যের কাছে নতুন চাহিদা এবং এই চেতনা প্রতিফলিত হয় নতুন আঙ্গিকে উপন্যাস রচনায়।" মানিকের উপন্যাসে আছে এই নতুন চেতনা এবং নতুন আঙ্গিক। মানুষ তার নিজের ইচ্ছাশক্তির নিয়ামক, শরৎচন্দ্র পর্যন্ত আমাদের এই বিশ্বাস এখন ভেঙে গেল। মানিক দেখালেন মানুষ আসলে একটা গভীরতর জৈবিক ষড়যন্ত্রের ক্রীড়ণক মাত্র।

এই উপন্যাসেই মানিকের স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী, শিল্পশৈলী এবং আগামী-দিনের সম্ভাবনার ইঙ্গিতের পরিচয় পাওয়া যায়। উপন্যাসটির আরম্ভ হারু ঘোষের মৃতদেহ নিয়ে। মৃতদেহ সম্পর্কে মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যেও যে চেতনার পরিচয় পাওয়া যায় তা এই উপন্যাসেই প্রথম দেখতে পাওয়া

যায়। যেমন "সবুজ রঙের সরু লিকলিকে একটা সাপ একটি কেয়াকে পাকে পাকে জড়াইয়া ধরিয়া আচ্ছন্ন হইয়া ছিল। গায়ে বৃষ্টির জল লাগায় ধীরে ধীরে পাক খুলিয়া ঝোপের বাহিরে আসিল। ক্ষণকাল স্থিরভাবে কুটিল অপলক চোখে হারুর দিকে চাহিয়া থাকিয়া তাহার দুই পায়ের মধ্য দিয়াই বটগাছের কোটরে অদৃশ্য হইয়া গেল।" অথবা "বৃষ্টি থামিতে বেলা কাবার হইয়া আসিল। আকাশের এক প্রান্তে ভীরু লজ্জার মত একটু রঙের আভাষ দেখা দিল।...হারুর স্থায়ী নিস্পন্দতায় সাহস পাইয়া গাছের কাঠবিড়ালীটি এক সময় নীচে নামিয়া আসিল।... মরা শালিকের বাচ্চাটিকে মুখে করিয়া সামনের মাঠ দিয়া দপ দপ করিয়া পার হইয়া যাওয়ার সময় একটা শিয়াল বার বার মুখ ফিরাইয়া হারুকে দেখিয়া গেল। ওরা টের পায়। কেমন করিয়া টের পায় কে জানে।"

গাওদিয়া গ্রামের ডাক্তার শশী বাড়ী ফিরবার পথে হারুর মৃতদেহ নৌকায় তুলে নিয়ে যায়। তারপর গ্রামের লোকজনের সাহায্যে তার সৎকার করে। এই গাওদিয়া গ্রাম ছিল মানিকের মামাবাড়ী। তখনকার দিনে পাশ করে শিক্ষিত মানুষ যখন গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে যাচ্ছিল তখন মানিক এক শহরে শিক্ষিত পাশ করা ডাক্তারকে গ্রামে নিয়ে এল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে গ্রামের মানুষের আপাত সরল জীবনের মধ্যে জটিলতাকে উন্মোচন করতে। "শশীর চরিত্রে দুটি সুস্পষ্ট ভাগ আছে। একদিকে তার মধ্যে শিক্ষিত মধ্যবিত্তসুলভ কল্পনা, ভাবাবেগ এবং রসবোধ আছে অন্যদিকে তার বুদ্ধি সংযম এবং হিসাবী প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। সংসারে টিকিবার জন্য দরকারী এই গুণগুলির জন্য শশীকে সকলে ভয় ও খাতির করিয়া চলে।"

শশীর চরিত্রের এই দিক গড়ে তুলেছে তার বাবা গোপাল দাস। "গোপাল দাসের কারবার লোকে বলে গলায় ছুরি দেওয়া। আসলে সে করে সম্পত্তি কেনাবেচা ও টাকা ধার দেওয়া। অর্থাৎ দালালি ও মহাজনি। শোনা যায় এককালে সে নাকি বার তিনেক জীবন্ত মানুষের কেনাবেচার ব্যাপারেও দালালি করিয়াছে—তিনটি বৃদ্ধের

বৌ জুটাইয়া দেওয়া।" যামিনী কবিরাজের বৌ, সেনদিদি বলে শশী যাকে ডাকে তার ব্যাপারেও গোপালের দালালি ছিল। যামিনী কবিরাজের বৌ অত্যন্ত সুন্দরী। গোপালের সঙ্গেই তার নামটা জড়ানো হয় বেশি।

শশী গোপালের একমাত্র ছেলে। "কলিকাতার মেডিকেল কলেজে পড়িতে যাওয়ার সময় তাহার হৃদয় ছিল সঙ্কীর্ণ, চিন্তাশক্তি ছিল ভোঁতা, রসবোধ ছিল স্থূল। গ্রাম্য গৃহস্থের স্বকেন্দ্রীয় সঙ্কীর্ণ জীবন যাপনের মোটামুটি একটা দাবিই ছিল ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে তাহার কল্পনার সীমা। কলিকাতা থাকিবার সময় তাহার অনুভূতির জগতে মার্জনা আনিয়া দেয় বই এবং বন্ধু। বন্ধুটির নাম কুমুদ, বাড়ি বরিশালে, লম্বা কালো চেহারা, বেপরোয়া খ্যাপাটে স্বভাব।...এই একটি মাত্র বন্ধুর প্রভাবে শশী একেবারে বদলাইয়া গেল। যে দুর্গের মধ্যে গোপাল তাহার মনকে পুরিয়া সিল করিয়া দিয়াছিল, কুমুদ তাহা একেবারে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারিল না বটে, কিন্তু অনেকগুলি জানালা দরজা কাটিয়া দিয়া বাহিরের আলো-বাতাস আনিয়া দিল, অন্ধকারের অন্তরাল হইতে মনকে তাহার বাহিরের উদারতায় বেড়াইতে যাইতে শিখাইয়া দিল।" জীবনের বৃহত্তর পরিধির পরিচয় পেয়ে শশী বিস্মিত হয়ে গেল। "তারপর গ্রামে ডাক্তারি করিতে বসিয়া প্রথমে সে যেন হাঁপাইয়া উঠিল। জীবনটা কলিকাতায় যেন বন্ধুর বিবাহের বাজনার মত বাজিতেছিল, সহসা স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। এই সব অশিক্ষিত নর-নারী, ডোবা পুকুর বনজঙ্গল মাঠ, বাকি জীবনটা তাহাকে এইখানেই কাটাইতে হইবে নাকি? ও ভগবান, একটা লাইব্রেরি পর্যন্ত যে এখানে নাই। ক্রমে ক্রমে শরীর মন শান্ত হইয়াছে। সে তো গ্রামেরই সন্তান, গ্রাম্য নর-নারীর মধ্যে গ্রামের মাটি মাখিয়া গ্রামের জলবায়ু শুষিয়া সে বড় হইয়াছে, হৃদয় ও মনের গড়ন আসলে তাহার গ্রাম্য।"

হারু ঘোষের বাড়ীর সঙ্গে শশীর পরিচয় নিবিড়। হারুর মেয়ে

মতি এবং পুত্র পরানের বৌ কুসুম তাদের ছোটবাবু শশীকে বিশেষ দৃষ্টিতে দেখে। কুসুমকে পাড়ার লোকে বলে একটু পাগলাটে। আসলে কুসুম পাগল নয়। মনস্তত্ত্বের একটি জীবন্ত প্রতিমূর্তি। মনস্তত্ত্বে মনের যে স্বাধীন সত্তা স্বীকার করে কুসুমের মধ্যে আছে তারই সুন্দর প্রকাশ। মতির জন্য শশীর ব্যাকুলতা কুসুম সহ্য করতে পারে না। মতির জ্বর। শশী দেখতে এসেছে। কুসুম মনে করে এ ঠিক ডাক্তারের রোগী দেখতে আসা নয়। এর মধ্যে একটা কিন্তু আছে। তাই কুসুম ডাক্তার শশীর মতির বুক পরীক্ষাকেও সন্দেহের চোখে দেখে। তার হাল্‌কা কথাবার্তার ধরনে কেউ অবশ্য কিছু মনে করে না। কুসুম শশীর যাতায়াতের পথে অপেক্ষা করে। নানা মিথ্যে কথা বলে শশীর সান্নিধ্যে আসে। শশী কিন্তু এসবের মধ্যে কুসুমের পাগলামিটাই দেখে।

শশী গ্রামের ছেলে। উপরন্তু গ্রামের ডাক্তার। সকলের সঙ্গেই তার ভাব। মানুষের বিপদে সে শত বাধা তুচ্ছ করে এগিয়ে যায়। সেজন্য প্রাচীনপন্থী, শশীর ডাক্তারীতে অবিশ্বাসী যাদব পণ্ডিতও তাকে স্নেহ করেন, বিশ্বাস করেন।

হারুর বাড়িতে মতির জ্বর সেরে যাওয়ায় শশীর যাতায়াত কমে। কিন্তু কুসুম মিথ্যে মিথ্যে জ্বর হয়েছে, মাথা ধরেছে বলে শশীকে হাত দেখায়। মতির তাড়াতাড়ি বিয়ে দিতে কুসুম চায় কিন্তু শশীর অমত। মতির কাছে কুসুম শশীর নামে যা তা বলে। শশীর প্রতি মতিরও যে গভীর ভালবাসা আর শ্রদ্ধা আছে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

এমনি যখন শশী-মতি-কুসুমের লঘু অনুরাগের স্রোত বয়ে যাচ্ছিল তখন পূজো উপলক্ষে গ্রামে এল এক যাত্রা পার্টি। সেই দলে এল শশীর পুরানো বন্ধু কুমুদ। এতকাল পরে কুমুদের সঙ্গে দেখা হওয়ায় শশী খুব খুশি হয়েছে। বিশেষ করে "কুমুদ নামিয়া আসিয়াছে বলিয়া। কুমুদের সেই অন্যমনস্ক সরল ঔদ্ধত্য নাই, নিজেকে সংসারের আর সকলের চেয়ে স্বতন্ত্র, সকলের চেয়ে বড় মনে করিতে সে ভুলিয়া

গিয়াছে।" শশী তার লোভী সুদখোর মহাজন পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। তারপর কুমুদ উচ্চ মধ্যবিত্ত পর্যায় থেকে নিম্নেতর শ্রেণীর সঙ্গে একাত্মবোধ করায় শশী খুশি হলো। কুমুদের এই declassed চেতনা শশীর সাধারণ মানুষের সঙ্গে স্বাভাবিক মমত্ববোধের সঙ্গে একাত্ম হওয়ায় সে আরো আনন্দিত হলো।

শশীর এই চেতনা মানিকেরই চেতনা। ভদ্র জীবনের বিকৃতির ফলে মানিক যে অস্বস্তি বোধ করছিলেন, নিম্নেতর শ্রেণীর জীবনের অকুণ্ঠ বাস্তবতার সঙ্গে পরিচিতি লাভ করে তাঁর জীবনদর্শন পরিণতি লাভ করছিল। শশী-কুমুদের মধ্যেই তার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়।

কুমুদের সঙ্গে মতির পরিচয় হলো। কুমুদের চমৎকার অভিনয় দেখে মতির ভাল লাগল আর গ্রাম্য বালিকার অকৃত্রিম সরলতায় কুমুদ মুগ্ধ হলো।

এদিকে শশীর অক্লান্ত চেষ্টায় সেনদিদি আরোগ্যলাভ করে। কিন্তু তা নিয়ে কলঙ্কও রটে। গোপাল শশীকে যামিনী কবিরাজের বাড়ী যেতে নিষেধ করে। রোগীর ভিড়ে শশীও সেনদিদিকে দেখতে যাবার সময় পায় না। সে নিবিড়ভাবে এই গ্রামজীবনের সঙ্গে মিশে যায়। "জীবনকে দেখিতে শিখিয়া, অত্যন্ত অসম্পূর্ণ ভাসা-ভাসা ভাবে জীবনকে দেখিতে শিখিয়া, সে অবাক হইয়া দেখিয়াছে যে, এইখানে, এই ডোবা আর জঙ্গল আর মশাভরা গ্রামে জীবন কম গভীর নয়, কম জটিল নয়। একান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে গ্রামে ডাক্তারি শুরু করিয়া ক্রমে ক্রমে এ জীবন শশীর যে ভাল লাগিতেছে, ইহাই তাহার প্রথম ও প্রধান কারণ। তারপর যাত্রাদলের অভিনেতা সাজিয়া কুমুদের আবির্ভাব। মোনা লিসার কুমুদ, ভেনাস ও কিউপিডের কুমুদ, শেলী-বায়রন-হুইটম্যানের কুমুদ, পেগ খাওয়া waltz-foxtrot নাচা কুমুদ, নীলাক্ষির প্রেমিক কুমুদ, তারচেয়ে বয়সে জ্ঞানে বিদ্যায় বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ কুমুদ ; যাত্রাদলের অভিনেতা সাজিয়া তাহার আবির্ভাব ? একি ব্যর্থ যায় ! শশীর মন শান্ত হইয়াছে, স্থিতিলাভ করিয়াছে।"

"শশী ইহাও বুঝিয়াছে যে জীবনকে শ্রদ্ধা না করিলে জীবন আনন্দ দেয় না। শ্রদ্ধার সঙ্গে আনন্দের বিনিময়, জীবনদেবতার এই রীতি।"

শশী তাই প্রাণপণে জীবনকে শ্রদ্ধা করে। সঙ্কীর্ণ জীবন, মলিন জীবন, দুর্বল পঙ্গু জীবন, সমস্ত জীবনকে। নিজের জীবনকে সে শ্রদ্ধা করে সকলের চেয়ে বেশি।—এ যেন মানিকের নিজেরই উক্তি। পরবর্তীকালে লেখকের কথায় মানিক এরূপ উক্তি করেছেন। জীবনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা মানিককে সাধারণ মানুষের জীবনের প্রতি আকর্ষণ করেছে।

শশীর কিন্তু দিন দিন গ্রাম-জীবনে বিরাগ আসে। "যত দিন যায়, গ্রাম ছাড়িয়া নূতন জগতে, নূতন করিয়া জীবন আরম্ভ করিবার কল্পনা শশীর মনে জোরালো হইয়া আসে।" কিন্তু নানা কাজে তা সম্ভব হয় না। যাদব পণ্ডিত সূর্য-বিজ্ঞানে পারদর্শী; তিনি নিজের মৃত্যুর কথাও বলতে পারেন। তিনি আগামী রথের দিন দেহত্যাগ করবেন ঠিক হয়ে আছে। চতুর্দিক থেকে ভক্তের দল ভিড় করে এল। শেষকালে যাদব পণ্ডিত ও তার স্ত্রী পাগলদিদি দেহত্যাগ করল। ডাক্তার শশী বুঝতে পারল অতিরিক্ত আফিম খেয়ে তাদের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু শশী মুখ-ফুটে তা কোনদিন কারুর কাছে প্রকাশ করে নি। বরং মৃত্যুর পরে যাদব পণ্ডিতের টাকায় তার ইচ্ছানুসারে একটি দাতব্য হাসপাতাল গড়ে তুলল। শশীর জনপ্রিয়তাও আকস্মিকভাবে বৃদ্ধি পেল। কুসুম বহুবার বহুভাবে ন'বৎসর ধরে শশীর কাছে আত্মনিবেদন করেছে। কিন্তু শশী সেদিকে দৃষ্টি দেয় নি। কুসুমের উচ্ছ্বাসেও ভাটা পড়েছে। শশী তাকে তার কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলে, "আকাশের মেঘ কমে নদীর জল বাড়ে,—নইলে কি জগৎ চলে ছোটবাবু?" কুসুম ঠিক করেছে বাপের বাড়ী চলে যাবে।

শশী পরদিন সকালবেলায় কুসুমকে ডেকে নিয়ে গেল তালবনে। কুসুম চিরকাল হালকা সুরে কথা বলে। শশী যখন জিজ্ঞেস করল, "তোমার কি হয়েছে বুঝতে পারছি না বৌ।" তখন কুসুম বলল, "কি করে বুঝবেন! মেয়ে মানুষের কত কি হয়, সব বোঝা যায় না।

হলেনই বা ডাক্তার! এ তো জ্বর-জ্বালা নয়।...দশ বছর খেলা করেও সাধ মেটে নি? আমরা মুখ্যু গেঁয়ো মেয়ে এসব খেলার মর্ম তো বুঝি না, কষ্টে মরে যাই।"

এক সময় শশী কুসুমের হাত ধরল। কুসুম কিন্তু আপত্তি করল না। শুধু বলল, "কতবার নিজে যেচে এসেছি, আমাকে ডেকে এনে হাত ধরা-টরা কি উচিত ছোটবাবু?"

শশী কুসুমকে নিয়ে কোথাও চলে যাওয়ার প্রস্তাব করে। শশী আজ তাকে 'কুসুম' নাম ধরে ডাকে। কুসুম আজ স্পষ্ট জবাব দেয়, "আপনি বুঝি ভেবেছিলেন যেদিন আপনার সুবিধে হবে ডাকবেন, আমি অমনি সুড়সুড় করে আপনার সঙ্গে চলে যাব? কেউ তা যায়?"

শশী অধীরভাবে বলল, "একদিন কিন্তু যেতে"।

"কুসুম স্বীকার করিয়া বলিল, তা যেতাম ছোটবাবু। স্পষ্ট করে ডাকা দূরে থাক, ইশারা করে ডাকলে ছুটে যেতাম। চিরদিন কি একরকম যায়? মানুষ কি লোহায় গড়া যে, চিরকাল সে এক রকম থাকবে, বদলাবে না? বলতে বসেছি যখন কড়া করেই বলি। আজ হাত ধরে টানলেও আমি যাব না।"

কুসুম আরও বলল, "লাল টকটকে করে তাতানো লোহা ফেলে রাখলে তাও আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে যায়, যায় না?...কাকে ডাকছেন ছোটবাবু, কে যাবে আপনার সঙ্গে? কুসুম কি বেঁচে আছে? সে মরে গেছে।"

"মিনিটখানেক চুপচাপ দাঁড়াইয়া থাকিবার পর বাড়ির দিকে চলিতে আরম্ভ করিবার সময় কুসুম শুধু বলিল, আপনি দেবতার মত ছোটবাবু।"

"আজ এ ঘটনা শশীর কাছে যত ভয়ানক মনে হোক এই পরিণতিই তো স্বাভাবিক। গাঁয়ের মেয়ে ঘরের বৌ কুসুম, মনোবাসনা কতদূর অদম্য হইয়া ওঠায় দিনের পর দিন নৈবেদ্যের মত নিজেকে শশীর কাছে সে নিবেদন করিয়া চলিয়াছিল এখন শশী তা বুঝিতে পারে, কুসুমের অমন ভয়ানক উপবাসী ভালবাসা যে এতকাল সতেজে বাঁচিয়া

ছিল তাই তো কল্পনাতীতরূপে বিস্ময়কর। আপনা হইতে যে প্রেম জাগিয়াছিল আপনা হইতে স্বাভাবিক নিয়মে আবার তা লয় পাইয়াছে।"

দিবারাত্রির কাব্যের রোমান্টিক প্রেম এখানেও প্রাণঘাতী যন্ত্রণা বিশেষ তবু এই উপন্যাসের বাস্তব পরিমণ্ডলে তা অনেক স্বাভাবিক হয়েছে। সুপ্রিয়া আনন্দের প্রেমের মত তা উদ্দাম নয়।

অবশেষে কুসুম চলে গেল। যামিনীও মারা গিয়েছে। সেনদিদিও অনেক বয়সে একটা ছেলে হতে গিয়ে মারা গেলেন। গোপালের এ ব্যাপারে ব্যাকুলতা শশীকে আরো বিরূপ করে তুলল। গোপালের সঙ্গে শশীর সম্পর্ক আরো তিক্ত হলো। গোপাল যামিনী কবিরাজের ছেলেটিকে মানুষ করার জন্য নিজের বাড়ী নিয়ে এল। এটা আসলে গোপালেরই ছেলে।

শশী ঠিক করল সে গাঁ ছেড়ে চলে যাবে। বৈচিত্র্যহীন গ্রাম-জীবনে বিতৃষ্ণ হয়ে পূর্বেও গ্রাম ছাড়বার ইচ্ছা শশীর মনে কয়েকবার জেগেছিল। কিন্তু এবার তার ইচ্ছা দৃঢ়তা লাভ করল। এমন কি হাসপাতালের জন্য নতুন ডাক্তারও নিযুক্ত হলো। শশী বিলেত যাবে। গোপাল কিন্তু শশীর যাওয়ার কথা শুনে মুষড়ে পড়ল। শশীকে সে কিছুতেই নিরস্ত করতে পারল না। গোপাল প্রথমে ভাবল, যামিনীর ছেলেটার জন্যই শশীর এত রাগ। সেজন্য একদিন সে ছেলেটাকে নিজের শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দিল। কিন্তু শশী দিন-স্থির করে ফেলেছে। অন্য উপায় না দেখে গোপাল বাক্স বিছানা নিয়ে গুরুদেবের কাছে কাশী রওনা হলো। শশীকে বলে গেল সাত-আট দিন পরে ফিরবে। একজনের বাধ্য হয়ে বাড়ী থাকতে হয়। শশী অগত্যা থেকে গেল। কিন্তু গোপাল আর ফেরে নি। যাওয়ার সময় সে তার শ্বশুরবাড়ী থেকে সেনদিদির ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে।

বিষণ্ণচিত্তে শশী তার যাওয়ার আয়োজন বাতিল করে দিল। দু'মাসের মাইনে দিয়ে নতুন ডাক্তারকেও বিদায় করে দিল। এক অদৃশ্য অজানা শক্তির ইঙ্গিতে তাকে পুতুলের মত অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে হলো।

এই উপন্যাসে দু'টি উপকাহিনী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এক, শশীর ভগ্নী বিন্দুর কাহিনী। বিন্দুর স্বামী নন্দলাল কোলকাতায় বিরাট বড়লোক। তার অন্য বিবাহিত স্ত্রী ছিল। সে বিন্দুকে গণিকার মত অন্য বাড়ীতে আলাদা রেখেছিল। সেখানে বিন্দু গান করত, মদ খেত। তার এই দুর্বিসহ জীবন থেকে শশী তাকে গাওদিয়ায় নিয়ে এল। গোপাল কিন্তু শশীর এ কাজ সমর্থন করতে পারে নি। "গোপাল রাগারাগি করিল,—শশীর সঙ্গে তার কলহ হইয়া গেল। চেঁচামেচি করিয়া বলিতে লাগিল, সে এমন কাণ্ড জীবনে কখনো দেখে নাই। স্ত্রীকে মানুষ নিজের খুশিমত অবস্থায় রাখিবে এই তো সংসারের নিয়ম। মারধোর করিলে বরং কথা ছিল। কিছুই তো নন্দ করে নাই। যা সে করিয়াছে বিন্দুর তাতে বরং খুশি হওয়াই উচিত ছিল। স্ত্রীকে ভিন্ন বাড়ীতে হীরা-জহরত দিয়া মুড়িয়া রাখিয়া চাকর-দারোয়ান রাখিয়া দিয়া কেহ যদি নিজের একটা খাপছাড়া খেয়াল মিটাইতে চায়, স্ত্রীর সেটা ভাগ্যই বলিতে হইবে। স্বামীর সে অধিকার থাকিবে বই-কি। মদ খায় নন্দ। সংসারে কোন্ বড় লোকটা নেশা করে না শুনি? শশী গোপালের কথায় সায় দিতে পারে নি। কিন্তু সাত বছরের অভ্যেস ছেড়ে বিন্দু থাকতে পারে না। যে মদ একদিন নন্দ সাঁড়াসি দিয়ে তার মুখে জোর করে ঢেলে দিয়েছিল, আজ সেই মদ ছাড়া বিন্দু থাকতে পারে না! শশীর ডাক্তারখানা থেকে চুরি করে সে মদ খায়। এমনকি শশী যখন হার স্বীকার করে বিন্দুকে আবার কোলকাতায় ফিরিয়ে দিয়ে আসে তখনো বিন্দু নন্দর পুরানো বাড়ীতে সকলের সঙ্গে গিয়ে বাস করতে পারে নি। কারণ মানুষ যে পুতুলের মত দীর্ঘদিনের অভ্যাস সংস্কারের বশীভূত। তাকে অস্বীকার করা সহজে সম্ভব নয়।

এ উপন্যাসের অপর খণ্ড কাহিনী হলো মতি ও কুমুদের কাহিনী! কুমুদ দ্বিতীয়বার গাওদিয়ায় এসে মতিকে বিয়ে করে কোলকাতায় নিয়ে যায়। কুমুদ এ বিয়ের ব্যাপারে শশীর সাহায্য চেয়েছিল। শশী কুমুদকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। তার এক সময়

মনে হয়েছিল, সে-নিজেই মতিকে বিয়ে করতে পারে। কিন্তু শশীর চরিত্রের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা তার আত্মবিশ্বাসের অভাব। তার মনের কোন জোর নেই। বিয়ের পর কুমুদ মতিকে নিয়ে অনির্দিষ্টের দিকে পাড়ি জমায়। মতিকে দিয়ে সে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিল যে, সে গাওদিয়ার সঙ্গে কোন সংযোগ রাখতে পারবে না। প্রথমে তারা এক হোটেলে উঠে। তারপর হোটেল থেকে এক বাড়ীতে উঠে যায়। কিন্তু কুমুদের প্রকৃতি বোহেমিয়। সে এক জায়গায়, এক চাকরীতে বেশীদিন থাকতে পারে না। কুমুদ থিয়েটারে চাকরী নিল। কিছু কিছুদিন পর সে চাকরী ছেড়ে চলে গেল পুরানো যাত্রা দলে। মতিও কুমুদের সঙ্গে অনিশ্চয়ের পথে সঙ্গী হলো।

নীড়হারা বোহেমিয় কুমুদ ও মতির কথা পরে বলবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মানিক এখানেই এই উপকাহিনী শেষ করেছেন।

এই উপন্যাসে মানিকের সূক্ষ্ম বাস্তবধর্মিতা এবং অদ্ভুত চরিত্রাঙ্কন শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রতিটি চরিত্র জীবন্ত এবং সার্থক।

শশী এই উপন্যাসের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। সে বৈজ্ঞানিক, ডাক্তার, গ্রামের মানুষের সাহায্যে অকৃপণ উদারতায় সঙ্গে এগিয়ে যায়। তাদের দুঃখ দৈন্যে ভরা ক্লেদময় জীবন তার গভীর অনুভূতির উদ্রেক করে। শশী এদের সকলের জন্য দুঃখ বোধ করে। কিন্তু প্রতিকারের কথা চিন্তা করতে পারে না। এক একটি ঘটনায় সে বিস্ময়বোধ করে। শশী এই পল্লীজীবনের চালক বা কর্ণধার নয়। সে দর্শক মাত্র। মানিক শশীকে কেন্দ্র করে পল্লী-মানুষের চিরাভ্যস্ত জীবনধারা বর্ণনা করেছেন। বিভূতিভূষণের অপুর মত সে এই জীবনকে দেখে রোমান্টিক কল্পনায় অভিভূত হয়ে পড়ে না। পল্লী-জীবনের ধূসর বাস্তবতাকে সে উন্মোচিত করে চলে। মিথ্যা আবরণটুকু সরিয়ে সত্যকে স্বচ্ছ করে তোলে। এখানেই বিভূতিভূষণের সঙ্গে মানিকের পার্থক্য।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

বাড়ীতে পুরনো "বঙ্গশ্রী" ছিল অনেক। মলাট ছেঁড়া, অনেক সংখ্যার আগাগোড়া নেই। তাতে মাঝে মাঝে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা দেখতাম। আর সেই সঙ্গে ছিল বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধারাবাহিক রচনা "বিচিত্র জগৎ" এবং প্রমথনাথ বিশীব "জোড়াদিঘীর চৌধুরী পরিবার"। ডঃ সুকুমার সেনের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' বিষয়ক রচনাও ধারাবাহিক রচনা হিসেবে বের হতো। আরো অনেকের গল্প ও কবিতা বের হোত। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখার ধরন ও বিষয়বস্তু একান্ত নিজস্ব—আলাদা এবং স্বতন্ত্র। অন্যান্যদের লেখার সঙ্গে, কি রচনার ভঙ্গীতে বা বিষয় বস্তুতে মিল নেই। সেই বালক বয়সে সব বুঝতাম না। অনেক কিছুই জটীল লাগতো। তবু মনে হত একটা কি যেন আছে লেখার মধ্যে। আমার বালক মনে সেটা উপলব্ধি করলেও ঠিক প্রকাশ করতে পারতাম না।

আজ বুঝি মানিকের লেখা ছিল অনন্য। কি প্রকাশ ভঙ্গীমায় কি বিষয়বস্তুতে। তাঁর বিজ্ঞাননিষ্ঠ মন অনাবশ্যক কাব্যের সুষমা-মণ্ডিত ভাষায় বক্তব্যকে জটীল করেন নি। তিনি তাঁর বক্তব্য বলিষ্ঠ সজীব কণ্ঠে সোচ্চারে বলেছেন। বক্তব্য এবং বিষয়বস্তুর লাঘবতাকে কখনোই কাব্যমণ্ডিত ভাষার পালিশে তিনি ঢেকে দেন নি।

শুনলে আজকালের অনেকেই চমকে উঠবেন—মানিকের লেখা পড়লেই বোঝা যায় মানিক ছিলেন জন্ম রোমান্টিক। জন্ম রোমান্টিক না হলে "দিবারাত্রির কাব্য", "পুতুল নাচের ইতিকথা" এবং "পদ্মানদীর মাঝি" লেখা যায় না। রোমান্টিক হলেই গজদন্ত-

মীনারের লেখক হবেন একথা সত্য নয়। রোমান্টিক হলেও বাস্তব এবং বস্তুনিষ্ঠ হতে বাধা কোথায়? মন রোমান্টিক না হলে গোর্কির মত লেখক "চেলকীশ" এবং "একটি শারদ সন্ধ্যা"র মতো মিষ্টি প্রেমের মধুর অথচ রূঢ় বাস্তবের গল্প লিখতে পারতেন না।

সম্প্রতি মৃত্যুর অনেক কাল পরে অনেক পত্র-পত্রিকা থেকে খুঁজে বের করে "মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা" বের হয়েছে। মানিকের কবিতার ইস্পাত-কঠিন বুনন এবং সারল্য এবং বিষয় আমাদের মুগ্ধ করে, বিস্মিত করে। এক-একটি লাইন আমাদের হৃদয়ে সাড়া জাগায়, আঘাত করে। হৃদয়ের দুয়ার ব্যথায় বেদনায় আক্রোশে রুধির স্নান করতে চায়। মানিক বর্তমান বাংলাদেশের রবীন্দ্র পরবর্তী যুগের প্রথম-সারির কবিদের অনেকের থেকে ভালো কবিতা লিখতেন। তিনি যদি কবিতার চর্চা করতেন তবে শুধুমাত্র কবি হিসাবেও অগ্রগণ্য বলে পরিচিত হতেন।

মানিকের "সহরতলী" উপন্যাস প্রথমে প্রকাশিত হয়েছিল শারদীয়া সংখ্যা "আনন্দবাজার পত্রিকা"য় ১৩৪৬ সালে। মানিক তখন ২৯।৩০ বৎসরের যুবক। "আনন্দবাজার পত্রিকা" তখন সর্ব প্রধান সংবাদপত্র। তার ঐতিহ্য তখন গগনচুম্বী। রবীন্দ্রনাথ তখন জীবিত। রবীন্দ্রনাথের "ল্যাবরেটরি" অথবা "রবিবার" নামক বিখ্যাত গল্পের পাশাপাশি মানিকের "সহরতলী" উপন্যাস মুদ্রিত হয়েছিল। এ গৌরব বোধহয় বর্তমান যুগের লেখকদের মধ্যে ২।১ জন ছাড়া কেউ করতে পারেন না।

মানিককে বোধহয় প্রথম দেখি ১৯৫৩।৫৪ সালে ক্যালকাটা পাবলিশার্সে। মানিক তখন অসুস্থ। বোধহয় হাসপাতালে আছেন। তাঁর "সোনার চেয়ে দামী" অথবা "তেইশ বছর আগে পরে" বোধহয় মুদ্রিত হচ্ছিল। তাঁকে দেখে শ্রদ্ধা হয়েছিল। কথা ও আচরণে জড়তা নেই। আপোষহীন মনোভাব। কোনো মোহ নেই কোনো কিছুর প্রতি।

তারপর তাঁকে আরো কয়েকবার কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় দেখেছি। ইতিমধ্যে পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা বিরল হয়ে এসেছিল। শুনতে পেতাম তিনি অসুস্থ। তারপর অকস্মাৎ তাঁর মৃত্যুসংবাদ এলো।

এত অল্প বয়সে এমন একটি বিরল প্রতিভার অবসান ঘটলো— ভাবতে ভাবতে চোখে জল এসেছিল।

পরে যখন পুস্তক ব্যবসা সুরু করেছিলাম তখন শ্রদ্ধা নিবেদন করতেই তাঁর বই প্রকাশ করেছিলাম। তাঁর নব পর্যায়ে গ্রন্থাবলী প্রকাশেও কাঠবিড়ালীর কাজ করতে পেরেছি বলে আমি ধন্য।

মানিক বাংলা সাহিত্যকে অনেক দূরে এগিয়ে দিয়েছেন। মানিকের পাঠক ধীরে ধীরে তৈরী হচ্ছে। আগামী যুগে আরো পাঠক হবে। তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যকে আরো বেশী ভালোবাসবে।

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নেয়ারের খাট, মেহগিনি-পালঙ্ক এবং একটি দুটি সন্ধ্যা

ডিসেম্বর, ২।১৯৫৬

খাট থেকে ধরাধরি করে যখন নামানো হল, তখন দুটি চোখই খোলা। কপালের ওপর আর কানের পাশে কয়েকটা শিরা কুঁচকে উঠেছে। ডান হাতটা প্রতিবাদের ভঙ্গীতে একবার নাড়লেন। চাউনীতেও তীব্র প্রতিবাদ ছিল। গলায় অস্ফুট শব্দ, যার কোন ভাষা নেই কিন্তু যন্ত্রণা আছে।

ডাক্তারীশাস্ত্র আমি জানি না, মনোবিজ্ঞানেও পারদর্শী নই। তবু খাট থেকে সেই বিরাট দেহটা যখন বহু যত্ন আর পরিশ্রমে স্ট্রেচারে তোলা হল—তখন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চোখ, গলা আর হাতের মিলিত অভিব্যক্তিতে আমার শুধু মনে হল—প্রতিবাদ! প্রতিবাদ আর ভাষাহীন যন্ত্রণা!

অথচ শুনেছি বিকেল থেকে তিনি অচৈতন্য। সন্ধ্যার সময় খবর পেয়ে যখন পৌঁছেছি, তখনও তাঁকে সজ্ঞানে দেখি নি। ছোট ঘর, চাটের পর্দা দিয়ে কোন রকমে পার্টিসান করা। ও পাশে বৃদ্ধ বাবা রোগশয্যায় শুয়ে, নীরবে। এ পাশে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মৃত্যুশয্যায় পড়ে নীরবে। একটা ভাঙা আলমারি, একখানা বুক-সেল্‌ফ্, একটি টেব্‌ল্। অজস্র বই আর পত্র-পত্রিকা গাদা করা। কিছু চিঠি আর ছেঁড়াখোঁড়া পাতায় লেখা খসড়া রচনা এখানে ওখানে গোঁজা। যেন কিছু সৃষ্টির বীজ হেলা-ফেলা করে ছড়ানো। টেবিলের ওপর কয়েকটা ওষুধের শিশি আর চীনেমাটির ওআটার বট্‌ল্। জয়ন্তী সংকলন 'পরিচয়' এবং মলাট ছেঁড়া পুরনো 'মৌচাকে'র একটি বার্ষিক সংখ্যা বুক-সেল্‌ফের ওপর এমনভাবে রাখা যে চোখে পড়বেই। মাথার কাছে বাড়ির বাসিন্দেরা দাঁড়িয়ে। কারোর মুখে কথা নেই, চোখে আশঙ্কা

আর প্রশ্ন। ভাষাহীন প্রশ্ন। যা আমাদের সারা গায়ে বিঁধছে, মাথা হেঁট করে দিচ্ছে।

পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে নেয়ারের খাটটার এক মাথা শক্ত দুহাতে চেপে ধরে আমি স্তম্ভিত বিস্ময়ে তাকিয়েছিলাম। লেপের তলায় সমস্ত শরীরটা ঢাকা শুধু ডান হাতের কনুই থেকে কব্জি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। চওড়া হাড়ের ওপর মাংস নেই, মেদ নেই। শিথিল চামড়া। যেন আকাশের দেবতার ভ্রূকুটিতে সমস্ত সঞ্চয় কে শুষে নিয়েছে। দেখছিলাম মানিকবাবুর কপালে কি অজস্র রেখার জটিল আঁকিবুঁকি। মুখের এখানে ওখানে দু-একটা কাটা-ফাটার চিহ্ন। মাথায় কদিন তেল পড়ে নি জানি না, শুকনো চুলগুলো বালির মতো ঝুরঝুরে। পাক ধরেছে। আর, সেই আশ্চর্য চোখ দুটো বন্ধ।

এই অনুভূতিই আমাকে হতবাক করে দিচ্ছিল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমি যাঁকে দেখছি, তিনি আজ চোখ বন্ধ করেছেন। সমস্ত বাংলাদেশ যে দুটো চোখকে ভয় করত, শ্রদ্ধা করত, ভয় আর শ্রদ্ধা—সেই চোখজোড়ার পাতা এখন নামানো। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন, অথচ তাঁর চোখে দৃষ্টি নেই, হাতে সামর্থ্য নেই—এ কি বিস্ময়।

সেই আশ্চর্য মৃত্যুশয্যার পাশে দাঁড়িয়ে আমার কান্না পায় নি। অথচ বরানগরে ছুটে আসার সময় বারবার মনে হয়েছিল, হয়তো সইতে পারবো না। হয়তো ভেঙে পড়বো। কিন্তু সেই আশ্চর্য মৃত্যুশয্যার পাশে দাঁড়িয়ে আমার কান্না পায় নি। আমি শুকনো দুটো চোখে কান্না আর জ্বালা, কান্না আর জ্বালা নিয়ে দেখছিলাম। অক্সিজেনের সিলিণ্ডারটা খাটের তলায় শুইয়ে রাখা। সরু একটা রবারের নল বাঁ নাকের ফুটোয় ঢোকানো। শরীরের নাড়াচাড়ায় যাতে পড়ে না যায় তাই এক টুকরো প্লাস্টার দিয়ে নলটা গালের ওপর সেঁটে দেওয়া হয়েছে। মাঝে মাঝে ডান হাতটা অস্থিরভাবে নাড়ছেন। মাঝে মাঝে গলা দিয়ে কাতর শব্দ বেরুচ্ছে, যার কোন ভাষা নেই কিন্তু যন্ত্রণা আছে।

আমি ভেঙে পড়ি নি। সেই চতুষ্কোণ খাটে শোয়ানো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শরীরের দিকে তাকিয়ে আমি দেখছিলাম বাংলাদেশের চিহ্ন। মনের মধ্যে আবেগের ছিটে-ফোঁটাও তখন ছিল না। পোড়-খাওয়া অকালবৃদ্ধ আর অভিজ্ঞ গাণিতিকের মতো আমি হিসেব কষছিলাম।

আসার পথে কি দেখেছি? দেশবন্ধুর কৌমার্যব্রতী শিষ্য বিধান রায়ের আলোকোজ্জ্বল প্রাসাদ, ওএলিংটন স্কোঅ্যারে বামপন্থীদের বৃহৎ নির্বাচনী সভা, রাস্তার দেয়ালে হাঙ্গেরীর গোলযোগের ওপর উত্তেজিত পোস্টার, কলেজ স্ট্রীটে সারবাঁধা বইয়ের দোকান, সিনেমা হলের সামনে লম্বা লাইন আর পুলিশ। কি শুনেছি? দক্ষিণেশ্বরগামী কিছু বাসযাত্রীর পরলোকতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা, খাবারের দোকান বা চায়ের স্টল থেকে হঠাৎ ছিট্‌কে আসা দু-এক কলি চটুল বা গম্ভীর গানের সুর।

যা দেখেছি আর যা শুনেছি তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি তাকিয়ে-ছিলাম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে, যিনি এখন চোখ বুঁজে। যা দেখেছি আর যা শুনেছি তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি তাকিয়েছিলাম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে, যাঁর ডান হাতটা দুর্বলভাবে উঠছে আর নামছে। যা দেখতে আর শুনতে হয়েছে, সেই বিচিত্র পটভূমিতে দাঁড়িয়ে আমি তাকিয়েছিলাম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে যিনি মরে যাচ্ছেন।

বোবার গানের মতো এই একটা কথা বারবার আমার মনে জান্তব আর্তনাদের আঁচড় কাটছিল, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মরে যাচ্ছেন।

কি চিকিৎসা হয়েছিল, তার প্রমাণ পাচ্ছি টেবিলে ওষুধের শিশি কটা দেখে। কি পথ্যি তিনি পেয়েছেন, তার প্রমাণ মিলেছে বৌদির মুখের অসতর্ক একটি কথায়। সুভাষ মুখোপাধ্যায় মানিকবাবুর স্ত্রীকে অভিযোগ করে বলেছিলেনঃ এমন অবস্থা, আগে টেলিফোন করেন নি কেন? উত্তরে তাঁকে হাসতে হয়েছিল। আর তারপর অস্ফুটে

বলে ফেলেছিলেন ঃ তাতে যে পাঁচ আনা পয়সা লাগে ভাই।—মৃত্যুকালে বাংলাদেশ তাঁকে কি মর্যাদা দিল, তারও প্রমাণ আমরা বাইরের সাতটি মানুষ। অথচ নাকি লেখক, পাঠক এবং কৃষ্টি-কলার পৃষ্ঠপোষক সংখ্যায় আমরাই ভারতবর্ষে অগ্রণী। আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি!

মিউনিসিপ্যালিটির ভাঙা এ্যাম্বুলেন্স এল। যে মানুষটাকে খাট থেকে নামালে হার্ট ফেল করার সম্ভাবনা, তাঁকে এই গাড়িতেই নীলরতন সরকার হাতপাতালে নিয়ে যেতে হবে। অর্থাভাবে ভাল গাড়ি আর মুরুব্বির অভাবে বড় হাসপাতালের ব্যবস্থা করা যায় নি। কলকাতার পথে পথে অসহায় দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় নাকি এখনও একটি পরশপাথরের সন্ধান করে বেড়াচ্ছেন।

ডাক্তারবাবু একটা ইনজেকসান দিলেন। চিকিৎসাশাস্ত্র আমার জানা নেই। অচৈতন্য মানুষের যন্ত্রণাবোধ আছে কিনা জানি নে। কিন্তু দেখলাম হাতের ওপর স্পিরিটমাখা তুলো ঘষতেই মানিকবাবু অল্প চোখ মেললেন। বিড়বিড় করে কি যেন বললেন। কথা, না গলার ঘড়ঘড়ানি তা বুঝলাম না। ইনজেকসান দেবার সময় ব্যথায় তাঁর সমস্ত শরীরটা মুচড়ে উঠল। চোখ ছুটো খুললেন। তাতে যেন কিছুটা ভয়, কিছু বেদনা। ভয় আর বেদনা। তারপর ধরাধরি করে যখন তাঁকে স্ট্রেচারে তোলা হল, তখন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাকিয়েছেন। তাঁর চোখ, গলা আর হাতের মিলিত অভিব্যক্তিতে আমার মনে হল, তিনি প্রতিবাদ করছেন। বাড়ি ছেড়ে যেতে কিংবা শেষ মুহূর্তে বাংলাদেশের সাতটি মানুষের সহায়তা গ্রহণ করতে।

প্রচণ্ড ঝাঁকুনী দিয়ে গাড়ি ছাড়ল। মেঝেতে স্ট্রেচারের ওপর তিনি শুয়ে। মাথার কাছে আমি। বুকের ওপর ঝুঁকে ডাক্তারবাবু। তাঁকে সমস্ত পথ পাল্‌স্ দেখতে হবে। বরানগরের ছুটি তরুণ শক্ত করে অক্সিজেনের সিলিণ্ডার ধরে। দরজার কাছে বেঞ্চির ওপর বসে আছেন বৌদি এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়। বৌদির হাতে চীনেমাটির

সেই জলের পাত্রটা। সামনে ড্রাইভারের প্যাশে 'স্বাধীনতা'র মণি ভট্টাচার্য। কলকাতা থেকে আর যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা বাসে ফিরবেন।

ড্রাইভারকে আস্তে চালাতে বলা ছিল। আস্তে আর সাবধানে। অথচ গাড়িটা প্রায় বাতিলের পর্যায়ে পড়ে। রাস্তাও খারাপ। থেকে থেকে ঝাঁকুনী লাগছে। সকলে এক-একবার চমকে মানিকবাবুর মুখের দিকে তাকাচ্ছেন। তারপর ছোট্ট এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছেন।

মৃত্যুর এত কাছে এর আগে আমি আসি নি। আমার শরীর, মন এবং অনুভূতির ওপর এতো চাপও কখনো পড়ে নি। হাঁটু গেড়ে বসে দুটো হাত তাঁর কপাল, গাল, কখনো গলার খাঁজে শক্ত করে ছুঁইয়ে রেখেছিলাম। শুশ্রূষার আবেগে নয়, তিনি বেঁচে আছেন আর শরীরটা এখনো গরম—শুধু এটুকু উপলব্ধির স্বস্তি পাবার জন্য।

বরানগর থেকে মৌলালি। কি দীর্ঘ সেই যাত্রা আর কি ভয়ংকর। স্পষ্ট বুঝছিলাম আস্তে অস্তে তাঁর জ্বরতপ্ত শরীরের উত্তাপ কমছে। আর আহ্, আমি বুঝছিলাম তিনি মরে যাচ্ছেন। নাড়ী ধরে মুখ নীচু করে বসে ডাক্তার কি ভাবছিলেন জানি নে। একটু উত্তাপের জন্য আমি কি প্রার্থনা করবো? কিন্তু কার কাছে, কি ভাবে? আমি কি চীৎকার করে, চীৎকার করে ডাক্তারবাবুকে ধম্‌কে উঠবো? গাড়ি থামিয়ে একটা ইনজেকসান কেন দিচ্ছেন না এই অজুহাতে? মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মরে যাচ্ছেন অথচ আমার কিছু করার নেই কেন?

মাঝে মাঝে তীব্র দৃষ্টিতে ডাক্তারের দিকে তাকাচ্ছিলাম। আমার চোখ জানতে চাইছিল, কি বুঝছেন? কিন্তু তিনি নির্বাক। আমার চোখ বলতে চাইছিল, সাবধান। কিন্তু তিনি নির্বাক। দেখলাম তাঁর কপালে কয়েকটা শিরা ফুলে উঠেছে, চোখের দৃষ্টি সংক্ষিপ্ত আর তীক্ষ্ণ, ডিসেম্বর মাসে ঝরঝর করে ঘামছেন। আমার কপালেও বিনিবিনি ঘাম। আবার গাড়িটা ঝাঁকানি দিল। মনে হল একটা

জন্তুর মত চীৎকার করে, চীৎকার করে ড্রাইভারকে গালাগাল দি। কিন্তু তিনি নির্বাক। আর সত্যিই তো, ড্রাইভারের দোষ কোথায় ?

হাতটা আর নাড়াচ্ছেন না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত নিশ্চল হয়ে গেছে। শুধু মুখটা মাঝে মাঝে হাঁ করছেন নিশ্বাস নেবার অস্থির চেষ্টায়। মাঝে মাঝে যন্ত্রণায় অস্ফুট আর্তনাদ করছেন। কিছু কি বলছেন ? কান পেতে শুনলাম—নাঃ, নাঃ। কি না, কেন না, আমি জানি না। আমি জানি না। কিন্তু হাসপাতালে পৌঁছবার আগে আরও কয়েকবার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একইভাবে বলছেন—নাঃ, নাঃ।

গাড়ি ততক্ষণে বি. টি. রোডের মাঝামাঝি এসেছে। কানের পাশের শিরায় নাড়ির স্পন্দন অনুভব করা যায়, এ আমি দেখেছি। কিন্তু পাগলের মত হাতড়েও মানিকবাবুর সেই শিরাটি খুঁজে পেলাম না। ডাক্তারকে বললাম, গাড়ি থামিয়ে পাল্স্টা একবার দেখুন।

ডাক্তারবাবু সত্যিই গাড়ি থামাতে বললেন। রাস্তার মধ্যে হঠাৎ একটা এ্যাম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে পড়ায় একজন পথচারী জানালা দিয়ে উঁকি মেরেই চলে গেলেন। আমার কেন যেন হাসি পেল। হিংস্রতা আর কৌতুকভরা হাসি। লোকটা জানে না মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মরে যাচ্ছেন। দিকে দিকে এতো তুচ্ছ আর যেমনতেমন জীবনের টিঁকে থাকার ভাঁড়ামী, অথচ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হচ্ছে! লোকটা জানে না, কেউ জানে না। কিন্তু এই কলকাতা সহরেই বছর তিন চার আগে এমন একটি সন্ধ্যায় ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের প্রথম ও নিরাপদ সন্তান প্রসবের খবর নিয়ে আমাদের জাতীয়তাবাদী কাগজ-গুলোর বিশেষ সংখ্যা বেরিয়েছিল।

ডাক্তারবাবু পাল্স্ দেখলেন। তারপর হাতল ঘুরিয়ে সিলিণ্ডারে অক্সিজেনের চাপটা বাড়িয়ে দিলেন। বৌদির হাত থেকে জলের পাত্রটা চেয়ে মানিকবাবুর নাকের নল টেনে বার করে তার ভেতর চেপে ধরলেন। কি পরীক্ষা করলেন জানি না, শুধু দেখলাম জলের

ভেতর মৃদু শব্দে বুদ্‌বুদ উঠছে। আর ততক্ষণে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও প্রশ্বাসের আকুলতায় বুদ্বুদ হয়ে উঠছেন।

আবার গাড়ি ছাড়ল। মাঝে মাঝে বৌদির দিকে তাকাচ্ছিলাম। পাথরের মূর্তির মতো বসে। চোখে মুখে ভাবাবেগের কোন চিহ্ন নেই। এক দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকিয়ে আছেন। এমনকি একটিবার দীর্ঘশ্বাসও ফেললেন না। আমার কেমন যেন ভয় করছিল। ভয় আর অস্বস্তি। তাঁর দিকে চোখ তুলে চাইতে পারছিলাম না।

মাঝে মাঝে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের দিকে তাকাচ্ছিলাম! বৌদির সঙ্গে নীচু গলায় হয়তো দুটো কথা বললেন। চোরের মতো একটিবার মানিকবাবুর দিকে তাকালেন। তারপর আবার তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে বসে রইলেন। মনে পড়ল, হাসপাতাল এবং এ্যাম্বুলেন্সের সব বন্দোবস্ত করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্ট্রেচারে তোলার সময় সুভাষ মুখোপাধ্যায় দূরে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু প্রতিবেশীদের বন্ধ দরজাগুলো ঠিক তখনই একটা একটা করে খুলে যাচ্ছিল।

তারপর শ্যামবাজারের পাঁচরাস্তার মোড়। অনেক আলো, অনেক ভীড়, অজস্র কোলাহল। আলো আর ভীড় আর কোলাহল। কফি হাউস, কাগজের স্টল, নিয়ন আলোয় কিসের যেন বর্ণাঢ্য বিজ্ঞাপন। হাত দেখিয়ে ট্রাফিক পুলিস আমাদের সামনের কয়েকটা গাড়ির গতি রুদ্ধ করল। পাঁচ রাস্তার মোড়ের গোল চত্বরটার দিকে তাকিয়ে অবাক বিস্ময়ে আমার মনে পড়ল এই পৃথিবী সৌরজগতের একটি গ্রহ। তার ভেতর এসিয়া একটি মহাদেশ। তার বুকে ভারতবর্ষ একটি স্বাধীন, প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র। তার কোলে শহর কলকাতা—যার ইতিহাস আছে, ইতিহাস আর ঐতিহ্য। এবং যীশুখৃষ্টের জন্মের পর মানুষের সভ্যতার বয়েস হয়েছে এক হাজার নশো ছাপ্পান্ন বছর। আর আমার অসহায় দুটো হাত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কপালে, গালে, গলায় এই মুহূর্তে উত্তাপ খুঁজছে!

আবার বিশ্রী ঝাঁকুনী শুরু হল। এই ঐতিহাসিক নগরীর সার্কুলার রোড রাস্তাটি যে এত কদর্য, কোনদিন তা নজর করে দেখার প্রয়োজন হয় নি। এঁকেবেঁকে ট্রাম লাইন গেছে। লাইনের ফাঁকের ইঁট অসমান। ঝাঁকুনীর প্রকৃতি দেখে রাস্তার আকৃতি আন্দাজ করছিলাম। আমার সমস্ত ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতা শেষ বিন্দুতে পৌঁছেছিল। বারবার মনে হচ্ছিল, আর উপায় নেই। আর থেকে থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সেই একই সুরে অস্ফুটে আর্তনাদ করে বলে উঠছিলেন—নাঃ, নাঃ।

গাড়ি যখন হাসপাতালে পৌঁছল, তখন মানিকবাবুর মুখও বন্ধ হয়েছে। আর তিনি কথা বলেন নি। শুধু মনে আছে এমার্জেন্সীর টেবিলে পরীক্ষার পর যখন স্ট্রেচারে করে তাঁকে উডবার্নে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঁ চোখের কোণ থেকে এক-ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়েছিল। মানিকবাবুর কান্না! সমুদ্রের স্বাদ কিনা জানি নে। কারণ মনোবিজ্ঞানে আমার পারদর্শিতা নেই। হয়তো আগে যাঁদের দুর্জয় স্বাস্থ্য ছিল, মরার আগে স্নায়ুর দুর্বলতায় তেমন মানুষেরই চোখে জল আসে, হয়তো।

আর মনে আছে তারই কিছু পরে উডবার্নের বারান্দায় একটা কাঠের বেঞ্চিতে বসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী দেয়ালের দিকে তাকিয়ে স্বগতোক্তি করেছিলেনঃ দু'দিন আগে যদি আনা যেতো, তাহলে হয়তো মানুষটা বেঁচেও যেতে পারতেন।

মনে হল বৌদি সব বুঝতে পারছেন। আমার কাছ থেকে চশমাটা চেয়ে নিলেন। বাড়ি থেকে বেরোবার সময় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের খাপশুদ্ধ চশমাটা তিনি আমার কাছে রাখতে দিয়েছিলেন। হয়তো তাঁর আশা ছিল হাসপাতালে মানিকবাবু সেরে উঠবেন। তারপর আবার চশমাটা পরে সেই আশ্চর্য চোখ দুটো মেলে তাকাবেন পৃথিবীর দিকে। হয়তো।

আমি ঠিক জানি না। আমাকে জানতে নেই। হয়তো!

ডিসেম্বর, ৩।১৯৫৬

পালঙ্ক সুদ্ধ ধরাধরি করে যখন ট্রাকে তোলা হল, তখন একটা চোখ খোলা, একটা বন্ধ। ঠোঁটের এক পাশ একটু যেন চাপা। এটা ঠিক হাসির ভঙ্গী নয়। কিন্তু আমার মনে আছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাসির কয়েকটা ধরন ছিল। তা ছাড়া আধখোলা ডান চোখটার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই যেন ডান দিকের ঠোঁটে একটু চাপা হাসি।

শরীরের ওপর রক্তপতাকা বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার ওপর ফুল। মুখটুকু বাদে সমস্ত শরীরটা ফুলে আর ফুলে ছেয়ে গেছে। উপছে পড়ছে দুপাশে। হু হু করে হাওয়া বইছে আর ধুনুচির ধোঁয়া জটিল রেখাচিত্রের মত পাক খেয়ে চারপাশে অস্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে।

আজকে ঝাঁকুনি লাগলে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু লাগবে না। ট্রাকটা বড়, বড় আর পোক্ত। মধ্যিখানে সুদৃশ্য পালঙ্কের ওপর সেই মৃতদেহ। মাথা এবং পায়ের কাছে দেশনেতা, সাহিত্যিক! সামনে, পেছনে, দুপাশে বহু মানুষ। সর্বস্তরের মানুষ। মোড়ে মোড়ে ভীড়। সিটি কলেজের সামনে মাথার অরণ্য। কিন্তু কাল কেউ ছিল না, কিছু ছিল না।

বাংলাদেশটাকে আমি বুঝতে পারি না। হাত বাড়িয়ে বারবার ফুল নিচ্ছিলাম আর অবাক হয়ে, অবাক হয়ে চারিদিকে তাকাচ্ছিলাম। দেশের জ্ঞানী, গুণী আর সাধারণ মানুষের এই শোক, এই আবেগ যে কতো অকৃত্রিম তা আমার সমস্ত অনুভূতি দিয়ে বুঝছি। কাল এমনি সময় এ্যাম্বুলেন্সে বসে বাংলাদেশকে আমি ঘৃণা করেছিলাম। আজ তাকে কি বলবো? কাল কাঁদি নি, এখন আমার চোখে জল এল।

হঠাৎ গোপাল হালদার আঙুল বাড়িয়ে দেখালেন। ফুলের ভারে দামী পালঙ্কের একটা পায়ে ফাটল ধরছে। ভেঙে ভেতরের পেরেকটা

অনেকখানি বেরিয়ে এসেছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুরনো খাটটার কথা মনে পড়ল। শুনেছি নেয়ারের বাঁধন ছিঁড়ে গেলে তিনি নিজেই আবার তা বেঁধেছেঁদে নিতেন। খাটটার জীর্ণ অবস্থা নিজে দেখেছি। তবু তাতে মানিকবাবুর নিরাপদ আশ্রয় জুটতো।

অথচ আজ এই নতুন, সুদৃশ্য পালঙ্ক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত শরীরের ভার বহন করতে পারল না। অবিশ্যি মানিকবাবুর ওজন কোনদিনই এতো ছিল না। জীবনে এতো ফুলও তিনি পান নি।

আমি একা পারবো না দেখে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় এবং গোপাল হালদার এসে দাঁড়ালেন। পায়ের দিকের পায়া দুটো ঠেলে ধরে থাকতে হবে। নইলে পালঙ্ক ভেঙ্গে পড়বে।

হঠাৎ হাসি পেল। কাল এমনি সময় একটা ভাঙ্গা গাড়ির বুকে বসে একটা জীয়ন্ত শরীরের উত্তাপ পরীক্ষা করছিলাম। আজ একটা পোক্ত গাড়ির বুকে দাঁড়িয়ে একটা ভাঙা পালঙ্কের আয়ু সামলাচ্ছি।

আজ কপালে ঘাম নেই, একটু যেন শীতও করছে। রাত হয়েছে। আজও দীর্ঘ পথের যাত্রা, থেমে থেমে। তবে বরানগর থেকে মৌলালির হাসপাতাল নয়। মৌলালি থেকেই নিমতলার শ্মশানঘাট।

মনোবিজ্ঞানে আমার পারদর্শিতা নেই। তবে জানি মৃতদেহের ভাব অভিব্যক্তি বলে মানুষ যা ভাবে, আসলে তা তার নিজেরই কল্পনা। তবু মনে হচ্ছিল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একটা চোখ মেলে তাকিয়ে যেন সব কিছুই দেখছেন। আর তিনি যে দেখছেন, তা তাঁর ঠোঁটের চাপা হাসির টুকরোয় গোপন করেও রাখেন নি। দেখা আর প্রকাশ—মৃত্যুর পরও মানিক বাঁড়ুয্যের চরিত্র পাল্টায় নি!

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার মামাতো দাদা বীরেন্দ্রকুমার সেন থাকতেন কলকাতার পঞ্চানন ঘোষ লেনে। আমহার্স্ট স্ট্রীট সিটি কলেজের কাছেই এই গলিটা। এখান থেকেই আমার দাদা বের করেছিলেন একটি মাসিক পত্রিকা, নাম 'নবারুণ'।

কাজী নজরুল ইসলাম তখন বেশ শক্তসমর্থ দিলখোলা মানুষ। তিনি তাঁর দুই ছেলেকে নিয়ে প্রায়ই আসতেন এই পঞ্চানন ঘোষ লেনে। নজরুল ছিলেন আমার দাদার অন্তরঙ্গ সুহৃদ্।

পঞ্চানন ঘোষ লেনে সাহিত্য ও সাহিত্যিক নিয়ে অনেক আলাপ-আলোচনা হতো। খুব গান-বাজনাও হতো। নজরুল নিয়ে আসতেন গ্রামোফোন মেশিন ও রেকর্ড। রেকর্ডও বাজানো হতো খুব। সব ছাপিয়ে বেজে উঠত কাজী নজরুলের অট্টহাস্য।

আসরটা বেশ জমজমাট ছিল। এই আসরের টানে বালিগঞ্জ থেকে প্রায়ই এসে হাজির হতাম পঞ্চানন ঘোষ লেনে।

এখানেই প্রথম নাম শুনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তখনও তাঁর লেখা পড়িনি, তাঁকে চাক্ষুষ দেখিও নি। শুনতাম, 'প্রবাসী'তে আর 'বিচিত্রা'য় তাঁর গল্প বেরিয়েছে, খুব নাকি পাওয়ার্‌ফুল পেন্।

কিছুদিন পরে শুনলাম 'নবারুণ' পত্রিকাটির সম্পাদক হয়ে নাকি আসছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই দেখলাম 'নবারুণ' পত্রিকার নূতন সম্পাদককে। চোখে চশমা, বেশ বড়-সড় দেখতে, বেশ বলিষ্ঠ চেহারা।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই আমার প্রথম দেখা। সম্পাদকের দপ্তরে বসে সম্পাদকীয় গাম্ভীর্য নিয়ে সম্পাদকীয় কাজ করতে তাঁকে বড় একটা দেখি নি। তিনি আসতেন অল্প সময়ের জন্যে, কাগজপত্র

উল্টেপাল্টে দেখতেন, আমার দাদার সঙ্গে একটু আলাপ-আলোচনা করতেন, তার পর পূর্ণ দৈর্ঘ্যে উঠে দাঁড়িয়ে ঘর থেকে নেমে গলি-পথ পার হয়ে চলে যেতেন।

তখন তাঁর সঙ্গে অল্প একটু মাত্র পরিচয় হয়েছিল। কিন্তু সেটা ধর্তব্যের মধ্যেই না।

আমি একটা গল্প লিখে 'নবারুণ'-এর জন্যে রেখে এসেছিলাম। খুবই আশা ছিল যে গল্পটা ছাপা হবেই। কিন্তু কয়েকদিন পরেই গল্পটা ফেরত পেলাম, সেই সঙ্গে পেলাম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক মন্তব্য, তিনি লিখেছিলেন—

> আপনার লেখাটি ভালো লাগিল। বিষয়বস্তুও ভালো, উপস্থাপনাও সুন্দর। কিন্তু সমগ্রভাবে লেখাটি তেমন ফুটিয়া ওঠে নাই।

বলা বাহুল্য, গল্পটি ফেরত পেয়ে খুব আনন্দ পাই নি। কিন্তু ও-ব্যাপার নিয়ে মনোকষ্ট বেশিদিন পুষেও রাখি নি।

তার পরে ভালোভাবেই পরিচয় হয়েছিল তাঁর সঙ্গে।

এর কিছুদিন পরে আমার একটি উপন্যাস বের হল গ্রন্থাকারে। নাম 'একদা'। এটি আমার প্রথম বই। উৎসাহ ছিল তাই বিস্তর। একদিন দুপুরবেলা কয়েকখানা বই নিয়ে বালিগঞ্জ স্টেশনে ট্রেনে উঠেছি। কয়েকটি পত্রিকায় সমালোচনা করার জন্যে নিয়ে চলেছি ঐ বই। ট্রেনে দেখা হল এক অতি-পরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে, ইনি গাইয়ে অনুপম ঘটকের দাদা। তিনি ঐ বই দেখে বেশ উৎসাহিত হলেন, এবং আমাকে উৎসাহ ও আশ্বাস দিয়ে বললেন যে, একটি পত্রিকায় তিনি বইটির সমালোচনা করে দেবার ব্যবস্থা করতে পারেন, সেই পত্রিকাটির সম্পাদক নাকি তাঁর বন্ধু।

কোন্ পত্রিকা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন 'নবারুণ'। এবং বললেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নাকি তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু। আগে নাকি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের প্রতিবেশীই ছিলেন, কসবায়।

তাঁর কাছে এই কথা শুনে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনেকটা কাছের লোক বলে অনুভব করেছিলাম ; কেননা তিনি আমার এত পরিচিত মানুষের অন্তরঙ্গ এবং তিনি থাকতেন আমাদেরই পল্লীতে।

'নবারুণ' পত্রিকায় মানিকবাবু বেশিদিন ছিলেন না। অমন বাঁধাধরা কাজে বাঁধা পড়ার মেজাজও তাঁর ছিল না নিশ্চয়। এবং বলা বাহুল্য, 'নবারুণ'ও বেশিদিন ছিল না।

তখন আমাদের বয়স অল্প, ঐ সময়ে একটা পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস বেরিয়ে গেছে, এ'তে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় একটু যেন নজর দিলেন আমার উপর। (বর্তমান কালে অবশ্য অনেক উপন্যাসই আরো অল্প বয়সে অনেকেই লিখে ফেলছেন, কিন্তু আমাদের সময়ে এতটা অগ্রগতি হয় নি বলেই বিষয়টা কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা গেল মাত্র)।

একদিন ধূর্জটিবাবু একটা প্রস্তাব দিলেন। 'নাচঘর' পত্রিকার সম্পাদক হওয়ার প্রস্তাব। হেমেন্দ্রকুমার রায় এতদিন সম্পাদক ছিলেন, তিনি আর থাকছেন না, এখন ঐ জায়গায় একজন সম্পাদক দরকার, তাই এই প্রস্তাব।

আমি মফস্বল শহরের লোক, কলকাতা তখন ভালো-মত চিনি নে, সেই কলকাতা শহরের একটা পত্রিকার সম্পাদক হতে হবে শুনে ভীত হয়েছিলাম। মনের ভাব বুঝে ধূর্জটিবাবু আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, "ভয় নেই। আমরা পিছনে থাকব।"

ধর্মতলা স্ট্রীটের এক বাড়ীতে মস্ত একটা টেবিলের ওপারে গিয়ে বসেছিল এই ক্ষুদে সম্পাদক। বলে রাখা দরকার যে, কাজটির ভার নেবার পর কাউকেই আর পিছনে রাখি নি, সবাইকে সামনে নিয়ে নিয়েছিলাম। এবং তাঁরা সহৃদয়তার সঙ্গে এ ব্যবস্থা স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

'নাচঘর' পত্রিকার পূজা-সংখ্যার কাজ কিছুদিনের মধ্যেই আরম্ভ হল। কার কার লেখা সংগ্রহ করতে হবে তা চিন্তা করতে আরম্ভ করা মাত্র প্রথম যাঁর কথা মনে হয়েছিল, তিনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

মানিকবাবু তখন থাকতেন টালিগঞ্জে। চিঠি লিখে অনুরোধ জানানো নয়, একদিন সকালবেলা সশরীরে উপস্থিত হয়েছিলাম তাঁর গৃহে। ঘরে বসেছিলেন তিনি, বলা বাহুল্য ঘরোয়া ভাবেই। লেখা দিতে তিনি স্বীকৃত হলেন, এবং পরিষ্কারভাবেই জানতে চাইলেন কত টাকা দেওয়া হবে। আজকাল আমরা লৌকিক ভাষা ব্যবহার না করে অ-লৌকিক ভাষায় যাকে বলি 'সম্মান-দক্ষিণা', তিনি সেই কপটতার পথে না গিয়ে সরাসরি সোজা ও সহজ বাংলায় জানতে চেয়েছিলেন—"কত দেবেন ?"

একটা অঙ্ক বলেছিলাম, তিনি তাতেই রাজি হয়েছিলেন।

সে সময়ে তিনি একজন সেরা লেখক। তিনি 'অতসী মামী'র লেখক, তিনি সেই গল্পটির লেখক যে গল্পটির নাম 'নেকী'।—যা পড়ে মোহিত হয়েছিলাম। তিনি কত সহজে কত সামান্যে কতটা খুশি হয়েছিলেন—তা স্মরণযোগ্য। অন্য-সব লেখার কথা এখন থাক্।

এর পরে ক্রমশ মানিকবাবুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ই হয়েছিল, পুরো না হলেও তাঁর আধা-অন্তরঙ্গ হয়েছিলাম বলে দাবি করতে হয়তো পারি।

তাঁর 'নেকী' গল্পের মেয়েটি যেমন একেবারেই ন্যাকা নয়, মানিক-বাবুর মধ্যেও তেমনি কখনো সাহিত্যিক ন্যাকামি দেখি নি।

চোখে পুরু কাঁচের চশমা পরে তিনি অনেক সময় রাস্তার মাঝখান দিয়ে হাঁটতেন। ফুটপাত ধরে নিরাপদ হণ্টনে তিনি বোধ-হয় বিশ্বাসী ছিলেন না, তাই তাঁর মতি ছিল জনারণ্য ও যানারণ্য ভেদ করে চলায়। এভাবে পথ চলতে তাকে অনেকবার দেখেছি। একটা বলিষ্ঠ বিক্রম নিয়ে ঐ যে চলেছেন একটি ব্যক্তি—এ ছবি এখনো চোখে ভাসে, এবং ঐটেকেই হয়তো বলা চলে তাঁর ব্যক্তিত্ব।

একদিন দুপুরে এক পানাগারে ঢুকে দেখি তিনি একটি নিরিবিলি কোণে বসে আছেন। হাতে কলম, টেবিলে কাগজ।

দূর থেকে কিছুক্ষণ তাকে দেখলাম, একই ভাবে বসে আছেন।

ধীরে ধীরে তাঁর টেবিলে গিয়ে বসলাম, জিজ্ঞাসা করলাম, "কি লিখছেন ?"

বললেন, "একটা গল্প।"

"কেমন হবে মনে হচ্ছে ?"

"আরম্ভটা খুব ভালো হয়েছে। উৎরে যাবে মনে হচ্ছে।"

"লিখুন।" বলে সরে এসেছিলাম তাঁর টেবিল থেকে।

তখন তাঁর শরীর ভেঙেছে। সেই বলিষ্ঠতা আর নেই। কিন্তু কলম তখনও তেজি। তিনি গদ্যই লিখতেন বটে, কিন্তু সে গদ্য নিছক গদ্যই ছিল না, কাব্যের প্রতিধ্বনিও বেজে উঠত সেই গদ্যে—তাই তা ছিল এমন হৃদয়গ্রাহী।

কিন্তু তাঁর কাছ থেকে যতটা পাবার আশা ছিল, সে আশা তিনি পূরণ করে যেতে পারলেন না। কি রকম যেন গোলমাল হয়ে গেল সব। জীবনকে তিনি বেশ ভালোভাবেই আরম্ভ করেছিলেন, সবই সুন্দর ছিল, সবই ঠিক ছিল, কিন্তু তাঁর কথা উদ্ধার করেই বলা যায় সব যেন 'সমগ্রভাবে তেমন ফুটিয়া' উঠিল না!

অকালেই লোকান্তরিত হলেন তিনি।

গৌরীশংকর ভট্টাচার্য

শ্যামা, সর্বজয়া ও আমার মা

সৃষ্টিধর্মী কোনও সাহিত্যকর্মীর পক্ষে বোধকরি নিরপেক্ষ সমালোচক হওয়া সম্ভবপর নয়। তিনি যখনই কোনও উপন্যাসের গুণ-দোষ বিচারের মাপকাঠি হাতে করেন তখনই নিজের অগোচরে স্বকীয় পছন্দ-অপছন্দের প্রভাব তাঁর বিচারবুদ্ধির পরিচালক হয়ে বসে। অবশ্য প্রত্যেক মানুষেরই কিছু না কিছু পক্ষপাত থাকে—সেকথা হচ্ছে না, সৃষ্টিধর্মী শিল্পীতে এই বিশেষ ধর্মটি অতিমাত্রায় থাকে, সেই কারণেই উল্লেখযোগ্য। তাই উপন্যাস বা গল্পের সমালোচক হিসাবে তাঁদের রায় অনেক ক্ষেত্রেই ধোপে টেকে না।

আজ থেকে অন্ততঃ আটাশ বছর আগে একখানি উপন্যাস পড়ে আমার এত ভালো লেগেছিল যে, এতকাল পরেও চোখ বুজলে সেই ভালোলাগার স্বাদের স্মৃতি আমি স্বচ্ছভাবে অনুভব করতে পারি। সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের একটি রমণীর আশা-স্বপ্ন দুঃখসুখের অন্তরঙ্গ ছবিতে ছবিতে পূর্ণ সেই বইখানি, আমার প্রথম যৌবনে, কল্পনার বেড়া ভেঙে সত্যের মতো বাস্তব রূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। তারপর যখনই কোনো বই পড়ে অভিভূত হয়েছি তখনই ইচ্ছে হয়েছে আবার যদি হাতে পাই তো মানিকবাবুর 'জননী' পড়ি। তেমন সুযোগ মেলে নি। ওই লেখকের আরও নামকরা সব বই পড়া হয়ে গেল, তাঁর শক্তি সম্পর্কে ধারণা আরও সুদৃঢ় হ'ল, কিন্তু জননীর প্রতি আমার প্রত্যয় একটুও বদল করা গেল না। নিজের এই একানুগত্য ভালো লাগে নি। বার বার নিজেকে প্রশ্ন করেছি—'কাঁচা বয়েসের ভালো লাগা তো অপরিণত মনের একটা স্বপ্নালুতা হতে পারে; তার ওপর নির্ভর করা কি ঠিক? ঠিক নয়, হয়ত ভুল—কিন্তু জীবন-প্রবাহের মধ্যে

এরকম কতো অমীমাংসিত প্রশ্নই থাকে, তবু বয়স বেড়ে যেতে কোনো বাধা হয় না। ধামাচাপা দেবার ইচ্ছে না থাকলেও এরকম বিস্তর কিছু চাপা পড়ে। আমার ক্ষেত্রেই বা ব্যতিক্রম হবে কেন! কিন্তু হ'ল! মানিকবাবুর মৃত্যুর পর। যুগান্তর চক্রবর্তী এবং দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৌলতে 'জননী'র নূতন সংস্করণ প্রকাশের সুযোগ জুটে গেল। সমস্যা হ'ল বই সংগ্রহ নিয়ে। অবিশ্যি সেটা অলঙ্ঘ্য বাধা নয়। এইবার 'জননী' দ্বিতীয়বার পড়ার সুযোগ পেয়ে গেলাম। অনেক কাল পরে, পিছনে ফেলে আসা জীবনের কত ছোট বড় ঘটনার ছবিই যে এই দ্বিতীয় পাঠের সঙ্গী হয়েছে তা ভাবলে অবাক লাগে।

আগেই বলেছি আমার এই লেখায় যাঁরা সমালোচকের নির্ভীক, নিরপেক্ষ সাহিত্যবিচারের অভ্রান্ত নিরীক্ষা খুঁজবেন তাঁরা হয়ত হতাশ হবেন। তাঁদের জন্য বিদগ্ধ সমালোচকদের মানদণ্ড রয়েছে। অবশ্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো অনন্যসাধারণ সাহিত্যরথীর ওপর তেমন কোনও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ আমার চোখে পড়ে নি। নিতাই বসুকে এই কারণেই ধন্যবাদ দিতে হয় যে, তিনি অন্ততঃ চেষ্টা করেছেন। তাঁর প্রতিপাদন কতোখানি সার্থক হয়েছে সেটা আলাদা কথা। সমালোচকদের ছাড়পত্রের তোয়াক্কা না রেখেই মানিকবাবুর রচনা পাঠক-সমাজের দরবারে অভিনন্দিত। এবং কালের ব্যবধান তাঁর জনপ্রিয়তাকে ম্লান করতে পারেনি, পরন্তু তাঁকে অধিকতর সমাদৃতই হ'তে দেখা যাচ্ছে—সময়ের কষ্টিপাথরেই তাঁর প্রতিভা সুনির্দিষ্ট হচ্ছে।

যাক, ওসব বড় কথা বাদ দিয়ে আমি প্রাতিস্বিক অনুভবের কিছু ঘরোয়া কথায় ফিরি।

দ্বিতীয় বার 'জননী' পড়তে পড়তে আমার নিজের মায়ের কথা যে কতোবার অন্যমনস্ক করে তুলেছে তার ঠিক নেই। এ ছাড়া আরও এক গরীব ঘরের ঘরণীর ছবি মাঝে মাঝে উঁকি দিয়েছে—সে হ'ল অপুর মা সর্বজয়ার ছবি।

শ্যামা, সর্বজয়া এবং আমার মা তিনজনেই এক পাড়ার বা এক

পরিবেশের বাসিন্দা ছিলেন না। প্রত্যেকেরই আপন-আপন বৈশিষ্ট্য আর পরিবেশেরও পার্থক্য রয়েছে। তবু, কোথায় যেন এই তিনটি চরিত্রই এক গভীর সাদৃশ্যে অভিন্ন-সত্তা হয়ে আমার মনের বাসিন্দা হয়েছে। সংসারের ভালোমন্দ প্রতিটি ব্যাপারের মধ্যে নিজেকে এমন অবিচ্ছিন্নভাবে মিশিয়ে ফেলার ব্যাপারে তিনজনেই সমান— পৃথিবীতে তাঁদের ভাবনার কোনো অংশীদার নেই, যেন কেবল এই মানুষটিকেই সৃষ্টিকর্তা তাবৎ দায়িত্বের বোঝা বইবার ভার অর্পণ করেই পাঠিয়েছেন।

প্রথম জননী হওয়ার অভিজ্ঞতার স্বরূপ কী তার নিখুঁত ছবি শ্যামার চরিত্রে যেমনটি ফুটে উঠেছে তার তুলনা মেলা ভার। "হঠাৎ শ্যামার একটা অদ্ভুত অনুভূতি হইয়াছিল। একটা অদৃশ্য জনতা যেন তাহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। চারিপাশে যেন তাহার অলক্ষ্য উপস্থিতি, অশ্রুত কলরব। সকলেই যেন খুশি। সকলের অনুচ্চারিত আশীর্বাদে ঘর যেন ভরিয়া গিয়াছিল। শ্যামার বুঝিতে বাকী থাকে নাই, এঁরা তার সন্তানেরই পূর্বপুরুষ, ভিড় করিয়া সকলে বংশধরকে দেখিতে আসিয়াছেন। কিন্তু এ কি? বংশধরকে আশীর্বাদ করিয়া তাহার দিকে এমন ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে সকলে চাহিতেছেন কেন? ভয়ে শ্যামার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিয়াছিল। হাতজোড় করিয়া সে ক্ষমা চাহিয়াছিল সকলের কাছে। মিনতি করিয়া বলিয়াছিল, আর কখনও সে মা হয় নাই, সকালে ছেলে যে তাহার গলা শুকাইয়া মরিতে বসিয়াছিল, এ অপরাধ তাঁহারা যেন না নেন, আর কখনো এরকম হইবে না। জননীর সমস্ত কর্তব্য সে তাড়াতাড়ি শিখিয়া ফেলিবে।…" লেখকের হাতে কলম ছিল, শ্যামাকে নিখুঁত শিশুমঙ্গলাভিজ্ঞ জননী তিনি স্বচ্ছন্দেই বানাতে পারতেন—কিন্তু তাতে শ্যামার চরিত্রটি নিখুঁতভাবে ফুটতো না। শ্যামার এই অনভিজ্ঞতা আর সেটা সংশোধনের জন্য আপ্রাণ প্রয়াসই চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলে। এও মনে হয় যে, আমার মায়েরও বোধকরি আঁতুড়ে এই রকমটিই ঘটেছিল।

ছেলের অতি তুচ্ছ হাসিটিও মায়ের কাছে একটা অভাবনীয় কাণ্ড বলে মনে হয়—মনে হয় তুনিয়ায় এমন হাসি বুঝি এই প্রথম ফুটল। প্রথম বার মাত্র বারোদিন পরেই ছেলে মারা যাওয়ার তু'বছর পর যখন সে দ্বিতীয়বার জননী হ'ল তখন দৃঢ় সংকল্প করেছিল—এবার আর বাড়াবাড়ি নয়, সাধারণভাবে যতটুকু করা প্রয়োজন মাত্র ততটুকুই যত্ন করবে ছেলের। কিন্তু মায়ের কাছে এই সাধারণ প্রয়োজনের মধ্যে মাতুলি, তাবিজ, কবচ ইত্যাদি কিছুই বাদ পড়ে নি। তবু শ্যামার মনে একটা আশঙ্কার কাঁটা থেকে যায়, তারই বর্ণনা কয়েকটি ছত্রে আমরা পাই—"আনন্দের একটা সীমা ভগবান মানুষের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, মানুষ তাহা লঙ্ঘন করিলে তিনি রাগ করেন। তবু সব সময় শ্যামা কি আর নিজেকে সামলাইয়া চলিতে পারে ?…"

অনুরূপ আর একটি ছবি পথের পাঁচালীর সর্বজয়ার মধ্যে দেখি ঃ "কখনো কখনো কাজ করিতে করিতে সর্বজয়া কান পাতিয়া শুনিত, খোকার বেড়ার ভিতর দিয়া কোনো শব্দ আসিতেছে না—যেন সব চুপ হইয়া গিয়াছে। তাহার বুক ধড়াস করিয়া উঠিত—শেয়ালে নিয়ে গেল না তো ? সে ছুটিয়া আসিয়া দেখিত খোকা সাজি-উপুড়-করা একরাশ চাঁপা ফুলের মত মাটির উপর বে-কায়দায় ছোট্ট হাতখানি রাখিয়া কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে…।" ভালো লাগার এই বড় দোষ—পদে পদে প্রিয় বস্তুটির চমৎকারিত্ব দেখাবার জন্যে বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেটির বৈশিষ্ট্যগুণ সম্পর্কে সকলের বিশ্বাস উৎপাদনের চেষ্টায় মানুষ উঠে পড়ে লাগে। ভেবেছিলাম এই ভুলটা আমি অন্ততঃ করব না, অথচ লিখতে বসে সেই আতিশয্য ঠেকানো যাচ্ছে না। এর চেয়ে মূল বই তু'খানি পড়ে দেখতে পরামর্শ দিলে হয়ত পাঠকের প্রতি সুবিচার হ'ত। তার জবাবে অনেকে বলবেন—'পড়া আছে !'

যে কারণে শ্যামা আর সর্বজয়ার সঙ্গে আমার দেখা নিজের মায়ের চরিত্রের অভিন্নতাবোধ জেগেছে তার মূল হেতু হ'ল তাঁদের বাঙালীয়ানা। বাঙালী সাধারণ নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরের অল্প শিক্ষিতা

জননীর কাছে তার নিজের সংসারটিই বিশ্বের শেষ সীমা। বিভূতিভূষণ বা মানিক কেউই পথের পাঁচালী বা জননীর বিষয়বস্তু নির্বাচনে ইতিহাস, রাজনীতি অথবা ধনী-জীবনের বর্ণাঢ্যতার আশ্রয় গ্রহণ করেন নি! কাহিনীর স্রোতে নাটকীয় উত্থান-পতনের চমক্‌দারি দিয়ে শিল্পী অসাধারণত্বের সুযোগ নেবার লোভ পরিহার করেছেন। দারিদ্র্যের অনাবৃত শূন্য পৃষ্ঠপটেই তাঁদের শিল্প-সৃষ্টি—উপকরণের বাহুল্যের চাপে সেই কারণেই চরিত্রগুলি হারিয়ে যায় নি। অথচ এই রিক্ততার ছবি যদি তাঁদের চেয়ে ন্যূন-শক্তি কোনো শিল্পী আঁকতে চেষ্টা করতেন তাহলে কাহিনী মনকে এমনভাবে নাড়া দিত না। প্রত্যয়শীল বলিষ্ঠ শিল্পী যেন চিরন্তন মানুষের প্রতি নিবিড় অনুরাগ দিয়ে তাঁদের ভাবলোকের মুক্তি ঘটিয়েছেন—অতি সাধারণ ঘরের আটপৌরে ঘটনা আর মানসিক সংঘাতের ছবি এঁকে এঁকে সাধারণ তাই অসাধারণ হয়ে উঠেছে। তুচ্ছ হয়েছে অবিস্মরণীয়।

শ্যামার কাছে স্বামী শীতল, পুত্র বিধানের চেয়ে পরিণত-বুদ্ধির মানুষ নয়। ক্ষেত্র বিশেষে শীতল আরও কম নির্ভরযোগ্য! বিধানকে ঘিরে স্বপ্ন রচনার যেন অনন্ত অবকাশ আছে, শীতলের কাছে সে ধরনের প্রত্যাশা শ্যামা করতে পারে না—ঘটনা-বিন্যাসে শীতলের দায়িত্বহীনতা শ্যামার সমস্যাকে আরও জটিলতর করেছে। সে বন্ধু-বান্ধবদের কাছে ছোটো হওয়ার ভয়ে দিল্‌দরিয়া হয়ে আমোদ-স্ফূর্তিতে টাকা ওড়ায়, যার ফলে নিজের প্রেস বেচে দিয়ে অন্যের ছাপাখানায় তাকে চাকরী নিতে হয়। আবার প্রেসের মালিকের কাছ থেকে সাতশো টাকা ধার করে ভগ্নিপতির বিপদে সাহায্য করতেও তার বাধে না। সংসারে নতুন অতিথি তো শুধু বিধানই নয়, একটি মেয়ে হয়েছে, বকুল। শীতলের আর কী, সে দুটো টাকা এনে দিয়ে মনে করে ঢের হয়েছে—যেন তার যতখানি করার কথা তার চেয়ে বাড়তিই সে দিয়ে ফেলেছে, সংসারকে? এখানে সংসার মানেই শ্যামা। তার ধারণা শ্যামা তাকে টাকা রোজগারের যন্ত্র ছাড়া বেশী কিছু মনে করে

না। অন্যদিকে শ্যামা সবারই জন্য নিজের সামর্থ্যের শেষ বিন্দুটুকু উজাড় করে দিয়েও ডাইনে-বাঁয়ে কুলোতে পারে না, অর্থাভাব তাকে ভাবিয়ে তোলে। ভালো স্কুলে ছেলেকে ভর্তি ক'রে দেওয়া হয়েছে, তার মাইনে টানতে হয়—ইত্যাদি! তাই যখন শীতল তাকে প্রহার করে তখন শ্যামা দিশেহারা হয়ে পড়ে। এই অবুঝ মানুষটা কি কিছুই দেখতে পায় না? বস্তুতঃ শ্যামার ভূমিকা ষোল আনা জননীত্বের। নইলে একদিন যখন শীতল তার জন্য রঙীন শাড়ী কিনে আনল তখন শ্যামা সহজভাবে তা গ্রহণ করতে পারল কই! পুত্র বিধানকেই তার সবচেয়ে বেশি লজ্জা। রাত্রে যখন ছেলে-মেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল তখন নতুন শাড়ী পরে স্বামীকে ছাদে যাবার আমন্ত্রণ জানাল। এই ছাদই শ্যামার জীবনে অবসরের আকাশ—এখানে দাঁড়িয়ে দিনের বেলায় বসাকদের বাড়ির পাশ দিয়ে রেলের উঁচু বাঁধের ধারে প্রকাণ্ড শিমুল গাছটা থেকে তূলো-ওড়া ছাখে, ধানকলের প্রকাণ্ড পাকা অঙ্গনে ধানকলের কুলি-মেয়েরা ধান মেলে দেয় তা ছাখে, পায়রারা সেই ধান খেতে ঝাঁক বেঁধে নামে তাও ছাখে! এই ছাদেই শীতলের দেওয়া রঙীন শাড়ী পরে শ্যামা তৃতীয় পুত্রের জননীত্বের সম্ভাবনাময়ী হলো। অথচ শ্যামার তেমন কোন অভিলাষ প্রকাশ পায় নি, সে অবহেলিত স্বামীকে খুশি করতে চেয়েছিল মাত্র। শীতলের অবিবেচনা আর খেয়ালিপনাই শ্যামার চরিত্রকে নির্মম পৃথিবীর হৃদয়হীন বাস্তবের সঙ্গে মোকাবিলায় বাধ্য করেছে। শুধু কি শীতল, শ্যামার মামা, যিনি মা-বাপ-মরা শ্যামার বিয়ে দিয়ে বনেদীঘরের বিধবাকে নিয়ে ফেরার হয়েছিলেন, একুশ বছর পরে হঠাৎ হাজির হয়ে সেই মামাও শ্যামার সংসারে আশ্রিতের সংখ্যা তো বাড়ালেনই পরন্তু তাঁর দায়িত্বহীনতাও বেচারী শ্যামার ঘাড়ের বোঝা ভারী করল। শীতল প্রেসের টাকা চুরি ক'রে জেল খাটতে গেল। চুরির টাকা কিছু সে শ্যামাকে দিয়েছিল—চৌর্য প্রমাণের পর মামা সেই টাকা লুকিয়ে রাখার ঝুঁকি নিলেন বটে, তবে তা আর কোনদিনই শ্যামাকে পেতে হয় নি। অসম্পূর্ণ

স্বপ্নের মতই শ্যামার দোতলার ঘরখানি পরিহাস করতে থাকে শ্যামাকে। বনগাঁয়ে স্বামীর ভগ্নিপতি রাখালের বাড়িতে আশ্রয় নেওয়া আর তারই মধ্যে ছেলেকে মানুষ ক'রে তোলার আপ্রাণ চেষ্টায় শ্যামার জননীত্বের মহিমা যেন আরও মহত্ত্বে উত্তীর্ণ হয়।

এরই পাশে যখন যাযাবর কথকঠাকুর হরিহরের স্ত্রী সর্বজয়াকে চরম দারিদ্র্য আর শত্রুভাবাপন্ন প্রতিবেশী পরিবেষ্টিত অবস্থায়, দুটি সন্তানকে দু-মুঠো অন্ন জোগাবার জন্য প্রাণান্তকর পরিশ্রম আর অভাবনীয় কৌশল অবলম্বন ক'রে দিন কাটাতে দেখি, তখন পাঠকের নির্লিপ্ত ভূমিকা ছেড়ে সহানুভূতির কোমল আবেগ নিয়ে তার পাশে না দাঁড়িয়ে পারি না।...'সর্বজয়া উদ্বিগ্ন মনে বাড়ীর মধ্যে ফিরিয়া আসিল। কি করিবে ভাবিতেছে, এমন সময়ে খিড়কীর দরজা ঠেলিয়া খুলিয়া আপাদমস্তক সিক্ত অবস্থায় দুর্গা আগে আগে একটা ঝুনা নারিকেল হাতে ও পিছনে অপু একটা নারিকেলের বাগলো টানিয়া লইয়া ঘরে ঢুকিল। সর্বজয়া তাড়াতাড়ি ছেলে-মেয়ের কাছে গিয়া বলিল— 'ও মা আমার কি হবে। ভিজে যে সব একেবারে পান্তাভাত হইচিস! কোথায় ছিলি বিষ্টির সময়?' ছেলেকে কাছে আনিয়া মাথায় হাত দিয়া বলিল—'ওমা, মাথাটা যে ভিজে একেবারে জুবড়ি। পরে আহ্লাদের সহিত বলিল—'নারকেল কোথা পেলি রে দুর্গা?...' আস্ত একটা নারকেল দেখে সর্বজয়া মুহূর্তের মধ্যে ঝড়-জল-দুর্যোগের সব দুর্ভাবনা ভুলে গেল। আর জ্বালানীর কাজে নারকেলের পাতা, ঝাঁট-দেওয়ার ঝাঁটার খিল—প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলি হাতে পাওয়ার আনন্দই কি কম। কিন্তু তার চেয়েও বড় ছেলে-মেয়ের মঙ্গল— নইলে, বাগানের আসল মালিকের গৃহিণীর শাপ-শাপান্ত শুনে তৎক্ষণাৎ সর্বজয়া মেয়েকে আদেশ দেয় জিনিসগুলি ফেরৎ দেওয়ার জন্য! দারিদ্র্য ঠেকাতে গিয়ে তো আর মা হয়ে সন্তানের অমঙ্গল চাইতে পারে না—জননীর এই হল দ্বিতীয় সঙ্কট। সর্বজয়া যা কখনও পারে নি, শ্যামা কিন্তু বিধানের জন্য তাও করেছে। ছেলে রাত জেগে

পাশের পড়া পড়ে পড়ে রোগা হয়ে যাচ্ছে। মন্দার সংসারে মোটা ভাত আর সাপ্টা তরকারী যা বারোয়ারী ব্যবস্থা বরাদ্দ তাতে ছেলের পুষ্টি হওয়ার কথা নয়। এদিকে 'স্কুলের হেডমাস্টার রাখালকে বলিয়াছেন বিধানের মত ছেলে ক্লাশে ছুটি নাই। শ্যামা আবার আশা করিতে পারে, ধূসর ভবিষ্যতে আবার রঙের ছাপ লাগিতে থাকে। নাইবা রহিল শীতলের নিকট আশা ভরসা, একদিন ছেলে তাহাকে সুখী করিবে।' অতএব এই ছেলের জন্য সন্দেশ চুরি করল, ছেলের জন্য রাঁধতে রাঁধতে দু'খানা মাছ ভাজা চুরি করল, খানিক ঘি যোগাড় ক'রে মুস্কিলে পড়ল।···হারান ডাক্তার শ্যামার বাড়ির ভাড়াটে জোটাতে না পেরে, নিজের পকেট থেকে মাসে মাসে পঁচিশ টাকা মনি-অর্ডার ক'রে নিয়মিত পাঠিয়ে যাচ্ছেন। শঙ্কর যখন বনগাঁয়ে বেড়াতে এল, তখন শ্যামা টের পেল, হারান ডাক্তার গোপনে সাহায্য ক'রে যাচ্ছেন, বাড়িটা তালাবদ্ধ খালিই পড়ে আছে। সব জেনেশুনেও শ্যামা সন্তানদের মুখ চেয়েই অনাত্মীয় পরস্পর হারান ডাক্তারের অযাচিত স্নেহের এই দান নিতে বাধ্য হয়।

সর্বজয়ার ক্ষেত্রে দারিদ্র্যের রূপ আরও ভয়াল আরও করাল। কাশীতে হরিহর যখন অন্তিম জ্বরে শয্যাগত, সংসার একেবারে অচল হয়ে পড়েছে, ঘরে রান্না করার মতো কিছু নেই তখন সর্বজয়া আকাশ পাতাল ভেবে ভেবে দিশেহারা হয়ে ছেলেকে বাধ্য হয়েই বলল ঃ

"সকালে সর্বজয়া একদিন ছেলেকে বলিল—হ্যাঁরে ওই শাদা বাড়িটার পাশে কোন্ ছত্তর জানিস?"

"—উঁহুঁ—"

"—তুই ছত্তরে খাস্‌নি একদিনও এখানে এসে? কাশীতে এলে ছত্তরে খেতে হয় কিন্তু, জানিস্‌নে বুঝি? খেয়ে আসিস না আজ?··· দেখেই আসিস না?"

"—কাশীতে এলে ছত্তরে খেতে হয় কেন ?"

"—খেলে পুণ্যি হয়—আজ দশাশ্বমেধের ঘাটে নেয়ে অম্নি ছত্তর থেকে খেয়ে আসিস—বুঝলি !"

মায়ের বুক ফেটে গিয়েছিল ছেলেকে অন্নছত্রে ভিখারীর পাশে ব'সে খেতে পরামর্শ দিতে। নিজের জন্য ঘরের তুটিখানি প'ড়ে-থাকা অড়হর ডাল ভিজে বরাদ্দ ক'রে, সর্বজয়া অপুকে পাঠায় ছত্তরে !

গণচেতনার ধ্বজাধারী অনেক সমালোচককে অভিযোগ করতে দেখেছি, বিভূতিভূষণ সমাজ-সচেতন ছিলেন না। এগুলো যদি সমাজ-সচেতনতার নমুনা না হয় তাহলে উক্ত বস্তুর অস্তিত্ব কোথায় তা জানি না। অবশ্য তুখড় বক্তৃতা দেওয়ার বিস্তর সুযোগ ছিল যা বিভূতিভূষণ সংযতভাবে এড়িয়ে যাওয়াব ফলেই পথের পাঁচালীর মতো মন-কাড়া উপন্যাস সৃষ্টি হয়েছে। তেমনি জননীর লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'বলার চেয়ে না-বলে বেশি বোঝানোর' প্রকৃষ্ট পন্থাই অনুসরণ করতে দেখা যায়।

টাকা চুরির অপরাধে তু'বছর জেলখাটার পরে শীতল সহরতলির বাড়িতে এসে আট-দশ দিন হলো পড়ে আছে, নকুড়বাবুর পত্রে সেই খবর পেয়ে শ্যামা বন-গাঁ থেকে কোলের ছেলে ফণীকে নিয়ে, রাখালের সঙ্গে পাগলের মতো চলে এল। দায়িত্ববোধহীন শীতল, নিজের প্রতিও চরম উদাসীন। নইলে ক'দিন একা ঘরে জ্বরে পড়ে রয়েছে কাউকে খবরও দেয় নি, বনগাঁয়ে যাওয়া তো দূরে থাক। স্ত্রী-পুত্র কোথায় গেছে তা সে জানে না। জানতেও চায় কী ? জেলে যাবার আগে যে জামাকাপড় পরে ছিল তা-ই পরে আছে।··· 'এসব তো চাহিয়া দেখা যায়, তাকানো যায় না শীতলের মুখের দিকে। চোখ উঠিয়া, মুখ ফুলিয়া বীভৎস দেখাইতেছে তাহাকে, হাড় ক'খানা ছাড়া শরীরে বোধহয় কিছু নাই।

'শীতল দাঁড়াইয়া থাকে ; দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে কাঁপে। তারপর সহসা শ্যামার কি হয় কে জানে, ফণীকে জোর করিয়া নামাইয়া

দিয়া জননীর মতো ব্যাকুল আবেগে শীতলকে জড়াইয়া ধরিয়া টানিয়া আনে, শিশুর মতো আল্‌গোছে মাতুরে শোয়াইয়া দেয়…।'

বাড়ি বেচে, জলের মতো টাকা খরচ ক'রে চিকিৎসা আর নিরন্তর সেবা দিয়ে শ্যামা শীতলকে বাঁচিয়ে তুলল। একদা শ্যামা এই বাড়ি বিক্রীর প্রস্তাবেই না মামাকে ঝেড়ে জবাব দিয়েছিল—'শীতল যদি ফাঁসিও যায় বাড়ি শ্যামা বিক্রয় করিতে দিবে না।… যে শীতল শ্যামার অকৃত্রিম মমতা আর অবিশ্রান্ত মেহনতের কোনো মূল্যই দেয় নাই। আর সম্মান? চোরের বৌ-এর সম্মান! চোরের বৌ? জীবনে এ ছাপ তাহার ঘুচিবে না, স্বামীর অপরাধে মানুষ তাহাকে অপরাধী করিয়াছে, কেহ বিশ্বাস করিবে না, কেহ সাহায্য দিবে না, সকলেই তাহাকে পরিহার করিয়া চলিবে।…বিধবা হইলেও সে বোধ হয় এতদূর নিরুপায় হইত না।' যে শীতলের বেঁচে থাকা একদা শ্যামার কাছে নিতান্ত বিড়ম্বনা মনে হয়েছিল, সেই শীতলকে সুস্থ করার জন্যে শ্যামা সেই বাড়ি বিক্রি করল যে-বাড়ি শীতলের ফাঁসি হলেও বিক্রী না করার সংকল্প ছিল শ্যামার! কেন করল? শীতল যে মরণাপন্ন! শীতল এখন শ্যামার প্রতিপক্ষ নয়, স্বামী নয়, সে বয়োবৃদ্ধ, অশক্ত সন্তানের মতো অসহায়। আর শ্যামা যে জননী—বাঙালী ঘরের সেই চিরন্তন মাতৃত্বের প্রতিমূর্তি হলো শ্যামা। এই মাতৃত্ব আলোর মতো—সর্বত্রগামিনী। যে ননদিনী মন্দাকিনীকে শ্যামা সহ্য করতে পারে না, যে নন্দাই রাখালকে জুয়াচোর আর বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ হৃদয়হীন বলে শ্যামার ধারণা—তাদের পুত্র কালু যখন জ্বর বিকারে মরল তখন শ্যামাই শোকে কাতর হয়ে পড়ল সব চেয়ে বেশি। কালুর কাছে শ্যামা আশ্রিতা মামী হিসাবে অপমান ছাড়া কিছু পায় নি।…'মামী বলিয়া কোনো দিন খাতির না করুক, আশ্রিতা বলিয়া মাঝে মাঝে অপমানজনক ব্যবহার করুক, যত্ন করিয়া ওকে তো দু'বেলা শ্যামা ভাত বাড়িয়া দিয়াছে।…পরে, মন্দার শোকও যখন শান্ত হইয়া আসিয়াছে, তখনও শ্যামা যেন অশান্ত

হইয়া রহিল মনে মনে। রহস্যময় মনোবেদনা নয়, সাময়িক মনো-বিকার নয়, একটা দিনও যে হাসিয়া কথা বলে নাই সেই কালুর জন্য স্পষ্ট দুরন্ত জ্বালা!···শ্যামার মমতায় কালুর বৌ বড় একটা আশ্রয় পাইল। শ্যামার প্রশস্ত বুকে মাথা রাখিয়া সজল চোখে সে ঘুমায়, জাগিয়া ওঠে শ্যামারই বুকে, সারারাত ঠায় একভাবে কাটাইয়া শ্যামার পিঠের মাংসপেশী খিঁচিয়া ধরিয়াছে, তবু সে নড়ে নাই, কর্ণ যেভাবে বজ্রকীটের কামড় সহিয়াছিল তেমনিভাবে দেহের যাতনা সহিয়াছে—নড়িতে গেলে ঘুম ভাঙিয়া বৌ যদি আবার কাঁদিয়া ওঠে?'

মাতৃত্বের এই মহিমা আধুনিক আর কোন উপন্যাসে কি দেখা গেছে? শ্যামার জীবন আগাগোড়া এই একটি সাধারণ ধর্মের বিকাশের জন্যই অমরতার দাবি করতে পারে। শ্যামার মেয়ে বকুল যখন মা হলো তখনও শ্যামার এই রূপটিরই বিচিত্রতর প্রকাশ দেখি। আর শ্যামা যখন শেষবার একটি অন্ধ মেয়ে প্রসব করল তখনও তার মনের প্রশস্ততা কিছু কম দেখি না। বিধানের যে স্ত্রীকে শ্যামা সহ্য করতে পারত না—যার ফুটন্ত যৌবনের দুরন্ত কামাকর্ষী শক্তিকে শ্যামা ভয় করত, পাছে বৌ বিধানকে পর ক'রে নেয়। সেই বৌ যখন শাশুড়ীর কোপের কাছে কান্নায় ভেঙে পড়ত তখন কিন্তু শ্যামা স্থির থাকতে পারত না। কোথায় ভেসে যেত শত্রুতার বিদ্বেষ: 'শ্যামা হঠাৎ সুর বদলাইয়া সস্নেহে হাসিয়া বলে,—আ আবাগীর বেটী, এই কথাতেও চোখে জল এল! কি আর বলেছি মা তোকে?'

'চোখ! অশ্রুসজল চোখকে শ্যামা বড় ডরায়। মানুষের চোখ সম্বন্ধে সে বড় সচেতন। চোখ ছিল তার বকুলের আর চোখ হইয়াছে বকুলের মেয়েটার! শ্যামার মেয়েটি অন্ধ, এত যে আলো জগতে, তার একটি রেখাও খুকীর চেতনায় পৌঁছায় না। সজল চোখে চাহিয়া যে-কোনো দৃষ্টিমতী শ্যামাকে সম্মোহন করিতে পারে।'

সমগ্র উপন্যাসখানায় কি আর কোনও ছবি নেই, অন্য কোনও

চরিত্র কি লেখকের এই একদেশদর্শিতার দরুণ তেমন নির্ভরযোগ্য-রূপে বাস্তবানুগ হয় নি? না কি ঘটনার তেমন কোনও বৈচিত্র্যগুণ জননী উপন্যাসের আকর্ষণগুণে চিত্তকে বিনোদিত করে না? বস্তুতঃ প্রথম শ্রেণীর মহৎ উপন্যাস হ'তে গেলে যা যা থাকা প্রয়োজন এতে বোধ করি তার ষোল আনাই বিদ্যমান। শীতল, মামা, রাখাল, মন্দাকিনী, বিষ্ণুপ্রিয়া, বিধান, বকুল, শঙ্কর এবং সর্বোপরি কাঠখোট্টা হারান ডাক্তার কেউই কারুর চেয়ে কোনো অংশে খাটো নয়। ছোট্ট পার্শ্ব-চরিত্র হিসেবে শামু, বিভা, বনবিহারী, সুবর্ণ, মোহিনী প্রত্যেকেই পাঠকের মন থেকে মুছে যাবার মত নয়। এমন কি বৃদ্ধ অকর্মণ্য শীতলের ভক্ত কুকুরটি পর্যন্ত ছাপ রেখে যায়। শীতল যেমন চেয়েছিল যে, কলকাতায় যদি কুকুরটাকে সঙ্গে নিয়ে যেত তাহলে বড় ভাল হতো, বোধকরি পাঠকেরও তাতে পূর্ণ সমর্থন থাকা স্বাভাবিক। সামগ্রিকতার দিক থেকে বিচার করতে বসলেও জননীকে অস্বীকার করার প্রশ্ন ওঠে না।

তবে কেন আমি আর সব বাদ দিয়ে শ্যামাকে এমন প্রাধান্য দিয়ে বসলাম? লেখক কোথাও শ্যামাকে অসাধারণ ক'রে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন নি, আপন দাবির জোরেই যে শ্যামা প্রধান হয়ে উঠেছে, স্বীয় অসাধারণত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে প্রশস্ত বুকের আর অক্লান্ত বাহুর জোরে তেমনি অনায়াসেই সে আমারও মনকে অধিকার করেছে—আমার তো মনে হয় এতে প্রাধান্য দেওয়াটা প্রশ্নাতীত।

যেমন শ্যামা তেমনি সর্বজয়া ভাগ্য আর দারিদ্র্যের সঙ্গে আশ্চর্য অনমনীয় সংকল্পের জোরে সংগ্রাম ক'রে আপন সংসারকে ধ্বংস আর বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে—এই বিস্ময়কর চরিত্রবল, এই অদম্য মানবপ্রেমই তাদের বাংলা সাহিত্যের আসরে গৌরবের আসন পেতে দেবে সাদরে। দু-পাতা পড়লেই যে শিক্ষিতা হওয়া যায় না, আর দারিদ্র্যের পাঠশালায়ই মানুষের সত্যকার শিক্ষালাভ ঘটে—তার প্রমাণ জননীতে, তার প্রমাণ পথের পাঁচালীতেই আমরা পাই।

মুখে বড় বড় বুলি না আউড়ে, মুখ বুজে যে সংগ্রাম প্রতিটি গৃহস্থ ঘরের জায়া ও জননীকে লোকচক্ষুর অগোচরে করতে হয় তার খবর একমাত্র দরদী শিল্পীর সহানুভূতি আর গভীর অন্তর্দৃষ্টি ছাড়া কে রাখে ! বিশ্ববিখ্যাত কোন সমালোচক একদা শেক্সপীয়রের অসাধারণত্ব প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন, 'Where Schiller burns a city, Shakespeare just drops a handkerchief'. এই সংযমই শিল্পসৌকর্যের পরম গুণ। আর সেই গুণ 'জননী' উপন্যাসের প্রথম থেকে শেষ ছত্রে হাল্কা, অগোচর একটা ওড়নার মতো পরিব্যাপ্ত! এখানে রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যের মাকে চিৎকার করে কাঁদতে হয়' তত্ত্বটির অসার্থকতা আশ্চর্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

সর্বজয়া আর শ্যামার সঙ্গে পরিচয় না ঘটলে হয়ত কোনো কালেই আমি নিজের মায়ের অসাধারণ মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারতাম না। এই দুই জননী-চরিত্রের প্রদীপ-শিখাই আমার মাকে চিনিয়ে দিয়েছে। ছোটবেলায় দেখেছি গভীর রাতে ঘুম ভেঙে, পাশে আমার মা নেই। কোথায়, কোথায় মা ? চোখ রগড়ে দেখি, কেরোসিনের লম্ফ জ্বেলে তিনি সেলাই করছেন। খুব চটে গিয়ে বিরক্ত হয়ে বলেছি—'বা-রে, একা একা আমার ভয় করে না ? তুমি শোবে এস।' একটু হেসে, কখনো বা ধমক দিয়ে বলেছেন, 'হাতের এইটুকু শেষ ক'রে শুচ্ছি। ভয় কি, এই তো আমি আছি' ; তখন কি সেই অবুঝ মন জানতো যে, আমাদের ছেঁড়া সংসারে জোড়া-তালি দেবার জন্যেই মা আমার 'মিশন হোমের' ফরমায়েসী ডয়েলী, বীব, বেডকভার কিংবা খঞ্চিপোশ, টেবিলপোশ বুনছেন। বাবার পাঠানো মাসিক পঁচিশ টাকায় আমাদের এতবড় সংসার চলে না বলেই সারাদিন রান্না-বাড়া আঁষ-নিরামিষের হ্যাপা সামলানো আর গোয়ালঘরের কাজ পরিপাটি ক'রে চুকোবার পরও তাই মাকে রাত-জেগে সেলাই করতে হয়। আবার এই মা যখন অমুকের-তমুকের বাড়ির আঁতুড় তুলতে চলে যেতেন, ঘর-গেরস্থালীর কাজ ফেলে রেখে তখন কি জানতাম যে, তারা গরীব আর ও তল্লাটে

দাই বলতে হরির মা অদ্বিতীয়া এবং কোনো ধনীর ঘরের কোনো বউকে খালাস করতে সে ব্যস্ত অতএব আমার মায়ের যে না গিয়ে উপায় ছিল না।

এই সুযোগে আত্মজীবনী ফেঁদে বসা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি শুধু এইটুকু বলেই থামব যে, শিল্পীর কল্পনাসৃষ্ট চরিত্রের সঙ্গে বাস্তবের এই যে সামান্যীকরণ এখানেই শিল্পের অসামান্যতা।

সতীন্দ্রনাথ মৈত্র

কবি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের প্রথম যৌবনে এক অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণে টানতেন। তাঁর গল্পের ঋজু বলিষ্ঠতা, গদ্যের পেশল সৌন্দর্য আমাদের অভিভূত করতো। সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ ছিলেন মানিক-বাবু নিজে। সাধারণ সাজসজ্জা, কিছুটা অগোছালো—কিন্তু সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল তাঁর চোখ ছুটি। কালো ফ্রেমের চশমার পুরু কাঁচের নিচে অদ্ভুত উজ্জ্বলতায় জ্বলত। মাঝে মাঝে মনে হতো নির্মম নিষ্ঠুর ঐ ছুটি চোখের ছাউনী কখনো একান্ত উদাস। মনে হতো, খুব কাছে বসেও কোন দূর অরণ্যে তাঁর মন হারিয়ে গিয়েছে।

পরে মানিকবাবুর কিছুটা কাছাকাছি আসবার-সুযোগ হয়েছিল কার্য পরম্পরায়। খুব কাছে এসেও তাঁকে দূর থেকে যেমনটা মনে হতো ঠিক তেমনি মনে হয়েছে। সাজিয়ে গুছিয়ে কথা তিনি বলতেন না, ঠিক যেমনটা মনে হতো তেমনি বলে ফেলতেন—অনভ্যস্ত কানে অনেক সময়ই যা বাধ-বাধ ঠেকত। কিন্তু দেখেছি সাহিত্য সভায় কিছু বলতে গিয়ে, ঠিক ঐভাবেই মানিকবাবু বলে যেতেন,—খুবই সহজ সরলভাবে, এত সরল যা আমাদের কাছে একঘেঁয়ে বলে মনে হয়েছে। কেন না আমরা সে সময় কথার ফুলঝুরি ফোটাতে শিখেছি—বর্ণাঢ্য না হলে আমাদের মন উঠত না।

অথচ এই মানুষটিরই অন্যরূপ দেখেছি তাঁর সাহিত্যে।

যুগের জিজ্ঞাসায় ক্ষুব্ধ অসহিষ্ণু শিল্পী মনুষ্যহৃদয়ের প্রত্যন্ত প্রদেশ পর্যন্ত অনুসন্ধান চালিয়েছেন এ যন্ত্রণার উৎসমুখ আবিষ্কারের জন্য। সেখানে কোন অন্যমনস্কতা নেই, অসতর্কতা নেই—ভয়ঙ্কর সম্ভাবনার মধ্যেও তিনি অবিচলিত—কলম তাঁর কাঁপেনি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই চেহারাই আমাদের মনে স্পষ্ট হয়ে আঁকা।

লেখার ব্যাপারে মানিকবাবু চিরদিনই 'সিরিয়স'। এ ব্যাপারে কোনদিনই তিনি কারুর সাথে আপোষ করেন নি। কিন্তু এই লেখা নিয়েই, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরেক দিক প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ আমার হয়েছিল। হ্যাঁ, আমি তাঁর কবিতাগুলির কথাই বলছি। নানা উপলক্ষে, নানা পত্রিকায় অনেক কয়টি কবিতা তিনি লিখেছিলেন। এই রচনাগুলির গুণাগুণ নিয়ে কেউ কোন আলোচনা সম্ভবতঃ করেন নি; করলেও তা আমার চোখ এড়িয়ে গিয়েছে। দুর্বার শিল্পীর এই খেয়াল-খুশীর রচনাগুলি অনেকেই হয়ত খানিকটা সন্দেহ-প্রশ্রয়-এর দৃষ্টিতে দেখেছেন, কিন্তু এই অসতর্ক রচনাগুলির মধ্যেই মানিকবাবু নিরাবরণভাবে নিজেকে তুলে ধরেছেন একথা কিন্তু আমার অনেকবারই মনে হয়েছে। পত্রিকার পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অল্প কয়েক লাইনের ছোট ছোট রচনাগুলি পড়ে, হাসি পেলেও মানিকবাবুর চেহারা, তাঁর কথাবার্তা, তাঁর আলাপচারী—সর্বোপরি তাঁর সহজ অথচ সরল মানবিকতা মুহূর্তে মনের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতো। একথা তাই না ভেবে পারি নি, হয়ত ক্ষণিক বিশ্রামের জন্য, এ কবিতাগুলি মানিকবাবু না লিখে পারেন নি।

॥ দুই ॥

মনে পড়ছে, মানিকবাবুব কাছে লেখা চাইতে গেলে, তিনি প্রথমেই নাছোড়বান্দা গল্প-প্রার্থীকে কবিতা দিতে চাইতেন। তাঁর যে কবিতা ক'টি প্রকাশিত হয়েছে, মনে হয় সবই সেই ব্যস্ত লেখকের অনুরোধ এড়াতে না পেরে কিছু একটা রচনা দেওয়ার দায় মেটানো! রচনা-গুলি পড়লেই স্বতঃই একথা মনে হবে। কিন্তু শুধুই কি তাই, শুধুই কি দায় এড়ানো? কবিতা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তো আগেই

লিখেছেন, 'দিবারাত্রির কাব্যের' মুখবন্ধে। আর এ কবিতা, নিতান্ত বিশুদ্ধ অর্থে কবিতা।

প্রাতে বন্ধু এসেছে পথিক
পিঙ্গল সাহারা হতে করিয়া চয়ন
শুষ্ক জীর্ণ তৃণ একগাছি
ক্ষতবুক-তৃষ্ণার প্রতীক
রাতের কাজললোভী কাতর নয়ন
ওষ্ঠপুটে মৃত মৌমাছি।

কবিতার সারা শরীরে স্বকীয়তার ছাপ না থাকলেও, সেদিন সত্যিই মুগ্ধ হয়েছি অবিস্মরণী উপমায় 'ওষ্ঠপুটে মৃত মৌমাছি'। দিবা-রাত্রির কাব্য গ্রন্থের 'ভূমিকা' কবিতাগুলি ছাড়া, আর বোধহয় সচেতন কাব্যচর্চা মানিকবাবু করেন নি। তাঁর পরের কবিতাগুলিই এর প্রমাণ। ব্যস্ত জীবনের নানা ঘটনা তাঁকে আহত করেছে, তিনি ভেবেছেন তা নিয়ে, আর তাই আলাপচারীর মতো নিজেকে নিজে শুনিয়েছেন। কোন প্রসাধন নেই, কোন সযত্ন প্রয়াস নেই সেই ভাবনাগুলি কবিতায় উত্তীর্ণ করে দেবার। প্রসঙ্গতঃ সুকান্ত ভট্টাচার্যের মৃত্যুর পরে লেখা কবিতাটির কথা মনে পড়ে। এমনি আরো কিছু রচনা আছে, যেগুলি উল্লেখ করতে পারা যায়, কিন্তু যা অবান্তর।

তবু কিন্তু প্রশ্ন থাকে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কি তাঁর রচনাগুলি সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন। যিনি সাহিত্যে শিল্পে 'প্রকৃত শিল্পী' হবার দুর্মর বাসনায় সহজ ছক-বাঁধা জীবনের বাঁধা সড়ককে অগ্রাহ্য করে বামাচারী হয়েছিলেন, নিজের জীবনকে নিয়ে ভয়ংকর সর্বনাশা খেলায় মেতেছিলেন, তিনি তাঁর রচনার গুণাগুণ পরিমাপ করতে পারেন নি, একথা ভাবা শক্ত। তবু যদি ধরেই নেওয়া যায় যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর মতো শিল্পী তাঁর এ জাতীয় রচনা সম্পর্কে বিশেষ প্রশ্রয়ের মনোভাব পোষণ করতেন, তাহলে খুঁজে দেখা দরকার এ মানসিকতার উৎস কোথায়?

প্রশ্নটা মাঝে মাঝেই আমাকে হানা দিয়েছে। এ বিষয়ে চিন্তাও করেছি, কিন্তু কোন উত্তর খুঁজে পাই নি। যোগ্যতর কেউ মানিকবাবুর কবিতাগুলি নিয়ে আলোচনা করেন নি, হয়ত এগুলিতে মানিক-প্রতিভার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নেই বলে কেউ এগুলিকে যথেষ্ট মর্যাদাও দেন নি। গল্প ও উপন্যাসই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্র, তাই সেগুলি নিয়েই সাহিত্যে বাদানুবাদ হয়েছে। এই গল্প ও উপন্যাসের পাশাপাশি আরেকটি ধারা যে আপন খেয়াল-খুশীতে প্রবাহিত ছিল, হয়ত জটিলতর শিল্পীমানসের দুর্গম অরণ্যে প্রবেশ করে তার আবিষ্কার চেষ্টার পণ্ডশ্রম কেউ করেন নিঃ কিন্তু এ রচনাগুলি তো সত্য। আর মানিকবাবুকে চিনতে হলে, এগুলিকে বাদ দেওয়া যাবে না। যেমন বাদ দেওয়া যাবে না অবন ঠাকুরের কাটুম কুটুম কিংবা রবীন্দ্রনাথের হোমিওপ্যাথি।

আসল কথা সব শিল্পীমানসেই দ্বৈত প্রবণতা বোধ হয় অবিচ্ছেদ্য-ভাবে জট পাকিয়ে থাকে যার একদিকে সুশৃঙ্খল পদচারণা, আরেকদিক অসংলগ্নতার। কেউ কেউ এই অসংলগ্নতার মধ্যেও সামঞ্জস্য আনেন তখন বোঝা দায় হয়ে ওঠে কোন্‌টা তার প্রকৃত মানসিকতা। প্রেমেন্দ্র মিত্র কবি না গল্প লেখক? উদাহরণ অনেক তোলা যায়। কিন্তু যেখানে এটা স্পষ্টতঃ দ্বিধা বিভক্ত, সেখানে লেখকের প্রকৃত প্রবণতা খুঁজে নিতে অসুবিধা হয় না। মানিকবাবুর ক্ষেত্রেও হয় নি। যে গভীর অন্বিষ্ট নিয়ে জীবনের জটিলতায় তিনি প্রবেশ করেছিলেন সে অন্বিষ্টার কণামাত্র তাঁর কবিতায় ধরা পড়ে নি, কিংবা স্পর্শ করা যায় না সেই যন্ত্রণা, যা তাঁকে প্রতিদিন দগ্ধ করেছে। বরং এগুলি এমন এক প্রশান্ত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেহারা আমাদের সামনে ফুটিয়ে তোলে, যা আমাদের অচেনা।

॥ তিন ॥

সাহিত্যশিল্পের দুটি ধারায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুটি ভিন্ন রূপের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমার বারবারই মনে হয়েছে মানিকবাবুর নিজের মধ্যেই কোথাও একটা দ্বিধা ছিল। এই দ্বিধাই তাঁকে পূর্ণ সিদ্ধির পথে নিয়ে যেতে পারে নি, বা জীবনের উত্তরার্ধে তাঁর যে বিয়োগান্তক পরিণাম আমরা প্রত্যক্ষ করি তারও মূলে তাঁর সাহিত্যিক চরিত্রের এই সংকট। প্রশ্নটিকে এত সহজভাবে তোলা হয়ত অন্যায়, এ বিষয়ে বিস্তৃত ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই আছে। কিন্তু বর্তমানে উপযুক্ত উপকরণের অভাবে এবিষয়ে নিরস্ত থাকতে হচ্ছে। কিন্তু একটি সত্য তো স্পষ্ট, মানবিক সম্পর্ককে বিচার করতে, 'কতখানি গাদ মিশিয়ে মধু আর খাদ মিশিয়ে সোনা' তার নিখুঁত ফর্মুলা তিনি রচনা করতে বসেছিলেন বৈজ্ঞানিকের নিরাসক্তি নিয়ে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক নিরাসক্তিই তাঁর শিল্পী-মানসের প্রধান কথা নয়। ভিখু আর পাঁচীর জন্যে ঠাসা ব্যক্তিকতার প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকারকে আবিষ্কার করেই তিনি ক্ষান্ত হন নি, ছোটবকুলপুরের উদার ভূমিকায় তিনি এসে দাঁড়িয়েছেন। এই উত্তরণ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে অপ্রতিরোধ্য ছিল। কিন্তু এই উত্তরণের যে পথযাত্রার বিচিত্র ইতিহাস তার পরিচয় কিন্তু নেই তাঁর কবিতায়। এখানে জ্বালা নেই, যন্ত্রণা নেই, শান্ত-প্রশান্ত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কোন এক বৈকালের আলোয় নিজের মুখোমুখী বসে সহজভাবে প্রশ্ন করেছেন, সুকান্ত, তোমার যক্ষ্মা হয়েছে ?

আমার কিন্তু মনে হয়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাগুলি নিয়ে আলোচনা হওয়া দরকার। আলোচনার প্রথম বাধা, উপকরণের অভাব। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তিনি নানা উপলক্ষে যে সব রচনা প্রকাশ করেছিলেন সেগুলির সংখ্যা কম নয়। সেগুলি তাঁর রচনাবলীর পরিশিষ্ট হিসেবে সংকলিত হলে মানিক-প্রতিভার সম্যক বিচার

সম্ভব হতো। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, নাছোড়বান্দা রচনা-প্রার্থীদের জন্য রচিত হলেও, মানিকবাবুর কবিতাগুলির একটি স্বতন্ত্র মূল্য আছে। তাঁর লেখক-চরিত্র বিশ্লেষণের জন্য এগুলি সংকলিত হওয়া দরকার। যেমন দরকার লেখকের চিঠিপত্র এবং অন্যান্য সব রচনা। মানিক-বাবুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ইদানীং নানা সংকলন প্রকাশিত হয়ে থাকে। ঐ সব সংকলনের উদ্যোক্তাদের কাছে আমার প্রস্তাব, তাঁরা মানিকবাবুর বিচ্ছিন্ন সব রচনাগুলি সংকলন করুন। আমার মনে হয় এতে তাঁর প্রতি সবচেয়ে বেশী শ্রদ্ধা দেখান হবে।

স্মৃতি থেকে বলা

সব কিছু আজও স্পষ্ট মনে আছে। মনে হয় সেদিনের কথা। হিসাবে যদিও দুই দশক, তবুও মনে হয় গত কাল, গত সপ্তাহ, বড় জোর গত মাসের কথা। সময়ের হিসেবে কি আর সব কিছু হিসেব করা চলে!

চোখের সামনে স্পষ্ট ছবি ভাসছে। মনের মাঝে স্পষ্ট কথা বাজছে।

উনিশশো বায়ান্নো সালের কথা। ছোটদের জন্যে কিছু করার ব্যাপারে আমরা মেতে উঠেছি। বয়স অল্প। কতোই বা আর! বছর কুড়ি হবে। মনে হচ্ছে ভবিষ্যৎ-সমাজকে গড়ে তোলার এক মহান ব্রতে আমরা ব্রতী হয়েছি। বড়দের জন্যে নয়, ছোটদের জন্যে নতুন জাতের, নতুন স্বাদের সাহিত্য রচনা করতে হবে। সামান্য সামর্থ নিয়ে তাই আমরা ছোটদের পত্রিকা 'আগামী' প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি।

তখন পার্কসার্কাসে থাকি। 'পার্কসার্কাস লেখক ও শিল্পী সমাজ'-এর সক্রিয় কর্মি আমরা। আর সেই সাহিত্য-সংস্থার মাধ্যমে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগে আমার সম্পর্ক। আমাদের সাহিত্য-সভায় মানিকবাবু মাঝে-মাঝে আসতেন।

সত্যি কথা বলতে কি মানিকবাবুকে তখন আমি বেশ ভয় করতাম। কেন ঠিক জানি না। হয়তো শ্রদ্ধা থেকে, হয়তো সম্ভ্রম থেকে। এখনকার মত নয়। আমাদের বয়সী ছেলেরা তখন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষা-ভাষা নয়, সত্যিকারের গভীরভাবেই ভক্ত ছিলাম। আজও যেমন আছি। ভবিষ্যতেও যেমন থাকবো।

তবুও ভয়-ডর কাটিয়ে একদিন পত্রিকা প্রকাশের কথা বলে বসলাম। সময়টা এখনও স্পষ্ট মনে আছে। সাহিত্য-বৈঠক শেষ হয়েছে। বর্ষাকাল। গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। আকাশে হালকা জলো মেঘ। ঘরের মাঝে আমরা কয়েকজন। মানিকবাবু বলছেন আমরা শুনছি। সাহিত্য-প্রসঙ্গে। আর সেই কথার ফাঁকে আমি

হুম্ করে আমাদের পরিকল্পনার কথা বলে বসলাম। শুধু বলা নয়, প্রথম সংখ্যায় তাঁর গল্পও চেয়ে বসলাম।

সবাই চুপচাপ। মানিকবাবু কি বলেন!

সবাইকে অবাক করে মানিকবাবু আমার পিঠে সজোরে হাত রেখে বললেন, সাবাস্, এই তো চাই! ঠিকই ভেবেছ তোমরা। ছোটদের জন্যে সত্যিই কিছু করা দরকার। প্যানপ্যানানি নাকে কান্না আর ভূতুড়ে গল্প দিয়ে ছোটদের কিছু হবে না।

সাহস বেড়ে গেল। সংগে-সংগে বলে বসলাম, আপনি লিখুন তাহলে! আপনি পথ দেখান আমাদের।

তাঁর সেই অসাধারণ গভীর দু'টি চোখ নিয়ে মানিকবাবু কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর বললেন, পথ দেখান-টেখান বাজে কথা। আমি বিশ্বাস করিনা। তবে আমি লিখবো। নিশ্চয় লিখবো।

এবং 'আগামী'র প্রথম সংখ্যা থেকেই নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকলো তাঁর ছোটদের গল্প। ছোট সাইজের সস্তা কাগজে ছাপা. সেদিনের সেই কিশোর পত্রিকায় অমূল্য সম্পদ হয়ে রইলো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটদের গল্প। বেশির ভাগই তাঁর ছেলেবেলার দুরন্ত জীবন নিয়ে লেখা। নিজেই বলেছিলেন একদিন, কি দুরন্ত-ই না ছিলাম!

তারপর ধীরে ধীরে কিভাবে যে সম্পর্কের গভীরতা জন্মে গেল আজ আর স্পষ্ট মনে নেই। অন্য অনেকের মতো তাঁর সেই দক্ষিণেশ্বরের বাড়িতে আমি অনেকবার গিয়েছি। অন্য অনেকের মতোই তিনি আমাকে স্নেহ করতেন। আর সেই স্নেহের দাবিতে কতো জ্বালাতন যে করেছি আজ ভাবলে খারাপ লাগে।

অধিকার পেতে-পেতে অধিকারের লোভ যেন ক্রমশঃ বেড়ে গেল। শুধু গল্প নয়। মানিকবাবুকে দিয়ে ছোটদের জন্যে উপন্যাস লেখাতে হবে। কিন্তু আশ্চর্য! এক কথায় মানিকবাবু রাজি হয়ে গেলেন। ভাবতেই পারিনি একেবারে। শুরু হলো তাঁর শেষ কিশোর উপন্যাস

'মাটির কাছে কিশোর কবি'। কবি সুকান্তর জীবন চোখের সামনে থাকলেও সুকান্ত-কে নিয়ে লেখা নয়। প্রথমে ভূমিকাতে সে-কথা বলে নিয়েছিলেন মানিকবাবু। স্বপ্নমাখা এক কিশোরের স্বপ্নের জগৎ থেকে রূঢ়-কঠিন বাস্তব জগতে প্রত্যাবর্তনের কাহিনী।

উপন্যাসটি অবশ্য তিনি শেষ করতে পারেননি। যেটাই সবচেয়ে আক্ষেপের কথা। শরীর তখন ভেঙে গিয়েছে। প্রায়ই অসুখে ভুগছেন। দক্ষিণেশ্বরের খোলা মাঠের সামনে একতলা সেই বাড়িটায় তখন আমি প্রায়ই যাতায়াত করি। দূরত্ব অনেক। তবুও না গিয়ে পারি না। কিসের যেন এক অজানা আকর্ষণ।

টুকরো-টুকরো আলোচনা হয়। বেশির ভাগই শিশু-সাহিত্য প্রসঙ্গে। আমাকে তখনও তিনি সমানে উৎসাহ দিয়ে চলেছেন। পত্রিকার বয়স তখন একবছর পেরিয়ে গেছে।

সমাজজীবন বহির্ভূত কোন শিশু-সাহিত্যে তিনি বিশ্বাস করতেন না। বিজ্ঞানের প্রতি ছিল তাঁর প্রগাঢ় আস্থা। বিজ্ঞানসম্মত ভাবেই ছোটদের জন্যে রচনা করা উচিত বলে তিনি মনে করতেন। বলতেন, এ-খুব কঠিন কাজ। কিন্তু কঠিন কাজ হলেও করতেই হবে।

হঠাৎ আমি একদিন জিজ্ঞেস করে বসলাম, সুকুমার রায়কে আপনি কি বলবেন।

একটুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তারপর ঠোঁটের কোনে মৃদু হাসি টেনে বললেন, বিজ্ঞানসম্মত ছোটদের জন্যে সার্থক রচনা। ছোটরা প্রথমে মজা পায়। এবং সে মজা তারা গ্রহণ করে। তারপর কিছুদিন পর একটু বড় হলে গভীরতা তারা অনুভব করতে পারে। সমাজের প্রতি তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ তাদের চোখে ধরা পড়ে। প্রথম জীবনে তাদের মনের পর্দায় চরিত্র-এর যে ছাপগুলো রয়ে যায়, বড় হলে তারা তা সহজে মিলিয়ে দেখতে পারে।

শিশু-সাহিত্য প্রসঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছেই এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর আমার হাতে খড়ি।

কতো টুকরো-টুকরো কথাই আজ মনে পড়ছে। কিন্তু সব কিছু জোড়া লাগাতে পারছি না। বারবার মনে হচ্ছে সব কথাগুলো যদি লিখে রাখতাম! তাহলে সাহিত্যের এই বিশেষ শাখা সম্পর্কে মহান সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য ভবিষ্যৎ শিশু-সাহিত্যিকদের কাছে অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকতো।

ইতিমধ্যে 'আগামী' তখন চার বছরে পা দিয়েছে। নারায়ণ-গঙ্গোপাধ্যায় তখন আমাদের সক্রিয় উপদেষ্টা। নারায়ণবাবু আমার শিক্ষক থাকলেও তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা 'আগামী' নিয়ে। নারায়ণবাবু একদিন বুদ্ধি দিলেন, এবার একটা বারোয়ারী উপন্যাস শুরু করা যাক ছোটদের জন্যে। এবং শুরু করুন মানিকবাবু।

মানিকবাবু তখন গুরুতরভাবে অসুস্থ। মানিকবাবুকে বলতে আমার খুব খারাপ লাগছিলো। তবুও বলে বসলাম। এবং সঙ্গে-সঙ্গে রাজি। নারায়ণবাবুকে খবর দিতে তিনি খুব খুশি। বললেন, মানিকবাবুকে যে কি দিয়ে বশ করেছো!

এবং সেই বারোয়ারী উপন্যাস সুরু করলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

যতোদূর জানি ঐটিই বোধহয় তাঁর শেষ রচনা।

দক্ষিণেশ্বরের বাড়ি গেলে তখন খুব খারাপ লাগতো। বিষাদে মনটা ভরে উঠতো। মানিকবাবুকে যে আমরা হারাতে বসেছি তা বেশ অনুভব করতাম।

তারপর তার মৃত্যুর পর তাঁর মরদেহ নিয়ে বিশাল সেই শোক মিছিলে লরির উপর সর্বক্ষণ তাঁর শিয়রে বসে থেকেছি। পায়ের নিচে তাঁর কিশোর-পুত্র, আর শিয়রে আমরা কয়েকজন। সে স্মৃতি ভোলা যায় না।

শেষ করবার আগে হঠাৎ মানিকবাবুর একটি কথা আমার কানের মাঝে বেজে উঠলো। যতদূর মনে পড়ছে তাঁর বাড়িতে আর্থিক অনটন প্রসঙ্গে তিনি দপ্ করে জ্বলে উঠে বললেন, মৃত্যুর পর সব বুঝতে পারবে কি সম্পদ আমি রেখে গেলাম।

সত্যিই কি তাই নয়?

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আসল নাম প্রবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়। মানিক ছিল তাঁর ডাক নাম। শেষ পর্যন্ত ডাক নামেই তিনি পরিচিত হয়েছিলেন। ১৯১০ সালে, দুমকায় তাঁর জন্ম হয়। বাবা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় আর মা নীরদাসুন্দরী দেবী। ছয় ভাই আর চার বোনের মধ্যে মানিক ছিলেন চতুর্থ ভ্রাতা। ষোলো বছর বয়সে, ১৯২৬ সালে তিনি মেদিনীপুর থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। তারপর বাঁকুড়া কলেজ থেকে আই-এস-সি পাশ করে কোলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে গণিতে অনার্স নিয়ে বি-এস-সি ক্লাসে ভর্তি হন। একসময় তিনি তখনকার 'বঙ্গশ্রী' মাসিক পত্রিকায় আড়াইশো টাকা বেতনের সহ-সম্পাদকের কাজ নিয়েছিলেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতের অমিল হওয়ায় সে চাকরী ছেড়ে দেন এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্টের পাবলিসিটি অফিসার হন। তারপর এই চাকরী ছেড়ে দিয়ে যোগদান করেন কমিউনিস্ট পার্টিতে।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী বলতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কেই বোঝায়। তিনি ছিলেন একজন সার্থক বাস্তববাদী লেখক।

ছোটবেলা থেকেই মানিক ছিলেন খুবই দুরন্ত। অন্যায়ের প্রতিবাদ না করে তিনি থাকতে পারতেন না কখনো। আর ছিলেন জেদী। জেদ চাপলে যা মনে করতেন, তা করতেনই।

আর এই জেদ-ই তাঁকে শেষ পর্যন্ত একজন বিজ্ঞানী না করে সাহিত্যিক করে তুলেছিল।

সে এক বিচিত্র ঘটনা।

তিনি তখন কোলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে গণিতে অনার্স নিয়ে বি-এস-সি পড়ছেন। বিজ্ঞানের ছাত্র। তখনও সাহিত্যিক হওয়ার কথা বা সাহিত্য রচনার কল্পনা তাঁর মনে ঘুণাক্ষরেও আসেনি। একদিন ক্লাসের বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা চলছে, কথায় কথায় উঠলো সাহিত্যের আলোচনা। এই থেকে উঠলো তখনকার নামকরা পত্র-পত্রিকার কথা।

একজন ছাত্র বললে, নামকরা লেখক বা দলের লেখক না হলে পত্রিকাওলারা লেখা ছাপায় না।

সেখানে, সেই আলোচনার মধ্যে এমন একজন ছাত্র ছিল, যার লেখা তিন-চারটে গল্প পত্রিকা অফিস থেকে ফেরত এসেছে ইতিমধ্যে। সে তখন পত্রিকা সম্পাদকদের উদ্দেশ্যে একটা খারাপ গালাগাল দিলে।

সম্পাদকদের সম্বন্ধে এই কটূকথা কিন্তু মানিকের ভাল লাগলো না। চটে উঠলেন তিনি। বললেন, বাজে বকছো কেন? নামকরা লেখক বা দলের লেখক না হলে কাগজওলারা লেখা ছাপে না? দেখবে বাইরের লোকের লেখা ছাপবে কিনা! ভালো লেখা হলে আবার ছাপবে না? ইচ্ছে করলে আমিই আমার একটা গল্প ছাপিয়ে দিতে পারি।

সবাই একসঙ্গে হেসে উঠলো তাঁর এই কথা শুনে। মানিক বলে কি? কঠিন-কঠিন অঙ্ক করে-করে মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?

বন্ধুদের তাচ্ছিল্যের হাসি দেখে মানিকের জেদ চেপে গেল। বললেন, ঠিক আছে, তিন মাসের মধ্যেই আমি প্রমাণ করে দেবো।

বাজি রাখা হলো।

তখনকার দিনের নামকরা মাসিক প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বিচিত্রায় কোনো নতুন লেখকের পক্ষে লেখা ছাপানো একেবারেই অসম্ভব

ব্যাপার ছিল। মানিক কিন্তু জেদ ধরে বললেন, ঐ পত্রিকাগুলির একটিতেই তাঁর লেখা ছাপাবেন।

তিন মাস নয়। তিন দিন। মাত্র তিনটি দিনের মধ্যেই জেদী মানিক লিখে ফেললেন একটি গল্প। গল্পের নাম দিলেন "অতসীমামী"। আর লেখকের নাম হিসাবে নিজের ডাক নামটিকে জুড়ে দিলেন—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর সেই গল্পের পাণ্ডুলিপি নিয়ে সোজা গেলেন 'বিচিত্রা' অফিসে।

বিচিত্রার সম্পাদক তখন উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি সে সময় ছিলেন না। সহকারী-সম্পাদক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ছিলেন অফিসে। সোজা তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন মানিক। হাতে তাঁর নতুন লেখা সেই গল্প।

অচিন্ত্যকুমার বললেন—কি চাই?

মানিকের চোখে মুখে বুদ্ধির দীপ্তি ঝিকমিক করে উঠলো। বলিষ্ঠ কণ্ঠে বললেন—বিচিত্রার জন্যে একটি গল্প এনেছি। রেখে গেলাম।

বলেই গল্পটি টেবিলের মাঝখানে রেখে চলে গেলেন তিনি।

অচিন্ত্যকুমার অবাক হয়ে গেলেন একথা শুনে। ভাবলেন, বিচিত্রার জন্যে একটি গল্প রেখে গেলাম।—এ আবার কি? এতোখানি বুকের পাটা তো কোনো নতুন লেখকের হয়নি কখনো!

আশ্চর্য!

অচিন্ত্যকুমার হাতের জরুরী কাজ সরিয়ে রেখে অসীম কৌতূহল নিয়ে পড়লেন গল্পটি।

নাম "অতসীমামী"। গল্পটি পড়ে আরো বিস্মিত হলেন তিনি। সম্পাদক এলে তাঁকেও দিলেন পড়তে।

তারপর কয়েকদিন কেটে গেছে। সকালবেলা মানিক কলেজে যাবার জন্য বাড়ী থেকে বেরুচ্ছেন, এমন সময় এক ভদ্রলোক সামনে এসে দাঁড়ালেন।

—এখানে কি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় থাকেন ?

—হ্যাঁ বলুন, আমারই নাম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভদ্রলোক তখন নিজের পরিচয় দিলেন।

—আমি উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। অতসীমামীর লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্বচক্ষে দেখতে এসেছি।

এরপর তিনি অতসীমামীর জন্য নগদ পারিশ্রমিক কুড়ি টাকা মানিকের হাতে দিয়ে বললেন, আর একটা গল্প চাই।

বিচিত্রায় অতসীমামী বেরুলো। বন্ধুরা তো অবাক! মানিকের মধ্যে এতো গুণ ছিল ? খোঁচা দিয়ে না জাগালে তো ধরা পড়তো না!

তা সত্যিই তাই। জেদ করে না লিখলে হয়তো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কোনদিনই সাহিত্যের জন্য কলম ধরতেন না।

এক গল্প, আর এই প্রথম গল্পেই বিখ্যাত হয়ে গেলেন মানিক। প্রথম লেখায় খেয়াল বশতঃ ডাক নামটি জুড়ে দিয়েছিলেন। তাই সেই নামেই পরিচিত হলেন শেষ পর্যন্ত। আসল নাম কোথায় গেল হারিয়ে।

লেখা, লেখা আর লেখা। আরো লেখা চাই। নানা পত্র-পত্রিকা থেকে তাগিদ আসতে লাগলো। মানিকের মনে দেখা দিলো নতুন চিন্তা। তিরিশ বছর বয়সের আগে তিনি লিখবেন না ঠিক করেছিলেন। কেন না, তখন তাঁর পড়াশোনার দিকেই ছিল মন। ক্লাশে লেকচার শোনেন নিবিষ্টচিত্তে। বিজ্ঞানের এক্সপেরিমেণ্ট করেন ল্যাবরেটরীতে বসে। তিনি তখন বিজ্ঞানের ছাত্র। মন প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন বিজ্ঞানকে।

কিন্তু বিজ্ঞানের আকর্ষণ তাঁকে ধরে রাখতে পারলো না শেষ পর্যন্ত। লেখার তাগিদে বিজ্ঞানের মেধাবী ছাত্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কলেজে ইস্তফা দিয়ে মন দিলেন সাহিত্য সাধনায়। কিন্তু বিজ্ঞানীর মন ছিল তাঁর বরাবরই। তাইতো সাহিত্য রচনার মধ্যেও তিনি বিজ্ঞানীর মতো এক্সপেরিমেণ্ট করেছিলেন মানুষের জীবন আর মন নিয়ে।

পড়াশোনা ছেড়ে লেখায় মেতে ওঠার জন্য বাড়ীর সবাই কিন্তু খুব অসন্তুষ্ট হলেন। একটু কি বিষয়বুদ্ধি নেই মানিকের! লিখে কি হবে? পেট ভরবে এতে?

কথাটা ঠিক। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও যে সেকথা জানতেন না তা নয়। সব জেনেশুনেও সাহিত্য রচনাকে জীবনের একমাত্র পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। এতে অবশ্য পেট তাঁর কোনদিনই ভরেনি। মন ভরেছিল। লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সারাটা জীবন ধরে দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে গেছেন। অর্থ উপার্জন করার আশা নিয়ে তিনি কোনদিনই সাহিত্য সৃষ্টি করেন নি। সাহিত্য তাঁর কাছে বিক্রির জিনিস ছিল না। সাহিত্য ছিল তাঁর আদর্শ। তাঁর ধর্ম। তিনি ছিলেন একজন খাঁটি জাত-সাহিত্যিক। শিল্পীর হৃদয় মন দিয়ে যা তিনি অনুভব করেছেন, তা নিজের লেখায় প্রকাশ করতে দ্বিধাবোধ করেননি কখনো। তাঁর লেখার মধ্যে ছিল না কোন ফাঁকির কারবার। থাকলে 'পদ্মানদীর মাঝি' বা 'পুতুল নাচের ইতিকথা'-র মতো মহৎ উপন্যাস তিনি সৃষ্টি করতে পারতেন না।

একা একা ভালো খেয়ে-পরে, আরামে-আনন্দে থাকবো—এমন চিন্তা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কোনদিনই করেন নি। সব সময় দেশের সাধারণ মানুষের দুঃখ কষ্টের কথাই তিনি অনুভব করেছেন। এই দুঃখ-কষ্ট মানুষ একদিন জয় করবেই—একথা বিশ্বাস করতেন তিনি। অন্যায় অত্যাচার কি অবিচার, কি মানুষের প্রতি মানুষের শোষণ যেদিন শেষ হবে—দেশের সমস্ত মানুষ সেদিন উঠবে হেসে। ফেলবে মুক্তির নিঃশ্বাস। সমাজের চেহারা যাবে বদলে। গড়ে উঠবে এক শোষণহীন, অত্যাচারহীন সুখী সমাজ।

সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সমাজের স্বপ্নই দেখতেন। তাঁর প্রতিটি লেখায় সেই সমাজের স্বপ্ন দেখার ছবি ফুটে উঠেছে স্পষ্টভাবে। সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার কথাই

তিনি লিখে গেছেন সারাজীবন ধরে। তিনি ছিলেন মানুষের দরদী বন্ধু।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে যা দেখেছেন, যা মনেপ্রাণে অনুভব করেছেন, তাই নিয়েই সাহিত্য রচনা করেছেন বরাবর।

কারো সাথে কোনো আপোষ তিনি কোনদিনই করেন নি বা কোনো না-দেখা না-জানা ঘটনার আশ্রয় নিয়ে অবাস্তব কাল্পনিক সাহিত্য রচনাও করেন নি। শুধু সেই জন্যই মানুষকে জানার আগ্রহ ছিল তাঁর অসীম। আর সে আগ্রহ ছিল তাঁর খুব ছোটবেলা থেকেই।

ছোটবেলায় একসময় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় টাঙ্গাইলে ছিলেন। তখন স্কুলের ছাত্র তিনি। বাড়ীর খুব কাছাকাছি ছিল নদী। নদীর ঘাটে অজস্র ছোট-বড় নৌকো। কত দূর-দূর থেকে কত মানুষ সেইসব নৌকো করে আসে আর যায়। নদীর ঘাটে কত বিচিত্র মানুষের আনাগোণা। যেন মানুষের হাট একটি। সেই সঙ্গে আছে নৌকোর মাঝিরা। তাদের কণ্ঠের ভাটিয়ালী সুর। নদীর মাঝিদের রহস্যময় জীবন সম্বন্ধে কিশোর মানিক কৌতূহলী হয়ে ওঠেন খুব। আর সেই অসীম কৌতূহল নিয়ে মাঝিদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে তাদের নৌকোয় চড়েন, পদ্মানদীর বুকে পাড়ি জমান মাঝিদের পাশে বসে। শুধু মাঝিদের সঙ্গে বন্ধুত্বই নয়, তাদের মনের কাছাকাছি পৌঁছতে চান তিনি। সেই জন্যই যেন মাঝিদের সঙ্গে নদীতে ধরা ইলিশ মাছের ঝোল দিয়ে লাল লাল মোটা চালের ভাত খান। মাঝিদের কোল্‌কেতে ফুঁ দিয়ে তামাক ধরিয়ে দেন। কখনো বা নৌকোর বৈঠা বাইতে থাকেন তাদের সাথে। উদগ্রীব হয়ে মাঝিদের কথা শোনেন, গল্প শোনেন, গান শোনেন। আর তা সবই মনের মণিকোঠায় রেখে দেন জমা করে। নৌকা চলে এগিয়ে। দূরে—বহুদূরে। গাঁয়ে-গাঁয়ে ঘরে-ঘরে গিয়ে তাদের মেয়ে-পুরুষ আর ছোটোদের সঙ্গে আলাপ জমান। পেঁয়াজ-লঙ্কার তরকারী মেখে মাটির সানকিতে

করে ভাত খান তাদের ঘরে। তাদের সঙ্গে মিশে, তাদের আপনজন হয়ে, জেনে নেন তাদের জীবনের সব কথা।

এমনি একবার নয়, বহুবার। প্রায়ই যেতেন তিনি। ঐ নদীর ঘাট যেন কিশোর মানিককে হাতছানি দিয়ে ডাক দিতো সব 'সময়। একবার এক নাগাড়ে তিনদিন মাঝিদের সঙ্গে কাটিয়ে এসে তিনি ভয়ে ভয়ে বাড়ী ঢুকলেন। বাড়ীর সকলে তখন দুশ্চিন্তায় অস্থির। বাড়ীতে এসে তাই খুব বকুনি খেতে হলো তাঁকে। তাই বলে ঐ নদীর ঘাটে যাওয়া তাঁর বন্ধ হলো না।

কিশোর বেলার সেই অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি পরে বড়ো হয়ে, সাহিত্যিক হয়ে, 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটি লিখতে পেরেছিলেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেহারার মধ্যে অসাধারণত্ব কিছু ছিল না—শুধু চোখ দুটি ছাড়া। তাঁকে যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই জানেন মোটা কাঁচের চশমার মধ্য দিয়ে এক-এক সময় যখন তিনি একদৃষ্টে তাকাতেন, মনে হতো যেন একেবারে ভেতর পর্যন্ত দেখে নিলেন। এই প্রখর দৃষ্টি দিয়েই তিনি মানুষ আর তাদের জীবনকে দেখে গেছেন বরাবর। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে ছিল তাঁর কতো জ্ঞান, অথচ কতো নিরহংকারী ছিলেন তিনি। অত্যন্ত সহজ আর সরল ছিল তাঁর জীবন। কথা যখন বলতেন, বলতেন খুব সোজাসুজিভাবে স্পষ্ট কথা। কথার মাঝে কোন অকারণ ভূমিকা বা ভনিতা তাঁর ছিল না কোনদিনই। একান্তই সাধারণ মানুষের মতো ছিল তাঁর কথাবার্তা আর ব্যবহার। তাঁর কাছাকাছি আসার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছে, তাঁরা তাঁর ঘরোয়া ব্যবহারে মুগ্ধ না হয়ে পারেন নি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন আশাবাদী মানুষ। বাংলা সাহিত্যে এমন আর কোনো সাহিত্যিক আসেন নি, যাঁর সঙ্গে মানিক বন্দ্যো-পাধ্যায়ের তুলনা করা যায়। তিনি যেন একাই একটি আলাদা অধ্যায় হয়ে আছেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে। তাঁর রচনা বিশ্ব সাহিত্যের

আসরে শ্রেষ্ঠ আসন পাবার দাবী রাখে। অথচ সবচেয়ে দুঃখের বিষয় এই যে, এরকম একজন প্রতিভাধর মানুষ হয়েও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জীবিত অবস্থায় তাঁর উপযুক্ত সম্মান পান নি। তা যদি পেতেন তা হলে ১৯৫৬ সালে, মাত্র ছেচল্লিশ বছর বয়সে তাঁকে অকালে মৃত্যু বরণ করতে হতো না। তাঁর মৃত্যুর প্রকৃত কারণই হলো দারিদ্র্য। প্রখর দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে তিলে তিলে তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল। এটা বাঙালী আর বাংলা সাহিত্য পাঠকের কাছে মোটেই গৌরবের বিষয় নয়।

ভূমিকা ॥ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিশোর বিচিত্রা ॥

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

এলেজি : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

অনন্ত নক্ষত্র আজ খেলা করে আকাশের বুকে
আমি যেন টের পাই
আমি যেন দেখে যেতে পারি
তোমাদের কঠিন অসুখে
তোমরা ঔষধপত্র পেয়েছিলে কিনা ঠিকঠিক
অনন্ত নক্ষত্র দূরে খেলা করে—করে হতবাক।

ওরা এই পৃথিবীর কেউ নয়—ঐ নক্ষত্রেরা
আমরা তো পৃথিবীর লোক
আমাদের অভিমান হোক
আমাদের হোক রাগ দ্বেষ
আমরা মেটাবো একা-একা
অনন্ত নক্ষত্র তবু খেলা করে—দূরে যায় দেখা।

ওদের সমুদ্র ওরা জানে কিনা
ভুল হয় কেবলি ঠিকানা
ওরাও কি লেখাপড়া জানে ?
মিছে কানে কানে
কথা বলে—ওদের সকলে
আমরা কি ইস্কুলের কলে
জল খাই—করিনা টিফিন ?
নক্ষত্র জেনেছে ছাই—পড়ে আছে গাঁথা সেফটিপিন ?

দূরে দূরে
আকাশের বুক খুঁড়ে-খুঁড়ে
নক্ষত্র কোদাল হাতে চলে গেছে কে জানে কোথায়
কবে কোন্ কালে দেখা যায়
ওদের রাজ্যের সব লোক ?
আমাদের অভিমান হোক
আমাদের হোক রাগদ্বেষ
আমরা মেটাবো একা-একা
নক্ষত্রের চেয়ে কিছু বাকি আছে মানুষের শেখা ?

মানুষ তোমারি বাঁশি শুনেছিলো প্রিয় অর্ফিউস
তুমি জেনে গেলে সব
তোমার মৃত্যুর পর আমাদের ফুলে-ভরা টব
লুণ্ঠনের দাগ মেখে আজো তো ছাদেই পড়ে আছে
ভালোবাসা ছিলো খুব কাছে
ভালোবাসা ছিলো খুব কাছে।

তুমি নীলকণ্ঠ চারা পুঁতে দিয়ে বলেছিলে—'একে জল দাও
একে আর বিষণ্ণ রেখো না
আমার মতম এ-ও খুঁজেছে বিছানা।'
ভালোবাসে
কুকুরের মতো
একে তুমি দিয়ো না নিষ্ফল
ধূলোবালি'
বাংলা দেশে
তোমার মৃত্যুর পরে এসে
লাভ হলো—'সতর্কীকরণ !'

কত সুধা দেখেছিলো মন
কত বিষ চেখেছিলো মন
তা সবই অম্লান
যতই বিদেশ থেকে আনো
স্বাধীনতা-বোধ কী তা আমি জানি—তুমি যত জানো !

তুমি আছো দূর-পরপারে
সেখানে কখন ট্রেন ছাড়ে ?
আছে টেলিফোন ?
তোমাদের বাজার কেমন
রাজধানী ?
কাছা দেয় মদের দোকানী ?

তোমারো প্রকৃতি নয় নক্ষত্রের কাছে ধার করা
যে-বাঁশি বাজাও তুমি
তাকে আরো মূল্যবান করা
হবে কি আমার ?
প্রিয় অর্ফিউস, আমার স্তবেই হলো হার ॥

অমিতাভ দাশগুপ্ত

শতরঞ্চ

এর অনিবার্য পরিণাম
গণিকা-জলের দেহে জাহাজের লিখে যাওয়া নাম।

গান তার আসতো না।
তবু, দ্যাখো, বেঁধে বেঁধে ছক
প্রতি রাত্রে চোখ জ্বেলে লিখে লিখে শাণিত স্তবক
জড়ো ক'রে রাখে
শাদা কামিজের তলে বুকের কুঠ্‌রির থাকে থাকে।

রাজ্য গেল, পাট গেল, কৃষ্ণা গেল—তবু এই শতরঞ্চ খেলা
এর বুঝি শেষ নেই। মেঘে মেঘে এ যে কতো বেলা,
বেদনার কালিদহে আবর্তিত নীলকণ্ঠ আমি
জেনেও জানি না। আর বুঝেও বুঝি না কেন আমি
আঁজ্‌লা ভরে যতোই না জল তুলি, তবু কুলোবে না
জীবনের অগস্ত্য-পিপাসা,
শুধতে গিয়ে পাণ্ডবের দেনা,
পাঞ্চালীরই শাড়ী যায়। যুধিষ্ঠির নিয়মিত হেরে চলে
সৌভাগ্যের পাশা।